বাণী ও বিচার

(ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ)

শ্রীরামকৃষ্ণদেব

শিল্পী—ফ্রাঙ্ক ডোরাক্

বাণী ও বিচার

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

প্রথম ভাগ

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা

॥ উৎসর্গ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যসহচারিণী
পরমাপ্রকৃতি বিশ্বরূপিণী মা
শ্রীশ্রীসারদাদেবীর
শ্রীচরণে 'বাণী ও বিচার' (প্রথম ভাগ)
সমর্পিত হোল।

॥ প্রচ্ছদপট-পরিচিতি ॥

১। প্রচ্ছদপটের সম্মুখভাগে :

(ক) উপরে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব-প্রতিষ্ঠিত পঞ্চবটি ;

(খ) নীচে (দক্ষিণে) শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দির (দক্ষিণেশ্বর)।

(গ) নীচে (বামে) দ্বাদশ শিবমন্দির।

২। প্রচ্ছদপটের পশ্চাদ্ভাগে :

(ক) হালিশহরে শ্রীরামপ্রসাদ-প্রতিষ্ঠিত পঞ্চবটি।

(খ) নীচে (বামে) মূলাজোড়-শ্যামনগরে শ্রীশ্রীব্রহ্মময়ীর মন্দির

(গ) নীচে (দক্ষিণে) দ্বাদশ শিবমন্দির।

॥ ভূমিকা ॥

'বাণী ও বিচার' (প্রথম ভাগ) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হোল। প্রায় তিন বৎসর যাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-প্রকাশিত 'বিশ্ববাণী' মাসিক পত্রিকায় এটি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। বহুদিন থেকে ইচ্ছা ছিল 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'-গ্রন্থে আলোচিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী ও উপদেশগুলির অন্তর্নিহিত ভাব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করি। শ্রীম-লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের তাৎপর্য একান্তভাবে সহজ সরল, কিন্তু তার মধ্যে অনুলিখিত উপদেশগুলি ভাবমাধুর্যপূর্ণ ও গম্ভীর—যেমন আচার্য শঙ্করের বেদান্তসূত্রের ভাষ্যকে বলি 'প্রসন্ন-গম্ভীর,'—'প্রসন্ন' কিনা সহজ সরল তার ভাষা ও রচনাশৈলী, কিন্তু 'গম্ভীর' বা কঠিন ও অতলস্পর্শী তার ভাব ও অর্থ। শ্রীম বা মাস্টার মহাশয় (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) দক্ষিণেশ্বর ও কলকাতার বিভিন্ন স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখনিঃসৃত বাণী লিখে রেখেছিলেন, পরে স্মৃতি থেকে সে অনুলিখন পাঁচটি ভাগে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-গ্রন্থাকারে প্রকাশিত এবং সর্বজনসমাদৃত হয়। *Gospels of Ramakrishna* নামে তার ইংরাজী সংস্করণও হয়েছে। ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন আমেরিকায় অবস্থিত (বর্তমানে স্বর্গত) স্বামী নিখিলানন্দ মহারাজ (শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের)।

'বাণী ও বিচার' প্রথম ভাগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রথমভাগ থেকে উপদেশাংশ উদ্ধৃত ক'রে তার সহজ সরল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হোল এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্ম ও দর্শন-চিন্তাকে অনুসরণ ক'রে করা হয়েছে। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বেলায় মতভেদ ও বিভিন্ন মতবাদ থাকার অবসর আছে ও চিরকালই থাকবে, তবে 'বাণী ও বিচার'-গ্রন্থে যতদূরসম্ভব সাবধানে সাধারণভাবেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের বাণীর তাৎপর্য বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র দর্শনচিন্তা ও ধর্মচিন্তার স্থান সুস্পষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক এবং যথার্থ বিচারশীল পাঠক-পাঠিকারা তা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ ও পরীক্ষা করবেন আশা করি। 'বাণী ও বিচার'-গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের বাণী ও উপদেশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে এর বেশী আর বলার বা

লেখার প্রয়োজন নেই মনে করি। 'বাণী ও বিচার'-গ্রন্থ খণ্ডাকারে প্রকাশিত হবে এবং মনে হয়, চারটি খণ্ডে মোটামুটি বাণীনিহিত বিষয়গুলি আলোচনা করা সম্ভব হবে।

'বাণী ও বিচার'-গ্রন্থের প্রকাশপ্রসঙ্গে যাঁরা অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করেছেন নানা প্রকারে তাঁদের মধ্যে আছেন ব্রহ্মচারী প্রণবেশচৈতন্য, দেবাশীষ হোড, দুর্গাপদ ভট্টাচার্য, স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ, আশুতোষ ঘোষ, মানিকলাল দত্ত, হেমচন্দ্র ঘোষ, সুরেশচন্দ্র চৌধুরী, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, নিতাই ভট্টাচার্য। বিশেষ ক'রে দুর্গাপদ ভট্টাচার্য, ব্রহ্মচারী প্রণবেশচৈতন্য ও দেবাশীষ হোড়ের সযত্ন-সহায়তা না পেলে এ গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা সম্ভব হ'ত না. সেজন্য এদের এবং উপরিউক্ত সকলকে আমার অন্তরের ধন্যবাদ জানাই। তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-প্রকাশিত মাসিক 'বিশ্ববাণী'-পত্রিকায় 'বাণী ও বিচার' যখন মাসে মাসে প্রকাশিত হ'তে থাকে তখন গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য অকুণ্ঠ প্রেরণা লাভ করেছি হাইকোর্টের বর্তমান প্রধান-বিচারপতি মাননীয় শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র মহাশয়ের নিকট থেকে, তাই 'বাণী ও বিচার' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ায় তাঁর প্রেরণার কথা মনে পড়ে বিশেষভাবে।

পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই বোধি প্রেসের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীসিদ্ধার্থ মিত্রকে গ্রন্থটি সযত্নে ও সুষ্ঠুরূপে মুদ্রিত করার জন্য। 'বাণী ও বিচার'-গ্রন্থে আলোচিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী ও উপদেশের ভাব, ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য সর্বসাধারণ সর্বধর্মাশ্রয়ী মানুষের কল্যাণ সাধন করবে এই আমাদের বিশ্বাস।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

॥ পূর্বসূত্রাভাস ॥

বাঙলার জীবনসিদ্ধ শক্তিসাধক শ্রীরামপ্রসাদকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূর্বসূরী বলা যেতে পারে, কেননা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসচক্ষে যেমন একদিকে বিধৃত ছিলেন দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্থের দেবী শ্রীশ্রীভবতারিণী, তেমনি ছিলেন অন্যদিকে মাতৃসাধক শ্রীরামপ্রসাদ। সাধনকালেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব মাঝে মাঝে পঞ্চবটি-সাধনপীঠ থেকে শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরকে লক্ষ্য ক'রে বলতেন—'মা আর একদিন চলে গেল, রামপ্রসাদকে দ্যাখা দিলি, কই—আমাকে তো দ্যাখা দিলি নি?' তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব জীবনের অধিকাংশ সময়ে গান করতেন রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি বিদগ্ধ সাধকদের রচিত মাতৃসঙ্গীত—যা বাঙলার আকাশ-বাতাসকে চিরদিন ভক্তিরসে আপ্লুত ক'রে রেখেছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন (উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ) আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন তন্ত্রসাধনার প্রভাব বিশেষভাবে ছিল।

সাধক শ্রীরামপ্রসাদ (রামপ্রসাদ সেন) সেনভূমের প্রসিদ্ধ ধলকণ্ডীর রাজা শ্রীহর্ষসেনের[১] বৈদ্যবংশে ১১২৭ সালের (ইংরাজী ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দ)[২] মতান্তরে ১৬৪০—৪৫শকের মধ্যে (১১২৫—৩০ সালে) আশ্বিন মাসে হাবেলীশহর-পরগণার কুমারহট্ট-হালিশহরগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মপ্রাণ রামরাম সেনের দ্বিতীয়া পত্নী সিদ্ধেশ্বরীদেবীর গর্ভে শ্রীরামপ্রসাদের জন্ম হয়। শ্রীরামপ্রসাদ সংস্কৃত, ফারসী ও উর্দুভাষায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁর হস্তাক্ষরও ছিল সুস্পষ্ট ও সুন্দর।

তাছাড়া কবিশক্তির বিকাশ ছিল শ্রীরামপ্রসাদের মধ্যে বাল্যকাল থেকেই। ভাজন-ঘাটনিবাসী লোকনাথ দাশগুপ্তের কন্যা যশোদাদেবীর (মতান্তরে সর্বাণীদেবী) সঙ্গে অল্প বয়সে শ্রীরামপ্রসাদের বিবাহ হয়। পিতা রামরাম সেনের মৃত্যুর পর দারিদ্র্যের জন্য শ্রীরামপ্রসাদ কলকাতার প্রসিদ্ধ দুর্গাচরণ মিত্রের বাটীতে সামান্য মুহুরীর কাজে নিযুক্ত হন। অন্তর্মুখী

১। শোনা যায়, সাধক রামপ্রসাদের আদিপুরুষ রাজা শ্রীহর্ষসেন চতুর্দশ শতকের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। 'রাজা' তাঁর উপাধি ছিল।

২। ইংরাজী ১৭২০ খ্রীস্টাব্দই ঠিক।

ছিল তাঁর মন। হিসাব-লেখার মাঝে মাঝে তিনি সরল সাবলীল ভাষায় হিসাবের খাতায়ই বিভিন্ন মাতৃসঙ্গীত রচনা করতেন। গুণগ্রাহী ছিলেন ধর্মপ্রাণ দুর্গাচরণ মিত্র। তিনি হিসাবের খাতায় লেখা মাতৃসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে কবিত্বশক্তির পরিচয় পেয়ে শ্রীরামপ্রসাদকে কর্ম থেকে অব্যাহতি দেন সামান্য বৃত্তিদানের ব্যবস্থা ক'রে।

সঙ্গীত-রচনার সঙ্গে সঙ্গে রামপ্রসাদের কবিত্বশক্তির কথা ক্রমে তদানীন্তন কৃষ্ণনগরের (নদীয়া) অধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কর্ণগোচর হয়। তিনি শ্রীরামপ্রসাদকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর পঞ্চরত্নসভার একজন সভাপদে নিযুক্ত করেন। শ্রীরামপ্রসাদের কণ্ঠ ছিল সুমিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী। তাঁর সমসাময়িক কবি 'অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতির রচয়িতা ভারতচন্দ্র রায় এবং স্বগ্রামবাসী আজু গোঁসাই (অযোধ্যানাথ গোস্বামী) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের একান্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন। সুতরাং তাঁদের সঙ্গেও শ্রীরামপ্রসাদের পরিচয় হয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও কুমারহট্টের প্রসিদ্ধ জমিদার সাবর্ণচৌধুরীগণ শ্রীরামপ্রসাদকে কিছু ভূমি দান করেন, কিন্তু সে সকল ভূমির সন্ধান এখন পাওয়া যায় না।

কুমারহট্টের (হালিশহর) সাবর্ণচৌধুরীগণের আদিপুরুষদের অনেকে তন্ত্রসাধনার জন্য বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। প্রখ্যাত বিদ্যাধর রায়ের প্রপৌত্র রামকৃষ্ণ রায়[৩] এরূপ একজন তন্ত্রসাধক ছিলেন। কিংবদন্তী যে, রামকৃষ্ণ রায় নিজের আবাসপল্লীতে একটি পঞ্চমুণ্ডির আসন প্রতিষ্ঠিত ক'রে সেখানে তন্ত্রসাধনা করেছিলেন। মাতৃনামপাগল শ্রীরামপ্রসাদও তন্ত্রসাধনার প্রতি আকৃষ্ট হন। শোনা যায়, তিনি রামকৃষ্ণ রায়-প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধপীঠেই পঞ্চবটি ও পঞ্চমুণ্ডির আসন রচনা ক'রে নিয়মিতভাবে তন্ত্রসাধনা ক'রে সিদ্ধি লাভ করেন। তন্ত্রসাধনায় তিনি কার দ্বারা অভিষিক্ত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হন সে সম্বন্ধে সঠিক কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। সাধক শ্রীরামপ্রসাদ অসংখ্য মাতৃসঙ্গীত রচনা করেছিলেন এবং তাদের কোন কোনটির মধ্যে 'সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণধাম,' 'শ্রীমণ্ডপ' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে এবং সে সব থেকে মনে হয়, তিনি সাধক রামকৃষ্ণ রায়-প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধাসনেই তাঁর সাধনপীঠ রচনা ক'রে মাতৃসাধনা ও সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

৩। উল্লেখযোগ্য যে, কুমারহট্টের তন্ত্রসাধক রামকৃষ্ণ রায় ও নাটোরের রাণী ভবানীর দত্তক-পুত্র তন্ত্রসাধক রামকৃষ্ণ (রাজা রামকৃষ্ণ) এক ব্যক্তি নন।

১১৮৮ সালে (ইংরাজী ১৭৮১ খ্রীঃ) ৪ঠা কার্তিক শ্রীশ্রীশ্যামাপূজার পরদিন (বিজয়ার দিন) ৬১ বৎসর বয়সে (জন্ম ১১২৭ সাল) সাধনসিদ্ধ শ্রীরামপ্রসাদ ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন হালিশহরে গঙ্গাবক্ষে। "প্রতিমা-বিসর্জনের পর আবক্ষ গঙ্গাজলে মাতৃসঙ্গীত গান করিতে করিতে জীবন বিসর্জন করেন।"[8] ঘটনাটির মধ্যে ঐতিহাসিক সত্তা কতটুকু নিহিত জানি না, তবে হালিশহর থেকে প্রকাশিত "শ্রীশ্রীরামপ্রসাদকীর্তন"-পুস্তিকার নিবেদনে শ্রদ্ধেয় অমূল্যচরণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন: "একথা তদানীন্তন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর জেলা-কালেক্টার কেরী সাহেব (উইলিয়াম কেরী) তাঁর সরকারী রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছেন।" সাধক শ্রীরামপ্রসাদ মুর্শিদকুলি খাঁর শাসনকালে জন্ম গ্রহণ ক'রে নবাব সিরাজদ্দৌলার রাজত্বকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

'বাণী ও বিচার'-গ্রন্থ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব-কথিত বাণী ও উপদেশের সারসংকলন ও তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। মাতৃসাধক শ্রীরামপ্রসাদ ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তন্ত্রসাধনার পূর্বসূরী ও প্রেরণাকেন্দ্র. তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী ও উপদেশের অনুশীলনের সঙ্গে সাধক শ্রীরাম-প্রসাদের স্মৃতির নিবিড় সম্পর্ক থাকা উচিত।

সাধক শ্রীরামপ্রসাদের দিব্যজীবনস্মৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যেমন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপার্থিব জীবনপ্রসঙ্গ, তেমনি জড়িত কুমারহট্ট-হালি-শহরে প্রতিষ্ঠিত পুণ্য-শক্তিসাধনপীঠ। সাধক শ্রীরামপ্রসাদের পঞ্চবটি ও পঞ্চমুণ্ডীর আসনের সঙ্গে স্মৃতি-জড়িত দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রতিষ্ঠিত পঞ্চবটি ও বিল্ববৃক্ষমূলে পঞ্চমুণ্ডীর আসন। এই সঙ্গে মনে পড়ে সাধক কমলাকান্ত ও রাজা রামকৃষ্ণের এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠিত পঞ্চবটি ও পঞ্চমুণ্ডী-আসনের কথা। শেষোক্ত দু'জনের (সাধক কমলাকান্ত ও সাধক রাজা রামকৃষ্ণের) সাধনপীঠ দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমাদের এক সময়ে। সাধক কমলাকান্তের জন্ম গুপ্তিপাড়াগ্রামে (নদীয়া) হ'লেও শিশুকালেই তিনি বর্ধমানজেলার চান্নাগ্রামে তাঁর মতুলালয়ে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। কমলাকান্তের পিতার নাম মহেশ্বর ভট্টাচার্য (বন্দ্যোপাধ্যায়) ও মায়ের নাম

৪। সাধক রামপ্রসাদের এই অন্তিম ঘটনার বিবরণ সংগৃহীত হোল 'হালিশহর-রামপ্রসাদ-লীলাকীর্তন-সমিতি'-কর্তৃক প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীরামপ্রসাদকীর্তন' পুস্তিকা থেকে।

মহামায়াদেবী। খানা-জংশনের কাছে চান্নাগ্রামে ছিল কমলাকান্তের মাতুলালয়—সেকথা বলেছি। দারিদ্র্যের সংসার ছিল তাঁর, সে'জন্য মাতা মহামায়াদেবীর সঙ্গে চলে এসেছিলেন শিশুকালেই কমলাকান্ত মাতুলালয়ে চান্নায়। পরে কমলাকান্ত বর্ধমান-রাজবাড়ীর সঙ্গে পরিচিত হন। দেবী বিশালাক্ষ্মী ছিলেন কমলাকান্তের আরাধ্যা দেবী। বর্ধমানের মাণিকরাম বাবু ও বাশুল্য রাম চক্রবর্তী মন্দির নির্মান ক'রে সেখানে দেবী বিশালাক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সাধক রামপ্রসাদ দেবী বিশালাক্ষ্মীর মন্দিরের পশ্চিমে জোড়া-শিমুলগাছের তলায় পঞ্চমুণ্ডীর আসন প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য পঞ্চমুণ্ডীর আসন তাঁর পূর্ব থেকেই সেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। দেবী বিশালাক্ষ্মী দ্বিভুজা শ্রীচণ্ডী। চান্নাগ্রামে সাধক কমলাকান্তের সাধনপীঠ বা আসন এখনও আছে। তাছাড়া বর্ধমানে বোরহাট কমলাকান্ত রোডের পাশে কমলাকান্তের 'ত্রিমুণ্ডী-আসন'-ও আছে। বর্ধমানে কোটালহাটেও কমলাকান্তের একটি সাধনপীঠ আছে। শোনা যায়, চন্দ্রশেখর গোস্বামীর কাছে কৌলিকপ্রথায় কমলাকান্ত দীক্ষা গ্রহণ করেন ও অবধূত কলিকানন্দ ব্রহ্মচারী গোপনে তাঁকে তন্ত্রসাধনায় অভিষেক ও দীক্ষা দান করেন।[৫] চান্নাগ্রামে সাধক কমলাকান্তের স্মৃতিসৌধ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত থাকার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল।

শক্তিসাধক রাজা রামকৃষ্ণ নাটোরাধিপতি মহারাজ রামকান্ত রায়ের বংশধর ও রাণী ভবানীব দত্তকপুত্র। রাজা রামকৃষ্ণের সাধনপীঠ পঞ্চমুণ্ডীর আসন ও পঞ্চবটি কাটোয়া থেকে আট-নয় মাইল দূরে গঙ্গাতীরে জিরেনপুর-গ্রামে প্রতিষ্ঠিত। অনেকের মতে, সেটি মুর্শিদাবাদে বড়নগরের গঙ্গাতীরে অবস্থিত। কিন্তু কাটোয়াস্থিত জিরেনপুরগ্রামে রাজা রামকৃষ্ণের পঞ্চবটি ও পঞ্চমুণ্ডীর আসন দেখার সৌভাগ্য আমাদেব হয়েছে। কথিত যে, আনুমানিক ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে রাজা রামকৃষ্ণের দেহাবসান ঘটে। তবে তাঁর জন্মতারিখ এখনও অজ্ঞাত।

পূর্বেই বলেছি, 'বাণী ও বিচার'-গ্রন্থে লিখিত ও অনুশীলিত বিচার ও ব্যাখ্যা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যবাণী ও উপদেশকে কেন্দ্র ক'রেই রচিত হয়েছে। ঐ সকল বাণী ও উপদেশ দক্ষিণেশ্বরে ও কলকাতার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে কথিত ও আলোচিত হলেও সে সকলের সঙ্গে জড়িত

৫। ডাঃ শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায় (বর্দ্ধমান)-প্রণীত 'কালীর বেটা কমলাকান্ত', পৃঃ ৩১৮

ছিল রাণী রাসমণি-প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্থ—যেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল মহাশক্তির জাগ্রত প্রতিমূর্তি শ্রীশ্রীভবতারিণীর বিগ্রহ। সেখানে কঠোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব অসামান্যা সাধনসিদ্ধা সাধিকা ভৈরবী যোগেশ্বরীদেবীর সযত্ন শিক্ষায় ও জাগ্রত প্রেরণায়। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিচিত্র সাধনার উপকরণসামগ্রী ও প্রেরণা যুগিয়েছিলেন মহাশক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীসারদাদেবী—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যসহচারিণী ও চিরসঙ্গিনী। সেখানে সমবেত হয়েছিলেন কতশত ত্যাগদীপ্ত সন্ন্যাসী, ভক্ত ও অন্তরঙ্গপার্ষদগণ—স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, অভেদানন্দ, শিবানন্দ যোগানন্দ, অদ্বৈতানন্দ, প্রেমানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, সারদানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি এবং শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের অনুলেখক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা মাষ্টার মহাশয় (শ্রীম), কেশবচন্দ্র সেন, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, শশধর তর্কচূড়ামণি এবং আরও অনেকে ও অনেক স্ত্রীভক্তগণ। দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্থ এজন্য দেশ ও বিদেশের সকল মানুষের নিকট আজ মহাতীর্থরূপে পরিচিত।

দক্ষিণেশ্বরগ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণলীলাঙ্গন রচিত হবার পক্ষে ও বিপক্ষে বহু ঘটনার কথাই আমরা শুনি। দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্থের প্রাণপ্রতিষ্ঠাকারিণী ছিলেন পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণি। সাধক রামপ্রসাদের তিরোধানের ঠিক বারো বৎসর পরে ১২০০ সালের ১১ই আশ্বিন রাণী রাসমণি কুমারহট্ট-হালিশহরের উত্তরাঞ্চলে গোলাবাড়ী-পল্লীতে দরিদ্র মাহিষ্য-পরিবারে (মতান্তরে মৎসজীবীবংশে) জন্মগ্রহণ করেন। গোলাবাড়ীপল্লীতেই রাণীর সাধারণ কৈশোরজীবন অতিবাহিত হয় এবং গোলাবাড়ীর গঙ্গার ঘাটে একদিন স্নানকালে কলকাতার জানবাজারের প্রসিদ্ধ ধনপতি ও ব্যবসায়ী রায় রাজচন্দ্র দাসের দৃষ্টিপথে পতিত হন ও পরে রাজচন্দ্র দাসের সঙ্গে রাণীর বিবাহ হয় ১২১১ সালের ৮ই বৈশাখ। রাজচন্দ্র দাস দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেছিলেন। "রাসমণির পিতা হরেকৃষ্ণ দাস চাষবাস ও ঘরামীর কার্য করিয়া কায়ক্লেশে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম রামপ্রিয়া ও রাণীর জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতার নাম রামচন্দ্র ও গোবিন্দ। ...রাসমণির পিতৃদত্ত আদরের ডাক নাম ছিল 'রাণী', তাই উত্তরকালে দুই নামের (রাণী ও রাসমণি) সংমিশ্রণে 'রাণী রাসমণি'-রূপে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।"[৬]

৬। কুমারহট্ট-হালিশহর-উচ্চবিদ্যালয় 'শতবার্ষিকী স্মারক-গ্রন্থ', পৃ ৪৭

১২১১ সালের ৮ই বৈশাখ রাণী রাসমণির বিবাহ হয় এবং ১২৪৩ সালে রাজচন্দ্র দাসের অকস্মাৎ মৃত্যু হয়, সুতরাং ৪৩ বা ৪৪ বৎসর বয়সে রাণীর স্বামীবিয়োগ হয়। রাণী ছিলেন প্রত্যুৎপন্নমতির অধিকারিণী, বুদ্ধিমতী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্না অসামান্যা নারী। স্বামী রাজচন্দ্র সে'কথা জানতেন। রাজচন্দ্রের মৃত্যুর পর তার বিশাল জমিদারী ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির সত্ত্ব ও ভার তাই রাণীর উপরই পড়ে। নানা বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে রাণী দক্ষতার সঙ্গে সকল-কিছু কর্ম ও কর্তব্য পরিচালনা করতেন।

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ 'শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থে এ সমন্ধে লিখেছেন: "কলিকাতার দক্ষিণাংশে জানবাজারপল্লীতে প্রথিতকীর্তি রাণী চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন; এবং তদবধি স্বামী ৺রাজচন্দ্র দাসের প্রভূত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে স্বয়ং নিযুক্তা থাকিয়া উহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধিসাধনপূর্বক তিনি স্বল্পকাল মধ্যেই কলিকাতাবাসিগণের নিকটে সুপরিচিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন।"[৭]

কুমারহট্ট-হালিশহর উচ্চবিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'স্মারক-গ্রন্থ' থেকে উদ্ধৃত ক'রে বলি: "নানাবিধ জনহিতকর কার্যের জন্য, অপূর্ব দানশীলতার জন্য, ন্যায়নিষ্ঠা ও তেজস্বীতার জন্য এবং একনিষ্ঠ ধর্মানুষ্ঠানের জন্য রাণী রাসমণির নাম ভারতের আদর্শস্থানীয়। পুণ্যশ্লোকা মহীয়সী রমণীসমাজের অগ্রগন্যা। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তির নিদর্শন দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা। শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য-আবির্ভাবের অগ্রদূতরূপে, তাঁহার পালয়িত্রী মাতৃস্বরূপিণী-রূপে, বিশ্বমাতা ভবতারিণীর প্রতিষ্ঠাত্রী সেবিকারূপে, শ্রীরামকৃষ্ণকথিত জগজ্জননীর অষ্ট-নায়িকার অন্যতমারূপে মহীয়সী আদর্শরমণী রাণী রাসমণি দেবীর পর্যায়ে গণ্য হইয়া 'প্রাতস্মরণীয়া পুণ্যশ্লোকা' আখ্যায় ভারত, বহির্ভারত তথা সারা বিশ্বের পূজণীয়া হইয়া আছেন।"

"রাণী রাসমণি তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ী প্রথমতঃ হালিশহর বলিদাঘাটাস্থিত প্রসিদ্ধ 'সিদ্ধেশ্বরী'-কালীকেই আশ্রয় করিয়া তাঁহার পিতৃভূমির ভাগীরথীতীরেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করেন। তাহা হইলে পুণ্যভূমি কুমারহট্টের ধর্মবির্বতনকেন্দ্রের সর্বাঙ্গীনতা পূর্ণভাবেই প্রকটিত হইত। কিন্তু শোনা যায় যে, ব্রাহ্মণপ্রধান কুমারহট্টের (হালিশহরের)

৭। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ (১৩৭৭), পৃ ৬৬

গোঁড়া ব্রাহ্মণসমাজপতিগণ ও অভিমানী উচ্চবর্ণের ভূম্যাধিকারিগণ তাহাতে প্রবল বিরোধিতা করেন। দরিদ্র ঘরামী হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা তাঁহাদের বক্ষের উপর মন্দির, অতিথিশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রাহ্মণ-সজ্জন পূজক পাঠকদের পালয়িত্রী হইবেন ও তাঁহার ধ্যান ধর্ম ঐশ্বর্যের দীপ্ত মহিমার নিকট তাঁহারা ম্লান, নিষ্প্রভ হইয়া যাইবেন—এই অভিমান ও ক্ষুদ্রত্বের জন্য রাণী সারা হালিশহর-পরগণার গঙ্গাতীরে অর্থের বিনিময়েও কোন উপযুক্ত ভূমি সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। অবশেষে কলিকাতা হইতে পাঁচ মাইল উত্তরে দক্ষিণেশ্বরগ্রামের অন্তর্গত ইংরাজদিগের এক পরিত্যক্ত কুঠি ও মুসলমানগণের কবরডাঙ্গা ও পীরস্থানের ৬০ বিঘা জমি প্রায় ৬০ হাজার টাকা মূল্যে মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য ক্রয় করেন।"

"রামপ্রসাদেরই অনুসৃত মাতৃসাধনার সর্বাঙ্গীন সিদ্ধিক্ষেত্ররূপে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যলীলাক্ষেত্ররূপে, বিবেকানন্দপ্রমুখ ঋষিকল্প বিশ্ববিশ্রুত মহাপুরুষগণের গুরুপীঠরূপে, শিব-শক্তি-বিষ্ণু-সাধনার সমন্বয়-ধাম বঙ্গের কৈলাস-বৈকুণ্ঠলোকের পুণ্য-প্রতীকরূপে—মহাতীর্থ-দক্ষিণেশ্বর আজ ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির নিদর্শনস্বরূপ সারা বিশ্বের বিস্ময়!"[৮]

উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণেশ্বরে কবরডাঙ্গা ও মুসলমানদের পীরস্থানের ৬০ বিঘা জমি ক্রয় ক'রে[৯] গঙ্গাতীরে শ্রীশ্রীভবতারিণীর' শ্রীশ্রীগোবিন্দজিউ ও দ্বাদশ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে রাণী রাসমণি হালিশহরে বলিদাঘাটা-স্থিত প্রসিদ্ধ কুমারহট্টের দেবী শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরীকে আশ্রয় ক'রে তাঁর পিতৃভূমির ভগীরথীতীরেই কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা করবার সংকল্প করেছিলেন সে কথার উল্লেখ করেছি। কিন্তু কুমারহট্ট-হালিশহরের গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের আপত্তিতে তা সম্ভব হয় নি, সম্ভব হয়েছিল দৈবের নির্দেশে দক্ষিণেশ্বরেই সেই কালীবাড়ী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করতে। শুধু তাই নয়, দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ী মহাতীর্থে ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সিদ্ধসাধনপীঠে পরিণত হবার অনুমানিক

৮। কুমারহট্ট-হালিশহর-উচ্চবিদ্যালয় শতবার্ষিকী স্মারক-গ্রন্থ' (১৮৫৪—১৯৫৪), পৃ ৪৯

৯। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থে (১৩৭৭) শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ এ সম্বন্ধে লিখেছেন: "কালীবাটীর জমির পরিমাণ ৬০ বিঘা দেবত্তর-দানপত্রে লেখা আছে। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ৬ই তারিখে উক্ত জমি কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী হেষ্টি নামক জনৈক ইংরেজের নিকট হইতে ক্রয় করা হয়। অতএব মন্দিরাদি নির্মাণ করিতে প্রায় দশ বৎসর লাগিয়াছিল" (পৃ ৭০)।

১৮৪ বৎসর পূর্বে[১০] মুলাজোড-শ্যামনগরে পাথুরিয়াঘাটার ধনপতি দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পুত্র গোপীমোহন ঠাকুর দ্বাদশ শিবমন্দিরসহ কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাদ যে, 'ব্রহ্মময়ী' নামে তাঁর নয় বৎসরের এক কন্যা গঙ্গার জলে ডুবে মারা গেলে কন্যার স্মৃতি রক্ষার জন্য (কেহ কেহ বলেন, কন্যা ব্রহ্মময়ী পিতা গোপীমোহনকে স্বপ্ন দেন একটি মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য) গোপীমোহন ঠাকুর ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণাকালিকা-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর কন্যার নাম অনুযায়ী দেবীর নাম রাখেন 'শ্রীশ্রীব্রহ্মময়ী'। অবশ্য সাধক রামপ্রসাদের দেহত্যাগের অনেক পরে ঐ 'ব্রহ্মময়ী'-বিগ্রহ, 'রাধাকৃষ্ণ'-বিগ্রহ ও দ্বাদশ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। দেবী ব্রহ্মময়ীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হবার বহুপূর্বে শ্যামনগরেই আর একটি সিদ্ধেশ্বরী-বিগ্রহেরও প্রতিষ্ঠা করেন এটর্নী স্বর্গত চারুচন্দ্র বসুর পূর্বপুরুষগণ।

মনে রাখা উচিত যে, কুমারহট্ট-হালিশহরে প্রতিষ্ঠিত দেবী সিদ্ধেশ্বরীর মূর্তি শ্যামনগরে প্রতিষ্ঠিত দেবী ব্রহ্মময়ীমূর্তি অপেক্ষা বেশ প্রাচীন। তবে হালিশহরে প্রতিষ্ঠিত দেবী সিদ্ধেশ্বরীকে অবলম্বন ক'রেই রাণী রাসমণি হালিশহরে প্রথমে গঙ্গাতীরে দেবায়তনগুলি প্রতিষ্ঠা করতে মনস্থ করেছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠাসম্পর্কে লীলাপ্রসঙ্গে লিখেছেন: "রাণী ১২৫৫ সালে কাশী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সকল বিষয় স্থির হইলে যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্বে তিনি স্বপ্নে ৺দেবীর দর্শনলাভ এবং প্রত্যাদেশ পাইলেন—'কাশী যাইবার আবশ্যক নাই। ভাগীরথীতীরে মনোরম প্রদেশে আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা কর, আমি ঐ মূর্ত্যাশ্রয়ে আবির্ভূতা হইয়া তোমার নিকট হইতে নিত্য পূজা গ্রহণ করিব" (লীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, পৃ ৬৯—৭০)। শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ পুনরায় পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন: "কেহ কেহ বলেন, যাত্রা করিয়া রাণী কলিকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বরগ্রাম পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া নৌকার উপর রাত্রিবাস করিবার কালে ঐ প্রকার প্রত্যাদেশ লাভ করেন" (পৃ ৭০)। তিনি পুনরায় লিখেছেন: "সে যাহা হউক, ঐরূপ অসম্ভাবিত উপায়ে রামকুমারকে পূজকরূপে পাইয়া রাণী রাসমণি সন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, স্নানযাত্রার দিবসে মহাসমারোহে

১০। শ্রীশ্রীভবতারিণীকে প্রতিষ্ঠার পূর্বে।
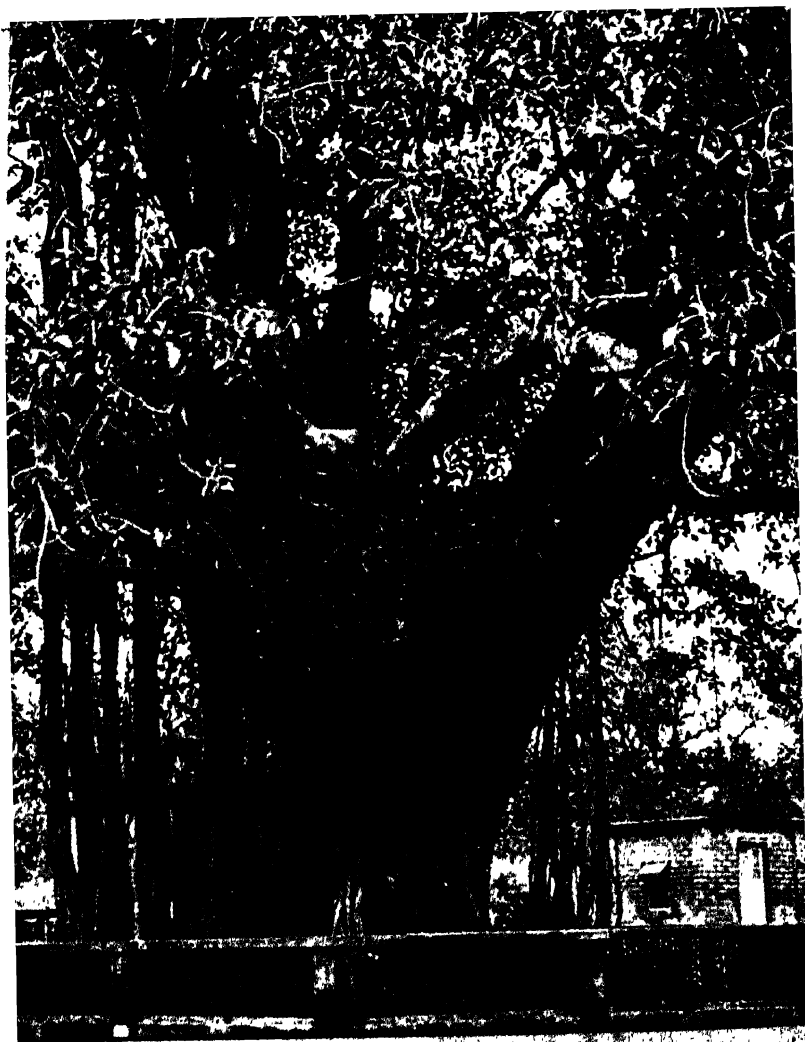
শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নবমন্দিরে (দক্ষিণেশ্বরে) প্রতিষ্ঠিত করিলেন। * * দেবালয় নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে রাণী নয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন" (পৃ: ৭৭)।[১১]

হালিশহরে প্রতিষ্ঠিত দেবী সিদ্ধেশ্বরীর ইতিহাস: বিখ্যাত সাবর্ণ-চৌধুরী-বংশের বিদ্যাধর রায়চৌধুরী প্রায় আজ হ'তে আড়াই শত বৎসর পূর্বে হালিশহরে দেবী সিদ্ধেশ্বরীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। কুমারহট্ট-হালিশহর-উচ্চবিদ্যালয়-শতবার্ষিকী স্মারক-গ্রন্থে উল্লেখ আছে: "আড়াই শতাধিক বৎসর পূর্বে বাজারপাড়ার গঙ্গাতীরে (বর্তমান নিগমানন্দ-সারস্বত-আশ্রমের ঠিক পশ্চিম-গাত্রে) চৌধুরীপাড়ার বিখ্যাত সাবর্ণ-চৌধুরী-বংশের বিদ্যাধর রায়চৌধুরী-কর্তৃক এই পাষাণময়ী কালিকামূর্তি (দেবী সিদ্ধেশ্বরী) প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি ঐ অঞ্চল 'কালিকাতলা' নামে অভিহিত। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে চৌধুরীবংশের তৎকালীনপ্রধানকে দেবী (সিদ্ধেশ্বরী) স্বপ্নাদেশে তাঁহাকে বাজারপাড়া হ'তে বলিদাঘাঠার গঙ্গাতীরে স্থানান্তরিত করিতে নির্দেশ দেন।" ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বলিদাঘাটার মন্দিরেরও সংস্কার সাধিত হয়। শোনা যায়, বিদ্যাধর রায়চৌধুরী প্রত্যহ গঙ্গাস্নানকালে একদিন একটি শিলাখণ্ড স্পর্শ করেন। স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে তিনি ঐ শিলাখণ্ডে বুড়োশিব, শ্যামরায় ও দেবী সিদ্ধেশ্বরী (কালীমূর্তি) এক ভাস্করের দ্বারা নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করেন।[১২] "পূর্বশিয়রে শায়িত মহাদেবের লম্বিত মূর্তির উপর প্রায় দশ ইঞ্চি উচ্চ দক্ষিণমুখী এই চতুর্ভুজা পাষাণময়ী (সিদ্ধেশ্বরী-) কালীমূর্তি বিরাজিত। খড়্গ-মুণ্ডধারিণী ও বরাভয়করা, লোলরসনা, আলুলায়িত কুন্তলা দেবী সিদ্ধেশ্বরীর দক্ষিণপদ শঙ্করের উদরের উপরিভাগে ও বামপদ (শঙ্করের)

১১। এ' প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে জগদম্বা দাসী (রাণী রাসমণির কন্যা ও মথুরবাবুর স্ত্রী) দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দির ও নাটমন্দিরের অনুরূপ একটি দেবায়তন নির্মাণ করেন বারাকপুরে বর্তমান গান্ধীঘাটের অনতিদূরে এবং তাতে অষ্টধাতুনির্মিত অন্নপূর্ণা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তখন জীবিত ছিলেন। মনে হয়, জগদম্বা দাসী দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের গঠনশৈলীর স্বপ্নমূর্তিকেই বাস্তবে রূপদান করেছিলেন।

১২। "চৌধুরী-বংশের জমিদার বিদ্যাধর রায় জাহাঙ্গীর বাদশাহের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি ভাগীরথীগর্ভ হইতে প্রাপ্ত একখানি কৃষ্ণপ্রস্তর হইতে বৈষ্ণবদিগের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণরাধামূর্তি ও নিজেদের কুলধর্মের ইষ্টদেবী কালিকামূর্তি নির্মাণ করান। এই কালিকামূর্তি 'সিদ্ধেশ্বরী' নামে বর্তমান বাজারপাড়ার নিকট গঙ্গাতীরে নবনির্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয় ও রাধাকৃষ্ণমূর্তি 'শ্যামরায়' নামে নিজেদের বসতি-পল্লী চৌধুরীপাড়ায় সংস্থাপিত হয়।"—'শতবার্ষিকী 'স্মারক-গ্রন্থ' (১৮৫৪-১৯৫৪), পৃ: ৩৪।

হৃদি'পরে স্থাপিত।" সর্বসিদ্ধিদাত্রী দেবী সিদ্ধেশ্বরী তখন থেকেই গ্রামের অধিষ্ঠাত্রীরূপে পূজিতা হ'য়ে আসছেন। তাছাড়া আর একটি পাষাণময়ী দক্ষিণকালিকা 'শ্যামাসুন্দরী'-মূর্তিও আজ থেকে প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে শ্যামাসুন্দরীতলায় (হালিশহরে) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[১৩]

সুতরাং নানা দিক থেকে নানা কারণে মনে করা যেতে পারে, মূলাজোড়-শ্যামনগরে স্বর্গত গোপীমোহন ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত পাষাণপ্রতিমা 'দেবী ব্রহ্মময়ী' (কালিকা), গোবিন্দজিউ ও দ্বাদশ শিবসহ দ্বাদশ মন্দির (১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত), কিংবা কুমারহট্ট-হালিশহরে আনুমানিক ১৭২৩-২৪ খ্রীস্টাব্দে সাবর্ণ-চৌধুরী-বংশীয় জমিদার বিদ্যাধর রায়চৌধুরী-প্রতিষ্ঠিত বাজারপাড়ায় পাষাণময়ী 'দেবী সিদ্ধেশ্বরী' (কালিকামূর্তি), শ্যামরায় (গোবিন্দজিউ) ও বুড়োশিব, অথবা মনে করা যায়, উভয় স্থানে (শ্যামনগরে ও হালিশহরে) প্রতিষ্ঠিত উভয় দক্ষিণাকালিকামূর্তি দেবী ব্রহ্মময়ী ও দেবী সিদ্ধেশ্বরী এবং অন্যান্য মূর্তি ও দেবায়তনগুলির গঠনপ্রকৃতি ও নির্মানকার্যের কল্পনা বা মানস-মূর্তি সে' সময়ে দক্ষিণেশ্বরকে মহাতীর্থে পরিণত করে (আনুমানিক ১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) এবং শ্রীশ্রীভবতারিণীর অপূর্ব পাষাণময়ী মূর্তি ও সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগোবিন্দজিউ ও দ্বাদশ মন্দিরে দ্বাদশ শিব প্রতিষ্ঠা করেন তদনুযায়ী পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণি।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এই 'বাণী ও বিচার'-গ্রন্থ (ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখনিঃসৃত বাণী ও উপদেশের বিচার ও বিশ্লেষণ) তাঁরই দর্শণচিন্তাকে অনুসরণ ক'রে রচিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনপীঠ ও লীলাকেন্দ্র কুমারহট্ট-হালিশহরের গঙ্গাতীরে না হ'য়ে কলকাতার সন্নিকটে দক্ষিণেশ্বরে রচিত হওয়ায় কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী স্থানের ধর্মপিপাসু ও দর্শনার্থী নর-নারী ও ভক্তগণের শ্রদ্ধানিবেদন করার পথকে সহজ ও সুগম করেছে। রাণী রাসমণি, শ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেন, শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতকার শ্রীম বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁর অন্তরঙ্গপর্ষদগণের সঙ্গে সঙ্গে অগণিত শ্রীরামকৃষ্ণভক্তবৃন্দের পুণ্যস্মৃতি এ' প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

১৩। এখানে উল্লেখযোগ্য, বর্তমানে ঐ সিদ্ধেশ্বরীদেবীর পাষাণমূর্তির সম্পূর্ণাংশ নাই (ভগ্নাবস্থায় আছে) এবং শ্যামাসুন্দরীর পাষাণমূর্তিও অপহৃত হয়েছে।

॥ সূচীপত্র ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ প্রাক্‌কথন ॥

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্রতম বাণীসম্ভার। এটি শ্রীম তথা মাষ্টার মহাশয় বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত-কর্তৃক অনুলিখিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে মাষ্টার মহাশয় বা শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের প্রথম সাক্ষাৎকার হয় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে। সে'দিন রবিবার। মাষ্টার মহাশয় লিখেছেন, (কথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৯; ১৩৬৬ সালের সংস্করণ) "গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি। মা-কালীর মন্দির। বসন্তকাল। ইংরেজী ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস।...২৩শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ঠাকুর স্টীমারে বেড়াইতে-ছিলেন। তাহারই কয়েকদিন পরে (রবিবার) সন্ধ্যা হয়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে মাষ্টার আসিয়া উপস্থিত। এই প্রথম দর্শন। দেখিলেন—একঘর লোক নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) কথামৃত পান করিতেছেন। ঠাকুর তক্তাপোশে বসিয়া পূর্বাস্য হইয়া সহাস্যবদনে হরিকথা কহিতেছেন। ভক্তেরা মেঝেয় বসিয়া আছেন।" পুনরায় প্রথম ভাগের (১৩৬৬) ২৩ পৃষ্ঠায় দেখি: "মাষ্টার সিধুর (সিদ্ধেশ্বর মজুমদার, উত্তর-বরাহনগরে বাড়ি ও মাষ্টার মহাশয়ের বন্ধু) সঙ্গে বরাহনগরে এই বাগানে (দক্ষিণেশ্বরের বাগানে) বেড়াইতে বেড়াইতে এখানে (দক্ষিণেশ্বরে) আসিয়া পড়িয়াছেন। আজ রবিবার—২৬ শে ফেব্রুয়ারী, ১৫ই ফাল্গুন, অবসর আছে, তাই বেড়াইতে আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যের বাগানে কিয়ৎক্ষণ পূর্বে বেড়াইতেছিলেন। তখন সিধু (সিদ্ধেশ্বর মজুমদার) বলিয়াছিলেন, গঙ্গার ধারে একটি চমৎকার বাগান আছে; সেই বাগানটি দেখিতে যাইবেন? সেইখানে একজন পরমহংস আছেন। বাগানে সদর-

ফটক দিয়া ঢুকিয়াই মাষ্টার ও সিধু বরাবর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে আসিলেন।" তারপর তৃতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীম লিখেছেন (১ম ভাগ) "দ্বিতীয় দর্শন সকাল বেলা, আটটার সময়। ঠাকুর তখন কামাইতে যাইতেছেন।...মাষ্টারকে দেখিয়া বলিলেন—'তুমি এসেছ? আচ্ছা, এখানে বসো'।"

শ্রদ্ধেয় মাষ্টার মহাশয় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গ করেছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের প্রথম ভাগে প্রকাশক যে শ্রীম-র সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেছেন তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন: "শ্রীম নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বহু কাল্পনিক নামের সাহায্য লইয়াছেন—মনি, মোহিনীমোহন, একজন ভক্ত, মাষ্টার, শ্রীম, ইংলিশ ম্যান ইত্যাদি। কিন্তু লেখকের ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি কোথাও নাই।" পুনরায় উল্লেখ করেছেন: "একদিন মায়ের (শ্রীশ্রীসারদাদেবীর) আদেশে শ্রীম তাঁহাকে শুনাইলেন। তাহাতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, শ্রীম-কে আশীর্বাদ করিলেন এবং ঠাকুরের কথা প্রকাশ করিতে আদেশ দিলেন।... 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম-কথিত' নাম ধারণ করিয়া তত্ত্বমঞ্জরী, বঙ্গদর্শন, উদ্বোধন প্রভৃতি তৎকালীন প্রচারিত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। পরে এই সব একত্র করিয়া স্বামী ত্রিগুণাতীত-কর্তৃক উদ্বোধন প্রেস হইতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ১ম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।"

সম্ভবত ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রথম প্রকাশিত হবার পর শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর দৃষ্টিগোচর হয় এবং মাষ্টার মহাশয়ও একদিন সেই কথামৃত পড়ে শ্রীমাকে শুনিয়েছিলেন। তিনি ১৩০৪ সালে ২১শে আষাঢ় শ্রীম-কে আশীর্বাদী পত্রে সেজন্য লিখেছিলেন—

"বাবাজীবন—

"তাঁহার (শ্রীশ্রীঠাকুরের) নিকট যাহা শুনিয়াছিলে সেই কথাই সত্য। ইহাতে তোমার কোন ভয় নাই।...ঐ সকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে না জানবে।...একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।"

শ্রদ্ধেয় মাষ্টার মহাশয় (শ্রীম) শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের প্রথম ভাগের

(প্রথম খণ্ডের) প্রথম পরিচ্ছেদে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি ও উদ্যানের চাক্ষুষ পরিচয় দিয়েছেন পাঠক-পাঠিকাদের ভাবচক্ষে ও হৃদয়ে সেই পবিত্র দৃশ্য ও স্মৃতি জাগ্রত রাখার জন্য। তিনি যেভাবে কালীবাড়ি ও উদ্যান, চাঁদনী ও দ্বাদশ শিবমন্দির, পাকা-উঠান ও বিষ্ণুঘর, শ্রীশ্রীভবতারিণী মা কালী, নাট্য-মন্দির, প্রভৃতির (পৃষ্ঠা ১০-১৯) চিত্ররূপ অঙ্কিত করেছেন তা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের প্রতিটি পাঠক-পাঠিকার স্মৃতিফলকে চিরদিন জাগ্রত থাকবে ও তাদের জীবনকে প্রদীপ্ত করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গলীলাপার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেব-সম্বন্ধে Memoirs of Ramakrishna-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে লিখেছেন,

"Bhagavan Sri Ramakrishna lived for many years in Rani Rashmani's celebrated temple-garden on the eastern bank of the Ganges in the village of Dakshineswara about four miles north of Calcutta. This temple with the garden attached was dedicated by its foundress (Rani Rashmani) to the Divine Mother (Kali). In the northwest corner of the spacious temple-compound is a small room which faces, on the west, the water of the sacred river the Ganges. This room with its holy surroundings was consecrated as the dwelling place for many years of Bhagavan Sri Ramakrishna, whose divine presence made the spot holier and more sacred. It was from this retired corner that the rays of his divine glory, emanating from his God-intoxicated soul, dazzled the eyes of the seekers after Truth and attracted them to him as a blazing fire attracts moths from all quarters. Hundreds of educated men and women were drawn towards this superhuman personality to listen with the deepest reverence to the words of wisdom uttered by one who had realized God who and lived in constant communion with the Divine Mother of the universe."

'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গার পূর্বপারে অবস্থিত রাণী রাসমণির কালী-মন্দিরে বহু বৎসর অতিবাহিত করেছিলেন। কলকাতার নিকটেই চার মাইলের মধ্যে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম। রাণী রাসমণি দেবী শ্রীশ্রীভবতারিণীর উদ্দেশ্যে মন্দির ও বাগানবাড়ি উৎসর্গ করেছিলেন। বিস্তৃত মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি ক্ষুদ্রায়তন-ঘর ও তার পশ্চিমে গঙ্গার পুণ্য সলিলধারা প্রবাহিত। ঐ ছোট ঘরটি বহুদিনযাবৎ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাসের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল এবং তাঁর পবিত্র স্পর্শে তা আরও পবিত্রোজ্জ্বল হয়েছিল। সেই ছোট ঘরটির অধিবাসী ছিলেন ঈশ্বরজ্ঞানদীপ্ত এক মহামানব—যাঁর অঙ্গসৌরভে ও পবিত্র স্পর্শে স্থানটি মহিমোজ্জ্বল হয়েছিল; সেই গৃহের সংস্পর্শে যে সকল সত্যানুসন্ধিৎসু ধর্মপাগল ভক্ত-মানুষেরা আসতেন তাঁরা কৃতকৃতার্থ বোধ করতেন এবং যে আত্মজ্ঞানদীপ্ত দিব্যমানুষ সেখানে থাকতেন তাঁর প্রজ্জ্বলিত অগ্নিস্পর্শ সকল জ্ঞান পিপাসু মানুষকেই সেদিকে আকর্ষণ করতো। শত সহস্র শিক্ষা-সংস্কৃতিপ্রদীপ্ত মানুষ সেই মহনীয় ব্যক্তিত্ববান লোকটির চার পাশে সমবেত হোত ও তাদের অন্তরের প্রগাঢ় শ্রদ্ধাঞ্জলি তাঁর প্রতি নিবেদন করতো। সেই মহনীয় চরিত্রের অলৌকিক মানুষটি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার করেছিলেন এবং সর্বদাই বিশ্বজননী আদ্যাশক্তির ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন বলে তাঁর অগ্নিগর্ভ বাণীর মধ্যে থাকত এক প্রাণস্পন্দিত জাগ্রত ভাব—যা প্রতিটি মানুষকেই প্রভাবিত ও পবিত্র করতো।'

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আবার বলেছেন,

"The mission of Bhagavan Sri Ramakrishna was to show by his living example how a truly spiritual man, being dead to the world of senses, can live on the spiritual plane of Godconsciousness. It was to prove that each individual soul is immortal and potentially divine. His mission was to establish harmony between religious sects and creeds. For the first time it was absolutely demonstrated by Ramakrishna that all religions are like so many paths leading to the same goal, that the realization of the same Almighty Being is the highest ideal of Chris-

tianity, Mohammedanism, Judaism, Zoroastrianism, Hinduism as well as of all other smaller religions of the world. Sri Ramakrishna's misson was to proclaim the eternal Truth that God is one but has many aspects, and that the same one is worshipped by different nations under various names and forms; that He is personal, impersonal and beyond both; that He is with name and form and yet nameless and formless. His mission was to establish the worship of the Divine Mother and thus to elevate the ideal of womanhood into Divine Motherhood. His mission was to show by his own example that true spirituality can be transmitted and that salvation can be obtained through the grace of a Divine Incarnation. His mission was to declare before the world that psychic powers and the power of healing are obstacles in the path of the attainment of Godconsciousness.

*　　*　　*

The days of prophecy have passed before our eyes. The manifestations of the divine powers of one who is worshipped today by thousands as the latest Incarnation of Divinity, we have witnessed him with our eyes. Blessed are they who have seen and touched his holy feet. May the glory of Sri Ramakrishna be felt by all nations of the earth; may his divine power be manifested in the earnest and sincere soul of his devotees of all ages to come, is the prayer of his child and servant, ABHEDANANDA."

'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ছিল—তাঁর নিজের জীবনের আদর্শ দিয়ে ('আপনি আচরি ধর্ম জীবকে শিখায়') যথার্থ আত্মানুসন্ধিৎসু যারা তাদের পথ নির্দেশ করা। পথ নির্দেশ করা এভাবে যে, মানুষ যে সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে পৃথিবীর বস্তুসমূহ ভোগ করে তাদের

রূপান্তরিত ক'রে তাদের শ্রীভগবানের দিকে নিয়মিত করা। শুধু তাই নয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজের জীবনাদর্শ দিয়ে প্রমাণ করেন যে, প্রতিটি মানুষের জীবনসত্তাই পবিত্র, চিরশুদ্ধ ও অবিনশ্বর। তা ছাড়া তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্যই ছিল বিশ্বে সকল রকম ধর্মমত ও ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে একটি মধুর মিলনসম্পর্ক স্থাপন করা।

'শ্রীরামকৃষ্ণদেবই সর্বপ্রথমে প্রচার করেন যে, সকল ধর্মই সেই একটি মাত্র পরমলক্ষ্যে উপনীত হবার পথ এবং সর্বোত্তম সত্তা ঈশ্বরকে বা আত্মাকে উপলব্ধি করাই খ্রীষ্টান, মুসলমান, ইহুদী, পারসী ও হিন্দু সকলসম্প্রদায়ের চরম ও পরম লক্ষ্য। বিশ্বের যেখানে যত ধর্মমত আছে তাদেরও উদ্দেশ্য ঐ এক। আসলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল এই চরমসত্যের প্রচার ও প্রমাণ করা যে, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, কিন্তু তাঁর রূপ ও বিকাশ বিচিত্র। অদ্বিতীয় ঈশ্বরকেই আবার বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন নামে ও রূপে পূজা করছে। সেই ঈশ্বর নাম ও আকারযুক্ত, আবার কোন নাম ও আকার তাঁর মধ্যে নাই। তিনি নিরাকার, নির্গুণ ও চিৎসত্তাবিশেষ। তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের ও সাধনার উদ্দেশ্যেই ছিল আদ্যাশক্তির উপাসনার প্রবর্তন করা বিশ্বে এবং সেই প্রবর্তনের দ্বারা প্রমাণ করা যে, নারীমাত্রেই আদ্যাশক্তির প্রতিমূর্তি এবং নারীজাতি বিশ্বের শক্তিস্বরূপিণী। তাঁর নিজের সাধনাদীপ্ত জীবনের আদর্শ দিয়ে এ সত্যও তিনি প্রমাণ করেছেন যে, অধ্যাত্মতত্ত্ব জাগ্রত ও অপরে সংক্রমিত করা যায় এবং ঈশ্বরাবতারে বিশ্বাস ও প্রপত্তি-নিবেদনের দ্বারা মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়। তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যাবির্ভাবের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বে প্রচার করা যে, অধ্যাত্মশক্তির জাগরণ দ্বারা বিশ্বের সকল শক্তিকেই আয়ত্ত ও নিয়ন্ত্রিত করা যায় এবং তাহা দ্বারা ঈশ্বরানুভূতিরূপ চরমজ্ঞান লাভ করা সম্ভব।'

* * *

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ আরও বলেছেন: 'আমাদের জীবনেই লক্ষ্য করছি অবতারগণের বাণীর সত্যতা সফল হতে চলেছে! বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারের পবিত্রোজ্জ্বল মহিমা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছি। সুতরাং তাঁরাই ভাগ্যবান ও পুণ্যবান্ যাঁরা সেই ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেছেন ও তাঁর পবিত্র চরণ স্পর্শ করেছেন। প্রার্থনা করি—যেন ভগবান

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যমহিমা বিশ্বের সকল মানুষ ও সকল জাতিই প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করে ও তাঁর আদর্শ জীবনে বরণ করে! প্রার্থনা করি—যেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যশক্তি বিশ্বের প্রতিটি সহজ-সরল-বিশ্বাসী মুক্তিকামীর অন্তরে সঞ্চারিত হয়। শুধুই বর্তমানে নয়, অনাগত ভবিষ্যতে অসংখ্য যুগের মানুষের মধ্যে প্রসারিত হোক তাঁর বাণী এবং এ প্রার্থনাই জাগ্রত ও ফলপ্রসূ হোক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই একান্ত শরণাগত সন্তান ও দাস অভেদানন্দের।'

তাই শ্রদ্ধেয় শ্রীম-লিখিত অমর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ-লিখিত ভাবদীপ্ত গ্রন্থ Memoirs of Ramakrishna, পুণ্যশ্লোক অক্ষয়কুমার সেন-লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণজীবনকাব্যগ্রন্থ 'শ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি' ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গলীলাপার্ষদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ-লিখিত মহামূল্য শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীভাষ্যগ্রন্থ 'শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ-'এর প্রাণময়ী কথা ও কাহিনী! যতদিন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহিমোজ্জ্বল জীবন ও বাণীর আদর্শ পৃথিবীতে বর্তমান থাকবে ততদিন ঐ চারটি মহাগ্রন্থরূপ অনির্বাণ-দীপশিখাও প্রজ্জ্বলিত থাকবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিরস্মরণীয় আবির্ভাবের সার্থকতা ও মাধুর্যকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ মানুষের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ॥

"ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) কেশবকে (কেশবচন্দ্র সেন) বলিতেছেন: 'তুমি প্রকৃতি দেখে শিষ্য করো না, তাই এইরূপ ভেঙ্গে যায়।'

মানুষগুলি দেখতে সব এক রকম, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। কারো ভিতরে সত্ত্বগুণ বেশী, কারো রজোগুণ বেশী, কারো তমোগুণ। পুলিগুলি দেখতে সব এক রকম, কিন্তু কারোর ভিতর ক্ষীরের পোর, কারোর ভিতর নারিকেল-ছাঁই, কারোর ভিতর কলায়ের পোর (সকলের হাস্য)।

আমার কি ভাব জানো? আমি খাই-দাই থাকি, আর সব মা জানে। তিন কথাতে গায়ে কাঁটা বেঁধে—গুরু, কর্তা আর বাবা।

গুরু এক সচ্চিদানন্দ। তিনিই শিক্ষা দেবেন। আমার সন্তানভাব। মানুষগুরু মেলে লাখ লাখ। সকলেই গুরু হতে চায়, শিষ্য কে হতে চায়?"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ (১৩৬৬), পৃ: ৬১-৬২

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'গুরুগিরি ও গুরু এক সচ্চিদানন্দ' এই তত্ত্বের আলোচনা করছেন ও সে-সম্বন্ধে শিক্ষা দিচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টি ছিল প্রখর ও তত্ত্বাভিমুখী, তাই যে-কোন মানুষকে দেখলেই তিনি বুঝতে পারতেন তার স্বভাব বা প্রকৃতি কী ধরনের ছিল। তিনি বলতেন: "কাঁচের পরকোলার ভিতর দিয়ে দেখলে যেমন সব দেখা যায় ভিতরে কী আছে, তেমনি যেসব লোক আসে, তাদের দেখলেই আমি বুঝতে পারি—কেউ শিবভক্ত, কেউ বিষ্ণুভক্ত প্রভৃতি, আর তাই বুঝে তাদের

আমি শিক্ষা দেই।" সত্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেব শিক্ষা দিতেন যে যেমন লোক তাকে তেমনি ভাবে। কেউ জ্ঞানবাদী ও বিচারী, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট গেলে তিনি তাকে জ্ঞান-বিচারের কথা বা অদ্বৈতবেদান্তের কথা শিক্ষা দিতেন। যাদের মন কর্মপ্রবণ, তাদের কর্মের অর্থাৎ নিষ্কামকর্মের কথা শিক্ষা দিতেন; যারা ভক্ত—তাদের শিক্ষা দিতেন ভক্তির কথা; আবার যোগসম্বন্ধে যারা জিজ্ঞাসু, তাদের শিক্ষা দিতেন তিনি যোগের কথা। মোটকথা একই লোকের সঙ্গে সকল রকম তত্ত্ব নিয়ে তিনি আলোচনা করতেন না, সকল মানুষকেই তিনি তাদের নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষা দিতেন। তাই 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-গ্রন্থ সকল শ্রেণীর জিজ্ঞাসু অধিকারীকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যা শিক্ষা দিতেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাদেরই সংকলন মাত্র। তারজন্য এটা ঠিক নয় যে, 'কথামৃতে' যে ধর্মের ও তত্ত্বের আলোচনা আছে সে সকলগুলিই একজন লোকের জন্য নির্দিষ্ট। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভিন্ন ভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন রকমের শিক্ষা দিতেন ও তাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। অসংখ্য রকমের ফুল নিয়ে যেমন ফুলের স্তবক বা তোড়া তৈরী হয়, শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখনিঃসৃত বিচিত্র রকমের বাণী, আলোচনা ও উপদেশের সমষ্টি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তীক্ষ্ণ মনোবৈজ্ঞানিকী দৃষ্টি ছিল অসাধারণ রকমের। যেকোন মানুষ জিজ্ঞাসু, ভক্ত, বিচারী, জ্ঞানী, কর্মী, যোগী—তাঁর কাছে উপস্থিত হতেন, তিনি তাঁদের প্রকৃতি বুঝতে পারতেন এবং তাঁদেরকে সে-রকমভাবেই উপদেশ দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষদের তুলনা করেছেন পুলিপিঠের সঙ্গে। পুলিপিঠে দেখতে একই রকমের, কিন্তু তাদের মধ্যে পোরের বিভিন্নতা থাকে, যেমন—কারোর মধ্যে ক্ষীরের, কারোর মধ্যে নারিকেল-ছাঁইয়ের, আবার কারো ভিতর কলাইয়ের পোর। তেমনি মানুষকে দেখতে এক রকমের হলেও তাদের মধ্যে স্বভাব বা প্রকৃতির ভিন্নতা থাকে: কারো মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, কারোর মধ্যে রজোগুণ ও কারো মধ্যে তমোগুণ। সাংখ্যদর্শন ও অন্যান্য দর্শনে সত্ত্ব ও তমোগুণ নিয়ে বিচার আছে যে, সত্ত্বগুণের কার্য প্রকাশ, নির্মলতা, সাম্য, অর্থাৎ সকল-কিছুই কল্যাণজনক; রজোগুণের কার্য কর্ম-চঞ্চলতা, উৎসাহ, পটুতা প্রভৃতি এবং তমোগুণের কার্য জড়তা, অপটুতা, ভীরুতা প্রভৃতি। প্রতিটি মানুষের

মধ্যে তিনটি গুণেরই কিন্তু সমাবেশ থাকে, তবে তাদের মধ্যে কোন কোন গুণের আধিক্য বা প্রাধান্য থাকে মাত্র। তবে মোটামুটিভাবে মানুষের কারো কারো মধ্যে সত্ত্ব ও রজোগুণের প্রকাশ, কিংবা সত্ত্ব ও তমোগুণের প্রকাশ, অথবা রজঃ ও তমোগুণের প্রকাশ থাকে। কেবলই সত্ত্বগুণের প্রকাশ ও প্রসন্নতা একমাত্র ঈশ্বরে থাকে বলে ঈশ্বরকে বলা হয় শুদ্ধসত্ত্বের প্রকাশ বা শুদ্ধসত্ত্বগুণসম্পন্ন চৈতন্য। কেবলমাত্র সত্ত্বগুণের প্রকাশ থাকে বলেই ঈশ্বর শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ, মায়ামালিন্যহীন ও মায়াধীশ। মানুষের মধ্যে কিন্তু কেবল সত্ত্বগুণের প্রকাশ বা প্রাধান্য থাকে না, তাই রজঃ কিংবা তমোগুণের সঙ্গে সত্ত্বগুণ একত্র হয়ে থাকে। তবে জীবন্মুক্ত—যাঁরা পৃথিবীতে থাকা-কালেই মায়ার বন্ধন ছিন্ন ক'রে আত্মোপলব্ধির আশীর্বাদ লাভ করেন, তাঁদের অবস্থা অনেকটা ঈশ্বরেরই মতো। তাঁরা অজ্ঞানলেশরূপ পার্থিবশরীর নিয়ে মায়ার সংসারে থাকলেও সংসারে লিপ্ত ও মোহিত হন না, সংসারে সাক্ষীরূপেই থাকেন—যেমন পাঁকাল মাছ পাঁকের মধ্যে থাকে, কিন্তু পাঁক বা কাদা তার গায়ে লাগে না। এই জীবন্মুক্ত মনীষীদের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকে, কিংবা কেবল শুদ্ধসত্ত্বেরই প্রকাশ থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিচার-বিশ্লেষণী জ্ঞানদৃষ্টির সামনে সমাগত মানুষের বা ভক্তের যে ধরনের প্রকৃতি প্রতিভাত হয়ে উঠতো, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাকে তার কল্যাণের জন্য সে ধরনেরই উপদেশ বা শিক্ষা দিতেন। এটি জহুরী জহর চেনার মতোই দৃষ্টান্ত। যথার্থ বিজ্ঞানী গুরু তিনি, যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন ও আত্মজ্ঞান লাভ ক'রে জীবনকে চিরপ্রদীপ্ত করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিষ্যের অন্তরের ভাবও বুঝতে পারেন।

আত্মজ্ঞানের আশীর্বাদ যিনি লাভ করেছেন তিনি ব্যথিত হন তাদের জন্য—যারা অজ্ঞানের অন্ধকারে বাস ক'রে নশ্বর দেহ ও পার্থিব সম্পদকেই অবিনশ্বর আত্মা বলে জ্ঞান করে ও ভ্রমে পতিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই জ্ঞানোপলব্ধির উত্তুঙ্গ শিখরে সমাসীন থেকেই জ্ঞানদাতা গুরুর স্বরূপ কি তার বিচার করেছেন ও বলেছেন: "লোকশিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন আর আদেশ দেন, তাহলে হতে পারে। নারদ ও শুকদেবাদির আদেশ হয়েছিল। শঙ্করের আদেশ হয়েছিল। আদেশ না হলে কে তোমার কথা শুনবে?"

আবার বলেছেন: "মনে মনে আদেশ হলে হয় না। তিনি সত্য সত্যই সাক্ষাতকার হন (ঈশ্বর দেখা দেন), আর কথা কন। তখন আদেশ হতে পারে।"

পুনরায় বলেছেন: "লোকশিক্ষা দেবে, তার চাপরাস চাই। না হলে হাসির কথা হয়ে পড়ে। আপনারই হয় না, আবার অন্যলোক। কানা কানাকে পথ দেখিয়ে লয়ে যাচ্ছে। * * ভগবান লাভ হলে অন্তর্দৃষ্টি হয়, কার কি রোগ বোঝা যায়। তখন উপদেশ দেওয়া যায়।"

এই উপদেশগুলির মধ্যে 'কানা কানাকে পথ দেখিয়ে লয়ে যায়' কথাগুলি কঠোপনিষদে (১:২।৫) উল্লিখিত 'অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ' কথারই হুবহু প্রতিফলন। কঠোপনিষদের সম্পূর্ণ শ্লোকটি হোল—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতংমন্যমানাঃ।
চন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

অর্থাৎ 'অবিদ্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে সাধারণ বিবেক-বিচারহীন মানুষ নিজেকে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী বলে মনে করে, কিন্তু সে মনে করা ভ্রম, কেননা একমাত্র আত্মজ্ঞানের উপলব্ধি না হলে মানুষ যথার্থ বিবেক ও জ্ঞান লাভ করতে পারে না, আর না পারার জন্য জন্মমৃত্যুরূপ 'বাঁকাপথে' বা চক্রপথেই যাতায়াত করে—যেমন অন্ধ লোকের দ্বারা পরিচালিত হলে মানুষ অন্ধের মতোই গর্তে পতিত হয়ে বিনষ্ট হয়।' সাধক কবিরও অনুরূপভাবে বলেছেন,

অন্ধে গুরু অন্ধে চেলা
দোনো নরকমে ঠেল্লাম ঠেলা॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব উপনিষৎ বা কোন শাস্ত্র, ভাষ্য ও টীকা পড়েন নি, কিন্তু তাঁর প্রজ্ঞাচক্ষুর সম্মুখে সকল শাস্ত্র বা শাস্ত্রতত্ত্বই প্রতিভাত হোত। দেদীপ্যমান ব্রহ্মজ্ঞানরূপ সূর্য অন্তঃকরণাকাশে উদিত হলে অন্ধকারের অবসানে সকল-কিছুর জ্ঞানই আপনা-আপনি প্রকাশিত হয়। উপনিষৎ তাই বলেছে: 'একস্মিন বিজ্ঞাতে সর্ববিজ্ঞাতং ভবতি'। গীতা (২।৪৬) অন্যভাবে সেকথার পুনরাবৃত্তি করেছে,

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥

যেমন মহাপ্লাবন এলে ভিন্ন ভিন্ন কূপাদি ও ক্ষুদ্র জলাশয়াদি জলে প্লাবিত হতে বাকী থাকে না, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধি হলে বিশ্বের সকল জ্ঞানই অধিগত হয়।

এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের নিম্নলিখিত কথার সার্থকতা অনেক বেশী। তিনি বলেছেন: "ভগবান লাভ হলে অন্তর্দৃষ্টি হয়, কার কি রোগ বোঝা যায়। তখন উপদেশ দেওয়া যায়।" কথাগুলি অতি সত্য। ঈশ্বর লাভ না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্দৃষ্টি খোলে না। অন্তর্দৃষ্টির অর্থ আত্মদৃষ্টি বা যথার্থদৃষ্টি—যে দৃষ্টির সামনে বিশ্বের সকল সমস্যার নিমেষে সমাধান হয়। এই অন্তর্দৃষ্টির অপর নাম প্রজ্ঞাদৃষ্টি। প্রজ্ঞাদৃষ্টি ছিল বলেই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব বা প্রকৃতি বুঝতে পারতেন ও সেই বোঝার ও নিজের অনুভবের অনুযায়ী সকলকে সেই সেই ভাবে তিনি শিক্ষা দান করতেন। তিনি প্রকৃতি ও স্বরূপ-সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলছেন: "আমার কি ভাব জানো? আমি খাই-দাই থাকি, আর সব মা জানে। আমার তিন কথাতে গায়ে কাঁটা বেঁধে—গুরু, কর্তা আর বাবা।"

"আমি খাই-দাই থাকি, আর সব মা জানে" কথাগুলি রহস্যময় ও তত্ত্বপূর্ণ। এই তত্ত্বপূর্ণ কথায় ও স্বীকৃতিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বতন্ত্র একটি ধর্ম ও দর্শন-তত্ত্বের ভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তন্ত্রসাধনা, বৈষ্ণবসাধনা, সুফীধর্মের সাধনা ও অন্যান্য ধর্মসাধনার সঙ্গে সঙ্গে সকল রসের (শান্ত, মধুর প্রভৃতি) ও সকল ভাবের (সখ্য, দাস্য প্রভৃতি) সাধনা করার পর বেদান্ত সাধনা করেও তিনি ভাবমুখে অবস্থান করেছিলেন লোককল্যাণ-সাধনের জন্য। তিনি শ্রীশ্রীভবতারিণীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন—'মা, আমায় ভাবমুখে রাখিস্', কিংবা 'মা, শুষ্ক জ্ঞানের চেয়ে আমায় রসে-বসে রাখিস্'। এই যে অদ্বৈতজ্ঞানলাভের পরও বিশ্বরূপিণী মা শ্রীশ্রীভবতারিণীর কাছে আত্মসমর্পণ করা—শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে এ একটি অনন্যসাধারণ ও অভিনব দৃষ্টান্ত। এ ভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখি—শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈততত্ত্ব সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ, বিশ্বগত-বিশ্বাতীত এক ও অদ্বৈত চরমবস্তুর উন্মীলন ও নিমীলন অথবা আবির্ভাব ও তিরোভাবকে (প্রকাশ-

অপ্রকাশ বা ব্যক্ত-অব্যক্তকে) নিয়ে পূর্ণ ও সার্থক। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের পূর্ণ-আলোচনার স্থান এখানে নয়, তবে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন ও উপলব্ধ অদ্বৈততত্ত্ব একথাই প্রকাশ করে যে, যিনি শিব বা ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি বা কালী। প্রকাশ ও বিমর্শ একটি টাকারই এপিঠ এবং ওপিঠ। একই সাপ স্থির, আবার চঞ্চল। একই পরমসত্য বা পরমতত্ত্ব সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ ও চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন, আবার তাছাড়া আরও কত-কিছু হয়েছেন, এবং সে হওয়া বা বিবর্তন একই সত্যের বা তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ মাত্র,—যেমন একই ব্যক্তি কখনও রাজার অভিনয় করে, কখনও ভৃত্যের অভিনয় করে, কিন্তু অভিনয়কারী ব্যক্তি এক, অভিনয়কর্ম মাত্র ভিন্ন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব গুরু, কর্তা প্রভৃতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন: "গুরু এক সচ্চিদানন্দ। তিনিই শিক্ষা দেবেন। আমার সন্তানভাব।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টিতে গুরু যিনি, তিনিই ইষ্ট; গুরু ও ইষ্টে কোন ভেদ নাই। তন্ত্র ও অপরাপর সাধনমূলক দর্শনের ঐ এক কথা। তন্ত্রে আজ্ঞা-চক্রের নীচে দ্বাদশদলবিশিষ্ট একটি পদ্মের মধ্যে শ্রীগুরুর স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। শ্রীগুরু জ্যোতির্ময় ও জ্ঞান বা বিজ্ঞানের স্বরূপ। ঐ জ্ঞানময় গুরুই ইষ্ট। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভিমত তাই—'গুরু এক সচ্চিদানন্দ'—সৎ + চিৎ + আনন্দ-স্বরূপ; অর্থাৎ সগুণ-ব্রহ্ম হলেন ঈশ্বর, আর ঈশ্বরকে উপলক্ষণ ক'রে বিশুদ্ধ-জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্যই গুরু। মনুষ্যগুরু ঐ পরমগুরুর প্রতিনিধি। মনুষ্য-গুরুকেও তাই দিব্য-আত্মজ্ঞানে প্রদীপ্ত হতে হয়। গুরুগীতায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে: 'গু' অর্থে অন্ধকার (অজ্ঞান-অন্ধকার) এবং 'রু' অর্থে অজ্ঞান-অন্ধকারকে উন্মীলন বা অপসারণ যিনি করেন তিনিই গুরু। কিন্তু যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন না, তিনি অজ্ঞান-বন্ধনেই আবদ্ধ থাকেন, সুতরাং তাঁর অপরের অজ্ঞান-বন্ধন দূর করার শক্তি নাই। এরাই অজ্ঞানী মনুষ্যগুরু। এদের সম্বন্ধেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "মানুষ-গুরু মেলে লাখ লাখ। সকলেই গুরু হতে চায়। শিষ্য কে হতে চায়?" প্রচলিত কথায়ও আছে—'গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা না মিলে এক।' তাই শিক্ষাদাতা গুরু সকলেই হতে চায় জীবনসিদ্ধিরূপ আত্মজ্ঞান লাভ না করেও। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ ধরনের গুরু-প্রকৃতির প্রশংসা করেন নি, তিনি বলেছেন: "আদেশ না পেলে 'আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি' এই অহঙ্কার হয়। অহঙ্কার আসে অজ্ঞান থেকে।

অজ্ঞানে বোধ হয়—'আমি কর্তা', কিন্তু আসলে ঈশ্বরই কর্তা। ঈশ্বরই সব করছেন, আমি কিছুই করছি না—এই বোধ হলে জীবন্মুক্তি হয়। 'আমি কর্তা'-বোধ থেকেই সৃষ্টি হয় যত দুঃখ ও অশান্তির।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকল শাস্ত্রের সার দিব্য-অনুভূতির কথাই বারবার বলেছেন। জীবন্মুক্ত হওয়া কঠিন। সাধন-ভজনে চিত্ত শুদ্ধ ক'রে অজ্ঞানের পারে গেলে তবে মুক্তি কিনা অজ্ঞান বা মায়াপাশ দূর হয় এবং অজ্ঞান বা মায়া দূর হলেই দিব্যজ্ঞান ও মুক্তির আশীর্বাদ লাভ হয়। আচার্য শঙ্কর ও শঙ্করানুসারী অদ্বৈতবেদান্তীরা একথাই বলেছেন। বলেছেন, অজ্ঞান-অপসারণই ব্রহ্মোপলব্ধি, কেননা ব্রহ্ম সিদ্ধবস্তু ও স্বয়ম্প্রকাশ, কোন কর্মের দ্বারা, কিংবা কোন সাধনা-ও-যত্নের ফলশ্রুতি-রূপে ব্রহ্মবস্তু লভ্য ও প্রাপ্তব্য নন। তিনি প্রকাশিত আছেনই, কেবল সাধনার দ্বারা অজ্ঞান দূর হলেই ব্রহ্মসূর্য প্রকাশিত হন। যেমন মেঘ সূর্যকে আবৃত করে, মেঘ সরে গেলেই সূর্য আপনা থেকে প্রকাশিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব জীবন্মুক্তির প্রসঙ্গে জ্ঞান ও অজ্ঞানের নিদর্শন দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, অকর্তা—এই জ্ঞান হলেই মুক্তি এবং কর্তা—এই জ্ঞান থাকলেই বন্ধন। একটিতে হয় অহং-জ্ঞানের বিলোপ ও অহং-জ্ঞানের নাশে স্বতঃপ্রকাশ-শীল দিব্যজ্ঞানের প্রকাশ এবং অপরটিতে হয় অজ্ঞানের আবরণ। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, যিনি এই জীবনেই ঈশ্বর বা ব্রহ্মানুভূতি লাভ করেছেন, তিনি জীবন্মুক্ত ও তিনি সত্যকার সচ্চিদানন্দস্বরূপ গুরু। কিন্তু অজ্ঞানী মনুষ্যগুরু নিজেও বদ্ধ থাকেন, অপরের বন্ধনও (অজ্ঞানও) দূর করতে অসমর্থ হন। তারই জন্য তিনি বলেছেন: "লোকশিক্ষা দেবে—তার চাপরাস চাই।" এই চাপরাসই ঈশ্বরজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান লাভ না করলে যথার্থ গুরু হওয়া যায় না। মনুষ্যগুরুর মধ্যে আবার শ্রেণীভাগ আছে, যেমন—উত্তম-গুরু, মধ্যম-গুরু ও অধম-গুরু। উত্তম-গুরু তাঁরা—যাঁরা আত্মজ্ঞান লাভ ক'রে অজ্ঞানের পারে গেছেন। কিংবা ঈশ্বরাবতার বা অবতারসংকল্প পুরুষেরা উত্তম-গুরু। শ্রীশঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ এঁরা উত্তম-গুরু। মধ্যম-গুরু তাঁরা—যাঁরা সাধনশীল ও আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য সর্বদা ব্রহ্ম-বিচার করেন, আর অধম-গুরু তাঁরা—যাঁরা ঈশ্বর দর্শনে আগ্রহী নন, অজ্ঞানের মধ্যে বাস করেন, অথচ অপরের অজ্ঞান দূর করার ভান করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব উত্তম, মধ্যম ও অধম বৈদ্যের উদাহরণ দিয়ে মন্ত্রদাতা ও জ্ঞানদাতা গুরুকেই লক্ষ্য করেছেন। উত্তম-বৈদ্য রোগীকে নিরাময় করার জন্য জোর ক'রে ঘাড়ে বসে ঔষধ খাওয়ান। উত্তম-বৈদ্যই সদ্‌গুরু বা উত্তম-গুরু। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সদ্‌গুরুলাভের জন্য শিক্ষা দিয়েছেন। বলেছেন, একমাত্র উত্তম বা সদ্‌গুরুই শিষ্যকে সংসার-সমুদ্রের পারে নিয়ে যেতে পারে। উত্তম-গুরুই শিষ্যের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর ক'রে মুক্তির পথ দেখাতে পারেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ জীবের অহংকারই মায়া ॥

"বিজয়কৃষ্ণের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন: "জীবের অহংকারই মায়া। এই অহংকার সব আবরণ ক'রে রেখেছে। 'আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল'। যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেল তাহলে সে ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই।

এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্য সূর্যকে দেখা যায় না, মেঘ সরে গেলেই সূর্যকে দেখা যায়। যদি গুরুর কৃপায় একবার অহং-বুদ্ধি যায়, তাহলে ঈশ্বরদর্শন হয়।

আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র—যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, মধ্যে সীতারূপিণী মায়া ব্যবধান আছে বলে লক্ষ্মণ-রূপ জীব সেই ঈশ্বরকে দেখতে পান নাই। এই দেখ, আমি এই গামছাখানা দিয়ে মুখের সামনে আড়াল করছি, আর আমায় দেখতে পাচ্ছ না। তবু আমি এত কাছে। সেইরূপ ভগবান সকলের চেয়ে কাছে, তবু এই মায়া-আবরণের দরুন তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না।

জীব তো সচ্চিদানন্দস্বরূপ। কিন্তু এই মায়ায় বা অহংকারে তাদের সব নানা উপাধি হয়ে পড়েছে, আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে।

জ্ঞানলাভ হলে অহংকার যেতে পারে। জ্ঞান লাভ হলে সমাধিস্থ হয়। সমাধিস্থ হলে তবে অহং যায়। সে জ্ঞান লাভ বড় কঠিন"।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ (১৩৬৬), পৃঃ ৯৪-৯৫

অদ্বৈতবেদান্তে মায়ার প্রসঙ্গ আছে। এই মায়াকে আচার্য শঙ্কর 'অধ্যাস' বলেছেন। 'অধ্যাস' কিনা 'অতস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধিঃ' অর্থাৎ যা—যা নয়, তাকে

তাই বলে দেখা ও অনুভব করার নাম অধ্যাস। রজ্জু সর্প নয়, শুকনো কাঠের গুঁড়ি ভূত নয়, বিশ্বসংসার সত্য নয়, অথচ রজ্জুকে সর্প বলে, কাঠের গুঁড়িকে ভূত বলে এবং চলমান ও অনিত্য বিশ্বসংসারকে নিত্য ও সত্য বলে মনে (ভুল অনুভব) করার নাম অধ্যাস। আচার্য শঙ্কর এই অধ্যাসকে মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান, ভ্রম, মিথ্যাজ্ঞান, অনির্বচনীয়া ঈশ্বরশক্তি বলেছেন। মায়া নিয়ে আলোচনা করেছেন বলে অনেকে আচার্য শঙ্করকে মায়াবাদী বলেন। কিন্তু মায়াবাদ তিনি প্রতিষ্ঠা করেন নি, প্রতিষ্ঠা করেছেন ব্রহ্মবাদ, এজন্য শঙ্করকে ব্রহ্মবাদী বলা উচিত।

অনেকে ইংরেজীতে মায়াকে 'ইলুউসন' (illusion) বলেন, কিন্তু মায়ার প্রকৃত ইংরেজী প্রতিশব্দ 'ডেলিউসন্' (delusion)—মিথ্যাজ্ঞান বা 'ফলস্-নলেজ' (false knowledge)। বেদান্তে আছে, মায়া ও অবিদ্যা দু'রকম: ঈশ্বরে যে অজ্ঞান তার নাম 'মায়া' ও জীবে যে অজ্ঞান তার নাম 'অবিদ্যা'—সমষ্টি ও ব্যষ্টি। সাংখ্যদর্শনে এ' অজ্ঞান বা মায়াকে সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ—ত্রিগুণাত্মক 'প্রকৃতি' বলা হয়েছে। তিন গুণের সমষ্টিই প্রকৃতি। সাংখ্যে প্রকৃতি স্বতন্ত্রা ও জড়া।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব মায়াকে অহংকার, অহং-জ্ঞান, ইত্যাদি বলেছেন। 'অহং'-এর অপর নাম 'আমি' বা আমিত্ববোধ। এই আমিত্ববোধই (আত্মার) উপাধি—যাকে ইংরেজীতে বলে adjunct। উপাধিকে আশ্রয় ক'রে, বা উপাধির জন্য মানুষ নিজেকে মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র ও আত্মীয়-স্বজন বলে জ্ঞান করে; ভাবে যে, ঈশ্বর থেকে সে ও সকলে আলাদা বা পৃথক। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, জলের উপর একটি লাঠি ফেললে জলটা আলাদা হয়ে যায়। তখন হয় এদিকের জল আর ওদিকের জল। ঐ লাঠিটাই উপাধি কিনা অজ্ঞান বা মায়া। আসলে জল একটাই। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "জীব তো সচ্চিদানন্দস্বরূপ, কিন্তু এই মায়ায় বা অহংকারে তাদের সব নানা উপাধি হয়ে পড়েছে, আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে।" এই স্বরূপ ভোলার নাম ভ্রম বা অজ্ঞান।

কথাটি সত্য। অহংবোধরূপ অজ্ঞানের বা মিথ্যাজ্ঞানের জন্য জীব যে চিরমুক্ত শিব, মায়াতীত ব্রহ্ম—এ'তত্ত্ব অনুভব করতে পারে না। মায়া বা অজ্ঞানের জন্য সদসদ্‌বিচারও বন্ধ হয়ে যায়, আর তখনই মানুষ ভ্রমে পড়ে।

বিস্তীর্ণ বালুচরে বা মরুভূমিতে জল নাই, কিন্তু জলের চাকচিক্য-রূপ মরীচিকা মানুষ দর্শন করে ভ্রম বা ভ্রান্তির জন্য। তাই মিথ্যা ও অযথার্থ বস্তুকে সত্য ও যথার্থ বলে মনে করি ভ্রান্তি বা অজ্ঞানের জন্য। আচার্য শঙ্কর বেদান্তদর্শনের উপক্রমণিকায় অধ্যাসভাষ্যে ভ্রমকে 'মিথ্যাপ্রত্যয়' বলেছেন। মিথ্যাপ্রত্যয় কিনা ভ্রমজ্ঞান—যা মায়া বা অজ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মায়া বা অজ্ঞানকে 'অহং' বা 'মিথ্যা আমি-জ্ঞান' বলেছেন। এই অহং বা আমিত্ববোধই মেঘের মতো সূর্য-রূপ ব্রহ্মকে আড়াল (আবৃত) করে রেখেছে—যার জন্য ব্রহ্মের সত্যকার রূপকে আমরা বুঝতে বা অনুভব করতে পারি না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণ তথা পরমাত্মা, মায়া (মহামায়া) ও জীবের উদাহরণ দিয়েছেন। জীব বা জীবাত্মা পরমাত্মার চিরমুক্ত স্বরূপ মায়ার জন্য উপলব্ধি করতে পারে না, কিন্তু সীতাদেবী সরে দাঁড়ালে লক্ষ্মণ যেমন রাম চন্দ্রকে দর্শন করেন, তেমনি অজ্ঞান দূর হলে পরমাত্মারূপী ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়।

এই মায়ার প্রকৃত স্বরূপ কি? বেদান্তদর্শনে মায়াকে সৎ, অসৎ বা সদসৎ বলে নি, বলেছে অনির্বচনীয়, অর্থাৎ যাকে ঠিক ঠিক ভাবে নির্বাচন ও নির্ধারণ করা যায় না। অথচ মায়া ভাবরূপ কিনা 'কিছু-একটা' আছে, তবে তা কি ঠিক বলা যায় না। মায়া যদি সৎ হোত, তবে সকল সময়েই মায়াকে দেখা ও অনুভব করা যেত এবং মায়িক পদার্থও চিরকাল আমাদের সামনে উপস্থিত থাকত। প্রকৃতপক্ষে মায়া বা মায়িক পদার্থ চিরকাল সংসারে থাকে না। তারপর মায়া যদি অসৎ হোত, তবে মায়া ও মায়িক পদার্থকে কোনদিনই দেখা ও অনুভব করা যেত না, কিন্তু মিথ্যা হলেও মানুষের ভ্রমজ্ঞান হয়। তারপর মায়া সদসৎ-ও নয়; অর্থাৎ মায়া কখনো আছে ও কখনো নাই—এ'রকম নয়, কেননা তাহলে ভ্রম বা মায়িক পদার্থ কখনও অনুভব হোত, আবার কখনও অনুভব হোত না। কিন্তু তা হয় না। সুতরাং মায়া অনির্বচনীয়া কিনা মায়ার স্বরূপ যে কী তা যথার্থভাবে বলা ও নির্ণয় করা কঠিন। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী বলদেব বিদ্যাভূষণ মায়াকে বলেছেন—অচিন্ত্য। তবে অনির্বচনীয় বা অচিন্ত্য মায়াও ঈশ্বরের ও আত্মজ্ঞানী গুরুর কৃপায় দূর হয়—এ'কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন:

(ক) "যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেল তা হলে

সে ব্যক্তি জীবন্মুক্ত হয়ে গেল"। (খ) "যদি গুরুর কৃপায় একবার অহং-বুদ্ধি যায়, তাহলে ঈশ্বর দর্শন হয়"।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্য সূর্যকে দেখা যায় না, মেঘ সরে গেলেই সূর্যকে দেখা যায়। মায়ার সঙ্গে আবরণ-রূপ মেঘের ও ব্রহ্মের সঙ্গে সূর্যের তুলনা করেছেন—যা অধিকাংশ বেদান্তগ্রন্থ এ' উদাহরণই দিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে বেদান্ত-শাস্ত্র পড়েন নি, তবে শুনতেন পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ সাধকদের কাছ থেকে—যাঁরা আসতেন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে, কিংবা কাশীপুর-বাগানে। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের মেঘ ও সূর্যের উদাহরণ বেদান্তসারের উদাহরণের মতো। বেদান্তসারে সদানন্দ যতি বলেছেন এ'ভাবে—

"আবরণশক্তিঃ তাবৎ অল্পঃ অপি মেঘঃ অনেকযোজনায়তং আদিত্যমণ্ডলং অবলোকতৃনয়নপথপিধায়কতয়া যথা আচ্ছাদয়তি ইব, তথা অজ্ঞানং পরিচ্ছিন্নম্ অপি আত্মানং অপরিচ্ছিন্নম্ অসংসারিণং অবলোকয়িতৃবুদ্ধিপিধায়কতয়া আচ্ছাদয়তি ইব তাদৃশং সামর্থ্যম্।"

তারপর সদানন্দ যতি শ্রদ্ধেয় শঙ্কর-শিষ্য হস্তামলকের একটি বাক্য উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন: "তদুক্তম্—

ঘনচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনচ্ছন্নমর্কম্
যথা নিষ্প্রভম্মন্যতে চাতিমূঢ়ঃ।
তথা বদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥"

'মেঘ সামান্য হলেও যেমন অনেক যোজন বিস্তৃত সূর্যমণ্ডলকে (দৃষ্টিকারী) মানুষের চক্ষু আবৃত করে, তেমনি অজ্ঞানের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হলেও অপরিচ্ছিন্ন অসংসারী আত্মাকে যেন আবৃত করে ও মানুষ তার জন্য মনে করে আত্মা নাই। ঠিক এ রকমই হস্তামলকও বলেছেন যে, মেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন বা আবৃত অতি মূঢ় ব্যক্তি যেমন সূর্যকে মেঘাচ্ছন্ন ও নিষ্প্রভ মনে করে, তেমনি যিনি মূঢ়দৃষ্টি ব্যক্তির নিকটে বদ্ধের মতো প্রকাশিত হন তিনি সেই নিত্য-উপলব্ধিস্বরূপ আত্মা। এর নাম আবরণশক্তি। এই আবরণশক্তিই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আত্মাকে যেন আবৃত করে। সদানন্দ যতির 'আচ্ছাদয়তি ইব' কথাটি সম্বন্ধে টীকাকার বলেছেন: 'আচ্ছাদকত্বেন অজ্ঞানস্য আত্মাচ্ছাদকত্বম্

উপচারাৎ', অর্থাৎ আচ্ছাদন বা আবরণ করাটা উপচার বা কল্পিত হলেও আমরা দেখি, মানুষ বুদ্ধি ও প্রতিভার অধিকারী, অথচ নিজের স্বরূপ যে চিরমুক্ত আত্মা তা উপলব্ধি করতে পারে না। এর নাম অজ্ঞান বা অবিদ্যা। এই অজ্ঞানের নাম ভুলজ্ঞান বা ভ্রম। ভুলজ্ঞান বা ভ্রমের জন্যই মানুষ দড়িকে সাপ বলে মনে করে; সূর্যকে মেঘে ঢেকে থাকলে মনে করে সূর্য নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন, সামান্য মেঘের জন্য সূর্যকে দেখা যায় না, কিন্তু সূর্য আকাশেই থাকে। যেমন সূর্য আকাশে থাকে, তেমনি সংসারে মায়ার মধ্যেও আত্মার বিকাশ ও সত্তা সর্বদাই থাকে—এ তত্ত্ব জানার নাম জ্ঞান। জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশ ও সর্বদাই প্রকাশিত। এই জ্ঞান লাভ করার জন্য গুরুকৃপা প্রয়োজন। গুরু জ্ঞানস্বরূপ। গুরুর কৃপা বলতে গুরু শিষ্যের অজ্ঞান দূর করেন জ্ঞানের প্রকাশ দিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "যদি গুরুর কৃপায় একবার অহং-বুদ্ধি যায়, তাহলে ঈশ্বর দর্শন হয়।" অহং-বুদ্ধিই অজ্ঞান বা অজ্ঞানের আবরণ। শিষ্য যদি জ্ঞানময় গুরুর শরণাপন্ন হয় তবেই গুরু কৃপা করেন এবং এই কৃপার নাম জ্ঞানচক্ষুর উন্মোচন। কৃপা একটি অবস্থাকে অপেক্ষা করে হয় এবং সেই অবস্থা হলো প্রপন্নতা, অর্থাৎ গুরুর নিকট শিষ্যের শরণাগত। শরণাগতির অবস্থায় অহং থাকে না, তখন অহংভাব মুছে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এটি শিক্ষা দেবার জন্য বলতেন—নাহং নাহং, তুহুঁ তুহুঁ, অর্থাৎ আমি নয়,—তুমি। 'আমি'-র অহংকার বা অন্ধকার তখন প্রপন্নতারূপ 'তুমি'-র আলোকে দূর হয়। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এই গুরুকৃপা, ঈশ্বরকৃপা বা কৃপার অবস্থাকে' 'a state of relaxation'—'এক বন্ধনহীন বুদ্ধিসমর্পিত সহজ অবস্থা বলেছেন। জ্ঞানময় গুরুর শরণাপন্ন হলে কৃপা হয়। চৈতন্যময় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হলে চৈতন্য হয়। তার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "জীব তো সচ্চিদানন্দস্বরূপ।" অহংজ্ঞান বা অজ্ঞান থাকা পর্যন্ত মানুষ তার সৎ চিৎ-আনন্দস্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না। তার জন্য অজ্ঞানের পারে যেতে হয় বিচারের দ্বারা জ্ঞানের জ্যোতির্ময় আলোক লাভ ক'রে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "জ্ঞানলাভ হলে সমাধিস্থ হয়। সমাধিস্থ হলে তবে অহং যায়।" বিচারের পর ধ্যান, ধ্যান পাকা বা গভীর হলে সমাধি এবং সমাধি গভীর হলে বা নির্বিকল্পসমাধি হলে আত্মজ্ঞান ও মুক্তি হয়। সবিকল্পসমাধিতে

একেবারে অহং যায় না, অর্থাৎ 'অহং'-এর সংস্কার বা বীজ নষ্ট হয় না। নির্বিকল্প বা নির্বীজ-সমাধিতে অহং-সংস্কার সমূলে নষ্ট হয়। তখনই যথার্থ জ্ঞান লাভ হয়। নির্বিকল্পসমাধি হলে মানুষ ইচ্ছা করলে আবার মুক্ত (জীবন্মুক্ত) অবস্থায় মায়ার সংসারে থাকতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "সে জ্ঞান লাভ করা বড় কঠিন।" 'সে জ্ঞান লাভ' বলতে নির্বিকল্পসমাধিতে যথার্থ জ্ঞান লাভ বুঝায়। সে জ্ঞান লাভ করা কঠিন এজন্য, এতটুকু অজ্ঞানের সংস্কার থাকতে নির্বিকল্পসমাধি হয় না, আর নির্বিকল্প-সমাধি না হলে যথার্থ জ্ঞান লাভ হয় না। যদিও যোগের নির্বিকল্পক জ্ঞান ও বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার প্রণালী একটু ভিন্ন, তবুও উভয়ের চরমফল এক ও অভিন্ন।

পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, অহং—অহংকার বা অজ্ঞান না গেলে জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হয় না, কিন্তু এই অহং বা অজ্ঞান যায় জ্ঞানময় গুরুর কৃপা লাভ হলে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "যদি গুরুর কৃপায় একবার অহং-বুদ্ধি যায় তাহলে ঈশ্বরদর্শন হয়।" ঈশ্বরদর্শন ও আত্মজ্ঞান লাভ এককথা।

এখন জানা দরকার গুরু কে? ঈশ্বর কে? সাধারণভাবে আমরা জানি যে, যিনি বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেন, পালন করেন ও ধ্বংস করেন, তিনিই ঈশ্বর। এই ঈশ্বরকে তিন রকম কর্মসাধনের জন্য পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বলা হয়। এই তিন দেবতা ও ত্রিত্ববাদ (Trinity) ক্রীশ্চান প্রভৃতি ধর্মেও আছে। অদ্বৈতবেদান্ত ঈশ্বরকে ঠিক সৃষ্টিকর্তা বলে নি। অদ্বৈত-বেদান্তের মতে, ঈশ্বর সৃষ্টির প্রথম প্রকাশ। কারণ অজ্ঞান বা সৃষ্টির বীজ অব্যক্ত আকারে ব্রহ্মে থাকে বলে ঈশ্বর। ঈশ্বরচৈতন্যকে মায়াধীশ সগুণ-ব্রহ্ম বলে। ঈশ্বর যেন সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনরূপ, অথচ সাংখ্যের পুরুষ থেকে অদ্বৈতবেদান্তের ঈশ্বর পৃথক। আবার সৃষ্টির বীজ ঈশ্বরে অব্যক্ত (unmanifested) আকারে থাকে বলে ঈশ্বরকে 'অব্যক্ত'ও বলা হয়। মায়ার নামও অব্যক্ত। ঈশ্বরের আর এক নাম 'প্রজ্ঞা'। সৃষ্টির বীজ ব্যক্ত আকারে প্রকাশ পায় হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মায়। পুরাণাদিতে এই হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মাকে বা হিরণ্যগর্ভ-ঈশ্বরকে চতুর্মুখ প্রজাপতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর (চারিদিকের) স্রষ্টা বলে তিনি চতুর্মুখ। পুরাণে

ঈশ্বর ক্ষীরোদসাগরে শায়িত নারায়ণরূপে বর্ণিত। ক্ষিরোদসমুদ্র সৃষ্টির কারণ বা কারণসলিল। বেদে এর নাম বরুণ এবং ছায়াপথও। পুরাণকাররা বর্ণনা করেছেন কারণসলিলে শায়িত নারায়ণের পদসেবা করছেন স্বয়ং লক্ষ্মী, অর্থাৎ প্রকৃতি। এটি রূপক বর্ণনা। নারায়ণরূপী ঈশ্বর যে মায়াধীশ এবং প্রকৃতি তাঁর অধীন এটাই 'লক্ষ্মী নারায়ণের পদসেবায়রত' বর্ণনায় বোঝানো হয়েছে। নারায়ণের নাভিকমল থেকে চতুর্মুখ ব্রহ্মার জন্ম। অর্থাৎ নারায়ণই স্রষ্টারূপে যে প্রজাপতি-ব্রহ্মা একথা বোঝানো হয়েছে। পুরাণ, বেদ ও উপনিষদের সত্য, তথ্য ও তত্ত্বকেই রূপকে আখ্যানের আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। পুরাণও তাই ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত—যদিও অনেক জায়গায় পুরাণ ও ইতিহাসকে আলাদা ক'রে পৃথকভাবে বোঝানো হয়েছে। সে যাই হোক, ঈশ্বর আসলে মায়াধীশ, তাই সকল গুণের আকর হলেও তিনি সকল-কিছুরই অতীত। তিনি ভিন্ন ভিন্ন যুগে অবতাররূপে আত্মপ্রকাশ করেন জীবের কল্যাণ-সাধনের জন্য। গীতায় একথাই বলা হয়েছে অবতার-তত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটন ক'রে। গীতার ঈশ্বর ক্ষর ও অক্ষরের অতীত পুরুষোত্তম।

কিন্তু গুরু কে? গুরু হচ্ছেন তিনি যিনি শরণাগত শিষ্যের 'গু' কিনা অজ্ঞান-অন্ধকার 'রু'—উন্মীলন বা দূর ক'রে আত্মজ্ঞান দান করেন। মানুষমাত্রে তাই গুরু-পদবাচ্য হতে পারেন না। স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, যিনি অজ্ঞান বা মায়ার বন্ধন মুক্ত ক'রে আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন তিনিই যথার্থ গুরু হতে পারেন। অজ্ঞান দূর করার শক্তি ও সামর্থ্য যে মানুষের মধ্যে থাকে এবং নিজে যিনি অজ্ঞানবন্ধন মুক্ত করেন তিনিই যথার্থ গুরু। তন্ত্র গুরু ও ইষ্টকে এক ও অভিন্ন বলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—"আমি অকর্তা" এই জ্ঞান হলে মায়ার বন্ধন দূর হয় ও জীবনকালেই মানুষ মুক্ত হয়ে 'জীবন্মুক্ত' নামে অভিহিত হয়। শাস্ত্রে মুক্তির নানান্ রকম সংজ্ঞা ও অর্থ আছে। আচার্য শঙ্কর, সাংখ্যকার কপিল ও শঙ্করপন্থী দার্শনিকদের অনেকে জীবন্মুক্তি স্বীকার করেছেন। মণ্ডন মিশ্র, ভাস্করাচার্য ও অনেক ব্রহ্মপরিণামবাদীরা বিদেহমুক্তি স্বীকার করেছেন। বিদেহমুক্তি কিনা শরীরপাতের পর ঈশ্বরজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা। অনেকে জীবন্মুক্তির পর বিদেহমুক্তি স্বীকার করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "জ্ঞানলাভ হলে সমাধিস্থ হয়। সমাধিস্থ হলে তবে অহং যায়। সে জ্ঞানলাভ বড় কঠিন।"

বেদান্ত ও যোগদর্শন দুটি পৃথক শাস্ত্র—যদিও আত্মস্বরূপ ও মুক্তির কথা উভয়েই বলেছে। অনেকে বেদান্তে যোগের সার্থকতা স্বীকার করেন। কঠ প্রভৃতি উপনিষদে ও ব্রহ্মসূত্রে যোগ, ধ্যান প্রভৃতির উপযোগিতা স্বীকার করা হয়েছে। তবে বেদান্তে 'মহাবাক্য' বা ব্রহ্মের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের কথাই আছে অজ্ঞানের নাশ ও জ্ঞানের প্রকাশের জন্য। বেদান্ত বলে, জ্ঞান সর্বদাই আছে ও স্বতঃপ্রকাশ, কেবল অজ্ঞানের জন্য তাকে জানা যায় না। তাই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের সাহায্যে অজ্ঞান-আবরণ দূর করতে হয় ও তাহলেই স্বপ্রকাশ আত্মা বা ব্রহ্ম প্রকাশিত হন—মেঘের আবরণ সরে গেলে যেমন সূর্য প্রকাশিত হয়। তবে পতঞ্জলি যোগদর্শনে যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগসাধন ও মনের নিরোধের কথা বলেছেন সবিকল্পসমাধির পর নির্বিকল্পসমাধিতে আত্মস্বরূপের উপলব্ধির জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও নির্বিকল্প বা নির্বীজ সমাধির কথা বলেছেন মুক্তিলাভের জন্য। নির্বিকল্পসমাধিকে অসম্প্রজ্ঞাতসমাধিও বলে। সমাধিতে যোগসাধক মনের সকল বৃত্তি নিরুদ্ধ ক'রে আত্মার বিশুদ্ধ রূপদর্শনও উপলব্ধি করেন। স্বামী অভেদানন্দ তাঁর *True Psychology*; *Yoga Psychology*; *Yoga, Its Theory and Practice* ও বিশেষ ক'রে *Doctrine of Karma*-গ্রন্থের Appendix বা পরিশিষ্টে যোগশাস্ত্রে নিরুদ্ধ করার প্রণালীকে ন্যায়সঙ্গত বলে স্বীকার করেন নি। শ্রীঅরবিন্দও তাই বলেছেন। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: 'You cannot suppress or kill the mind, but you can transform the mind'। মনকে চৈতন্যে রূপান্তরিত করার কথাই স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমাধির কথা আত্মজ্ঞান লাভের উপায়রূপে বলেছেন। তিনি বলেছেন—'সমাধিস্থ হলে তবে অহং যায়'। এই অহং বা অহংবোধই অজ্ঞান বা মায়া। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বক্তব্য হোল, অহংজ্ঞান বা মায়ার পারে না গেলে জীবের মুক্তি হয় না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ অমৃতসাগরে যাবার অনন্ত পথ ॥

"শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন : 'দেখ, অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ। যেকোন প্রকারে হউক এ'সাগরে পড়তে পারলেই হোল। মনে কর—অমৃতের একটি কুণ্ড আছে। কোন রকমে এই অমৃত একটু মুখে পড়লেই অমর হবে—তা তুমি নিজে ঝাঁপ দিয়েই পড়, বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেমে একটু খাও, বা কেউ তোমায় ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক। একই ফল। একটু অমৃতের আস্বাদন করলেই অমর হবে।

'অনন্ত পথ—তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি। যে পথ দিয়ে যাও, আন্তরিক হলে ঈশ্বরকে পাবে।"

—শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ (১৩৬৬), পৃঃ ১৭৫।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব অমৃত-সাগরের কথা বলেছেন—সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য ও মুক্তিই মানব-জীবনের সার—তা বোঝানোর জন্য। সংসারে যত-কিছু করি না কেন, সকল করার মধ্যে যদি ঈশ্বরকে না পাই ও ঈশ্বরকে লাভ ক'রে সংসার বা মায়ার বন্ধন ছিন্ন করতে না পারি তাহলে মনুষ্যজীবন বৃথা। জীবনের যিনি কেন্দ্রস্বরূপ, জীবনের যিনি পরম-উৎস, তাঁকে না জানলে বা না পেলে জীবনের সার্থকতা কোথায়! সকল কর্ম ও জীবনের প্রেরণা যে সেই কেন্দ্র থেকে আসছে, একমাত্র তিনিই যে যন্ত্রী, আমরা সকলে যন্ত্রস্বরূপ, তাঁর প্রেরণা পেয়েই পৃথিবীর সকল-কিছু সচল বা কর্মচঞ্চল হয় একথা অনুভব করা প্রয়োজন। এ অনুভব না করার জন্য দায়ী অজ্ঞানতা—যাকে আমরা মায়া বা মোহ বলি। মায়াই বিচিত্র কর্মসংসার সৃষ্টি ক'রে আমাদের ভুলিয়ে

রেখেছে, জানতে দিচ্ছে না সত্যকার আমরা কি বা কে, কেনই বা আমরা মানুষের রূপ ধ'রে সংসারে এসেছি। তাই ব্যাকুলতা নিয়ে সাধন-ভজন করতে হয়। তবে সাধনপথও একটি নয়, অসংখ্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মোটামুটি তিন রকম সাধনপথ বা যোগের কথা বলেছেন। 'যোগ' কিনা কর্ম করার উপায় বা কৌশল—যা আত্মা ও পরমাত্মা, জীব ও ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক পাতায় ও তাঁদের স্বরূপ জানিয়ে দেয়। আমার সঙ্গে ঈশ্বর বা ভগবানের কী সম্পর্ক, ঈশ্বর আমা থেকে ভিন্ন নন—কি ভিন্ন এ সকল কথা জানিয়ে দেয় যোগ এবং সঙ্গে সঙ্গে যোগ জানিয়ে দেয়, তিনি অন্তর্যামী, তিনিই সকলের অন্তরে থেকে সকল কর্মের প্রেরণা যোগাচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই তিনটি প্রধান সাধনপথ বা যোগের কথা বলেছেন। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির পথ—জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ। এই তিনটি সাধনপথ বা যোগের সম্বন্ধে শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের নিজের কথায় বলি :

"**জ্ঞানযোগ**—জ্ঞানী ব্রহ্মকে জানতে চায়। নেতি নেতি বিচার করে। বিচারের শেষ যেখানে সেখানে সমাধি হয় আর ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

"**কর্মযোগ**—কর্ম দ্বারা ঈশ্বরে মন রাখা। * * অনাসক্ত হয়ে প্রাণায়াম, ধ্যান-ধারণাদি কর্মযোগ। সংসারী লোকেরা যদি অনাসক্ত হয়ে ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে, তাঁতে ভক্তি রেখে সংসারের কর্ম করে, তাও কর্মযোগ। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে পূজা-জপাদি কর্ম করার নামও কর্মযোগ। ঈশ্বর-লাভই কর্মযোগের উদ্দেশ্য।

"**ভক্তিযোগ**—ঈশ্বরের নাম-গুণ কীর্তন। এই সব ক'রে তাঁতে মন রাখা। কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ সহজ পথ। ভক্তিযোগই যুগধর্ম।"

পূর্বে এ তিন যোগ বা সাধনপথের সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সহজ কথায় ও সরল ভাষায় জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এ তিন যোগের কথা বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব জ্ঞানযোগের প্রসঙ্গে বলেছেন : "জ্ঞানী ব্রহ্মকে জানতে চায়।" কিন্তু জ্ঞানী কে—এ নির্ধারণ করা কঠিন। জ্ঞান যার আছে সেই জ্ঞানী। এখন জ্ঞান কি? ঘটি, বাটি ও সংসারের যাবতীয় বস্তু-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার নাম কি জ্ঞান? হ্যাঁ, এ সবই জ্ঞান। তবে এ সকলগুলি পার্থিব জ্ঞান, বা ইহজগতের জ্ঞান। পার্থিব জ্ঞান যদিও স্বরূপে ঈশ্বরজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া অন্য-কিছু নয় তবুও সাংসারিক

জ্ঞান নিয়ে সংসার-বন্ধনের পারে যাওয়া যায় না। সংসার-বন্ধনকে মুক্ত ক'রে মায়ার পারে যেতে গেলে অপার্থিব ঈশ্বরজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন। জ্ঞান একটাই, তবে সে জ্ঞানের বিষয় বা আধেয় হয় পার্থিব সামগ্রী বা অপার্থিব ঈশ্বর, আত্মা বা ব্রহ্ম। পার্থিব সামগ্রী বা বস্তু জ্ঞানের আধেয় হলে সে জ্ঞান হয় জাগতিক, আর ঈশ্বর বা ব্রহ্ম জ্ঞানের আধেয় হলে সে জ্ঞান হয় ঈশ্বরজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। তাই যথার্থ জ্ঞানী হলেন তিনি—যিনি ঈশ্বরকে জানতে চান ও ঈশ্বরকে জেনে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান। জ্ঞান-রূপ দর্পণ মায়ার মালিন্যে (ধূলিজালে) মলিন হলে ব্রহ্মময়ীর মুখ (রূপ) দেখা যায় না। তাই ধূলি-মালিন্য 'নেতি নেতি' বিচারের সাহায্যে জ্ঞান-রূপ (বা মন-রূপ) দর্পণ থেকে সরিয়ে ফেলতে হয়, তবেই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম উপলব্ধির বিষয় হন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "(জ্ঞানী) নেতি নেতি বিচার করে। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—এই বিচার করে। সদসৎ বিচার করে।" নেতি—'ন ইতি'—এই জগতের সকল বস্তুই অনিত্য ও ক্ষয়শীল, কোন বস্তুই সত্য বা নিত্য নয়, কেবল ঈশ্বর বা ব্রহ্মই নিত্য ও সত্য। এর নাম যথার্থ বিচার। এ বিচারের কথাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন। নইলে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সাধারণ মানুষ জড়দেহ, মাতা-পিতা-স্বজন-পরিজন ও সংসারের অনিত্য সকল জিনিসকেই নিত্য ও সত্য বলে মনে করে, আর সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর বা ভগবানকে ভুলে যায়। এটাই অজ্ঞান বা মায়া। জ্ঞানযোগ বিচারের পথ। বিচারের পথে স্থির করতে হয়—যে বস্তুর ক্ষয়-ব্যয় আছে, যে বস্তু আজ আছে কাল নাই, তা অনিত্য, আর নিত্য ও সত্য বস্তু ঈশ্বর বা ব্রহ্ম—যিনি অক্ষয়, অব্যয় ও সর্বদা প্রকাশশীল ও সত্তাবান। জ্ঞানপথ অত্যন্ত কঠিন ও দুর্গম, তাই এ পথে বিচরণ করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়। তবে যিনি বিচারবান ও জ্ঞানী, তাঁর কথা স্বতন্ত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কর্মযোগের কথাও বলেছেন। কর্মযোগ কিনা কর্মই যোগ, অর্থাৎ ঈশ্বরলাভের পথ ও সাধন। কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এক কথাই বলেছেন যে, অনাসক্ত হয়ে সংসারে কর্ম কর। কিন্তু আসক্তি না রেখে কর্ম করা বড় কঠিন, কেননা সাধারণভাবে মনে আসক্তি ও অভিমান আসারই কথা। বিচারী শাস্ত্রপাঠ করেন ও বিচার করেন ঈশ্বরলাভের জন্য।

কিন্তু পাণ্ডিত্যের অভিমান ও অহংকার হৃদয়ে থেকে যায় ঈশ্বরনিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি না থাকলে। সেই পাণ্ডিত্যকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—আলুনি। ধ্যান-ভজন করছ, প্রাণায়াম ও জপ করছ, কিন্তু অজ্ঞাতসারে আমি একজন ভক্ত ও সাধনশীল তপস্বী—এই 'আমি'-র অভিমান ও অহংকার মনে থাকে। তাই ঈশ্বরের কাছে মন ও প্রাণ এক ক'রে প্রার্থনা করতে হয়—যাতে মন থেকে অহংকার দূর হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বিশেষভাবে স্বার্থহীন কর্মযোগের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, কর্মের সংসারে কর্ম না করা অন্যায়, আবার কর্ম ক'রে কর্মের ফলে আসক্ত হওয়াও অন্যায়। তাই কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ ক'রে সংসারে কর্ম করলে ফলকামনাহীন কর্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় ও সেই শুদ্ধ চিত্তে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন। তিনি কৃপাও করেন। এই কৃপার অর্থ সাধক বা ভক্ত ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ ও সত্তা উপলব্ধি করেন। এরই নাম কর্মযোগ। কর্মসাধনার রহস্য এই যে, কর্মের মধ্যে মন রাখতে হবে, আবার ঈশ্বরের দিকেও মন রাখতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, ঈশ্বরলাভই কর্মযোগের অর্থাৎ নিষ্কামকর্মের উদ্দেশ্য।

তারপর ভক্তিযোগের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "ঈশ্বরের নাম-গুণ কীর্তন—এই সব ক'রে তাঁতে মন রাখা কিনা মনকে তদ্‌গতচিত্ত করা। তখন ঈশ্বর ছাড়া মনে আর কোন চিন্তাই থাক্‌বে না। ঈশ্বরকে লাভ করা বা আত্মাকে উপলব্ধি করাই তখন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়। ঈশ্বরের গুণ গান করা, ঈশ্বরকে ভক্তি করা, ঈশ্বরকে স্মরণ-মনন করা—এটাই ভক্তিযোগ বা ভক্তিপথের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, কলিতে মানুষ অন্নগতপ্রাণ। তাই এ-যুগে ভক্তিপথই ঈশ্বরলাভের সহজ ও সরল পথ। চঞ্চল ও অশুদ্ধ মন নিয়ে জ্ঞানবিচারের পথে বিচরণ করা কঠিন। এতটুকু সন্দেহ, এতটুকু মনের চাঞ্চল্য, এতকুটু ভিন্ন বাসনা ও আসক্তি থাকলে ঈশ্বর লাভ হয় না। তাই অচলা ভক্তি নিয়ে ঈশ্বরকে স্মরণ-মনন করলে তাঁকে পাওয়া যায়।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিজের কথায়ই বলি: "ভক্তিযোগ যুগধর্ম, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ভক্ত এক জায়গায় যাবে, আর জ্ঞানী বা কর্মী অন্য জায়গায় যাবে। এর মানে, যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তিপথেও সাধন করেন, তাহলে জ্ঞান লাভ করবেন। ভক্তবৎসল মনে করলেই ব্রহ্মজ্ঞান

দিতে পারেন।" এর পর শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ ধরনের অনেক কথারই অবতারণা করেছেন [—শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, (১৩৬৬ সাল), পৃঃ ১৭৭]। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকল-কিছুর সারকথা বলেছেন: "জগতের মা-কে পেলে জ্ঞানও পাবে, ভক্তিও পাবে। ভাবসমাধিতে রূপ দর্শন ও নির্বিকল্পসমাধিতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন হয়। তখন অহং, নাম ও রূপ থাকে না।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা তাই যে, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের মা, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের পিতা। যিনি শিব, তিনিই শক্তি। যিনি সাকার ও সগুণ, তিনিই নিরাকার ও নির্গুণ। আসলে এক ও অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্যই শিব-শক্তি, পিতা-মাতা সাকার-ও নিরাকার সগুণ ও নির্গুণ হয়ে প্রকাশিত হন। যিনি জ্ঞানী, তিনি 'নেতি নেতি' বিচার করেন, আর যিনি কর্মী, তিনি নিরাসক্ত হয়ে—work is workship-জ্ঞানে কর্মসাধনা ও মুক্তি লাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, ঝাঁপ দিয়ে তাড়াতাড়িই কর বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তেই ওঠ, ঈশ্বরলাভ করবেই, কারোর সাধনাই বিফলে যাবে না।

জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই তিন যোগ বা সাধনপথ ছাড়া আর একটি সাধনার পথ আছে, তার নাম রাজযোগ। 'রাজ' অর্থে শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি সাধনা ছাড়া রাজযোগের সাধনাও মুক্তিলাভের উপায়। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগসাধনায় আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ বিশেষভাবে জানা যায় বলেছেন। পতঞ্জলি মনকে নিরুদ্ধ, অর্থাৎ মনের বৃত্তিকে স্থির ও কেন্দ্রীভূত ক'রে আত্মায় নিবদ্ধ করতে বলেছেন। সংকল্প ও বিকল্প দুটি বৃত্তি নিয়ে মনের সাধারণ রূপ। এ দুটি বৃত্তি নষ্ট হলে মন শুদ্ধ চৈতন্যাকারে প্রকাশিত হয়। সেই চৈতন্যের স্বরূপোপলব্ধির নাম মুক্তি। এই মুক্তি সমাধিতে লাভ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব জ্ঞানযোগের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন: "(জ্ঞানযোগে) বিচারের শেষ যেখানে, সেখানে সমাধি হয়, আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।" সমাধি-অবস্থা ও তার স্বরূপের কথা যোগশাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। সম্প্রজ্ঞাত-অসম্প্রজ্ঞাত, সবীজ-নির্বীজ, সবিকল্প-নির্বিকল্প প্রভৃতি সমাধির বর্ণনা পতঞ্জলি যোগদর্শনে করেছেন। জ্ঞানযোগ 'নেতি নেতি' বিচারের পথ—একথাও শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "জ্ঞানী ব্রহ্মকে জানতে চায়; নেতি নেতি বিচার করে। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এই বিচার করে।" এখানে রাজযোগ ও জ্ঞানযোগের কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব একই সঙ্গে বলেছেন।

আবার কথামৃতের আলোচনায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব রাজযোগের কথা পৃথকভাবেও বলেছেন। মোটকথা সকল যোগের বা সাধনপথের লক্ষ্য একই, কেবল আচার-বিচার ও সাধনক্রিয়াতে কিছু কিছু ভেদ থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ।" পথ ও মত অনন্ত ও অসংখ্য। সাধকদের নিজ নিজ রুচি ও মনের নির্বাচনী দৃষ্টি অনুযায়ী সাধনপথ ও ধর্মমত ভিন্ন ভিন্ন হলেও লক্ষ্যরূপ ঈশ্বরলাভ বা আত্মানুভূতি এক। তাই সাধনপথের ও ধর্মমতের মধ্যে কিছু বিরোধ থাকলেও মোক্ষ-রূপ লক্ষ্যে কোন বিরোধ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "আন্তরিক হলে ঈশ্বরকে পাবে" বা "ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়"। এখানে 'ঈশ্বরকে পাওয়া' বা 'ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ' কথার মধ্যে কিছুটা রহস্য আছে। ঈশ্বর চৈতন্য বা বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপে সকল প্রাণীর অন্তরে সর্বদাই আছেন। এ জ্ঞানকে উপলব্ধি করার নাম ঈশ্বর লাভ। 'ব্রহ্মজ্ঞান লাভ' সম্বন্ধেও তাই। ব্রহ্মই শুদ্ধজ্ঞান। এই জ্ঞান বস্তুতন্ত্র বা স্বতঃপ্রকাশিত। অজ্ঞান-রূপ আবরণে ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত বলে আমরা তাকে যথার্থভাবে বুঝতে পারি না। তাই বিচার ক'রে সেই অজ্ঞান-আবরণ সরিয়ে দিলে ব্রহ্মজ্ঞান দেদীপ্যমান সূর্যের মতো প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশকে লাভ বা উপলব্ধি বলে।

একটি কথা এখানে স্মরণ করতে বলি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "মনে কর, অমৃতের একটি কুণ্ড আছে" প্রভৃতি। এখন জিজ্ঞাসা হতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিশ্চিতভাবে না বলে কেন বলেছেন 'মনে কর'! 'মনে কর' বলা যা, আর 'কল্পনা কর' বলাও তা। সাধনপথে নির্দিষ্ট কোন উপদেশ না নিয়ে কল্পিত উপায় বা কল্পনার আশ্রয় নেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। বিশেষভাবে ভেবে দেখলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা ও নির্দেশের মধ্যে আসলে কোন অসঙ্গতি দেখা যায় না। সকল পথের মতো অধ্যাত্মসাধনার পথে 'মনে কর' বা কল্পনার কথা বহু বিষয়ের প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে। আমরা স্বরূপে শিব বা ব্রহ্ম, কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধি ও যথার্থ বিচার না থাকার জন্য আমরা আমাদের ক্ষুদ্র, শক্তিহীন, অজ্ঞানী ও বদ্ধ বলে মনে করি। এই মনে করার সঙ্গে সঙ্গে তার সংস্কারও আমাদের অবচেতন মনের গভীর স্তরে পুঞ্জীভূত হতে থাকে, ফলে আমরা সত্যকারভাবে যে বৃহৎ, শক্তিমান, জ্ঞানদীপ্ত ও চিরমুক্ত এর সংস্কার আর আমাদের মনে স্থান পায় না। নেগেটিভ বা নেতিমূলক ভাবের

বিস্তারে পজেটিভ বা ইতিমূলক সৃষ্টিশীল ভাবের বিকাশ হয় না। তাতে ক'রে চিরদিন আমরা সংসার-বন্ধনেই আবদ্ধ হয়ে থাকি। তার জন্য শাস্ত্র ও বিশেষ ক'রে বেদান্ত আমাদের অভয়বাণী শুনিয়ে বলেছে—'অমৃতস্য পুত্রাঃ'। মনে কর তোমরা অমৃত ও চিরমুক্ত, ব্রহ্মজ্ঞানের দীপশিখা জাগপ্রদীপের মতো সর্বদাই তোমাদের অন্তরে প্রজ্জ্বলিত। কল্পনা কর—তোমাদের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, বিনাশ নাই, পরিবর্তন নাই। এই কল্পনা করার ফলে আমাদের মনের স্তরে পজেটিভ বা ইতিমূলক চিরসম্ভাবনার প্রেরণা ও শক্তি জাগ্রত হয়। কল্পনাই ক্রমে বাস্তব রূপ ধারণ ক'রে আমাদের মনে আশার আলোক দান করে।

আমরা জানি জীবমাত্রেই শিব ; জীবমাত্রেই মুক্তির আলোকস্নাত ব্রহ্ম-চৈতন্য, কিন্তু সে কথা ও সে তত্ত্ব আমরা ভুলে যাই অজ্ঞানের সংস্কারের জন্য। সেজন্য কাল্পনিক আরোপের প্রয়োজন হয়। সেজন্যই প্রতীক, প্রতিমা বা বাচকের প্রয়োজন হয় যথার্থবস্তুকে জানার জন্য। বেদে ও ব্রাহ্মণসাহিত্যে অহংগ্রহ, প্রতীকরূপ ওঙ্কার, প্রতিমা প্রভৃতি উপাসনার প্রচলন ছিল নিরাকার ও নির্গুণ চৈতন্যকে উপলব্ধি করার জন্য। কল্পনা-রূপ যূপ, স্তূপ, চৈত্য, চিত্র, শিলা, বৃক্ষ ও বিচিত্র রকমের প্রতীকের প্রচলন ছিল কল্পনা বা আরোপের মধ্য দিয়ে বাস্তবকে গ্রহণ করার জন্য। তার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব কোথাও কোথাও কাল্পনিক ইঙ্গিতের উল্লেখ করেছেন বাস্তব সত্যে উপনীত হবার জন্য। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "মনে কর, অমৃতের একটি কুণ্ড আছে"···প্রভৃতি। অমৃতের কুণ্ড ঈশ্বর বা আত্মা। তিনি চৈতন্যরূপে সকলের ও বিশ্বচরাচরের মধ্যে আছেন, কিন্তু অজ্ঞানী মানুষ তা অনুভব করতে পারে না। তাই 'মনে কর' এই কল্পনার আশ্রয় নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব জ্ঞানপিপাসু মানুষকে বাস্তব অমৃতরূপ আত্মাকে স্মরণ করতে ও ধ্যান করতে বলেছেন শান্তি ও চিরসান্ত্বনা লাভের জন্য। কল্পনাই ক্রমে চিরসম্ভবনাময় আশা ও আকাঙ্ক্ষার বস্তু মানুষকে দান করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন, জীব তো সচ্চিদানন্দস্বরূপ, কিন্তু মায়ার আবরণে সেই স্মৃতি আবৃত। তাই জাগরণ দরকার সত্যের পাদপীঠে উপনীত হবার জন্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

॥ ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান ॥

"মাষ্টার (শ্রীম) শুনিলেন যে, ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না জানার নামই অজ্ঞান।

*　　　*　　　*

শ্রীরামকৃষ্ণ। 'আচ্ছা, তোমার 'সাকারে' বিশ্বাস, না 'নিরাকারে' ?

*　　　*　　　*

মাষ্টার। 'আজ্ঞা, নিরাকার। আমার এইটি ভাল লাগে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ। 'তা বেশ! একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হোল। নিরাকারে বিশ্বাস, তাতো ভালই। তবে এ বুদ্ধি করো না যে, একটিই কেবল সত্য, আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে, নিরাকারও সত্য, আবার সাকারও সত্য। তোমার যে বিশ্বাস, সেইটিই ধরে থাকবে।'

মাষ্টার দুইই সত্য এই কথা বারবার শুনিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। এই কথা তো তাঁহার পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে নাই।

*　　　*　　　*

মাষ্টার। 'আজ্ঞা, তিনি সাকার—এ বিশ্বাস যেন হল, কিন্তু মাটির প্রতিমা তিনি তো নন ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ। মাটি কেন গো। চিন্ময়ী প্রতিমা।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, (১৩৬৬), পৃঃ ২৫।

জ্ঞান ও অজ্ঞানের বিশদ আলোচনা ভারতীয় দর্শনে শুধু নয়, সকল দেশের দর্শনেই করা হয়েছে। জ্ঞানের আলোচনা নানান ভাবে নানান

গ্রন্থে করা হয়েছে। ঘটি, বাটি, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতির জ্ঞান পার্থিব, কিন্তু এ সকলের জ্ঞান আসলে সর্বানুস্যূত ব্রহ্মচৈতন্য থেকে ভিন্ন নয়। জ্ঞান একটাই, কেবল বিষয় বা আধেয় ভিন্ন ভিন্ন হয় বলে একই জ্ঞানকে ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে হয়। ঘটি-বাটির জ্ঞানে আর ব্রহ্মের জ্ঞানে স্বরূপত কোন ভেদ নাই, ভেদ কেবল আধেয় বস্তুতে বা বিষয়ে। অপার্থিব ব্রহ্মবস্তু ভিন্ন সংসারের আর সকল-কিছুর জ্ঞান পার্থিব। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণদেব সে সকলকে বলেছেন—অজ্ঞান, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান নয়। ব্রহ্মে অজ্ঞান থাকে না বলে ব্রহ্মজ্ঞানে বন্ধন সৃষ্টি হয় না। কিন্তু ব্রহ্মভিন্ন সংসারের আর সকল জ্ঞানই বন্ধনের কারণ, কেননা পার্থিব জ্ঞান অজ্ঞানের নামান্তর। অজ্ঞান, অবিদ্যা মল মায়া সব এক কথা। মায়া বিচিত্র সংসার ও বন্ধন সৃষ্টি করে। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, আর ঈশ্বরকে না-জানার নাম অজ্ঞান।

ঈশ্বরকে জানা মানে কি? 'ঈশ্বর' বলতে শুদ্ধ ব্যাপকচৈতন্য—যিনি সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দের আকর ও আধার। আবার তিনি সত্তাস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। আসলে সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ বা সচ্চিদানন্দ (সৎ-চিৎ-আনন্দ) ব্রহ্মের গুণ বটে, পারমার্থিকী দৃষ্টিতে স্বরূপও বটে। মোটকথা যা সৎ বা সত্তা, যা 'আছে' (exist), তাই চিৎ (intelligence), বা প্রকাশ, আবার তাই আনন্দ (bliss)। যখনই বুঝি যে, আমরা আছি—সত্তাবান, তখনই আনন্দের সৃষ্টি হয়। তাই তিনটি গুণ পরস্পরে সম্পর্কিত এবং স্বরূপত এক ও অভিন্ন।

ঈশ্বরকে শাস্ত্রে মায়াধীশ অর্থাৎ মায়ার প্রভু ও প্রকাশসম্পন্ন জ্ঞানস্বরূপ বলে। তিনি অধীশ্বর বলে বিশ্ব সৃষ্টি করেন, পালন করেন, আবার নাশ করেন। তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেন হিরণ্যগর্ভরূপে। আবার মায়ার অধীশ্বর বলে তিনি স্বাধীন, অব্যক্ত ও প্রজ্ঞা। তিনি প্রকাশমান থাকেন 'ঈশ্বর'-রূপে, আবার মায়ার অতীত হয়ে থাকেন শুদ্ধচৈতন্য-রূপে। তিনি সর্বদাই 'অস্তি' বা 'সৎ'-রূপে বর্তমান থাকেন তুরীয়-চৈতন্য নাম নিয়ে। ঈশ্বরই তুরীয় (চতুর্থ—মায়োত্তীর্ণ চৈতন্য), ঈশ্বরই বিশ্বস্রষ্টা হিরণ্যগর্ভচৈতন্য, আবার ঈশ্বরই বিরাটচৈতন্যরূপে চরাচরে বা বিশ্ববৈচিত্র্যে প্রকাশমান থাকেন। ঈশ্বর তাই একমাত্র সৎ ও

নিত্য, তিনি ছাড়া আর সকল-কিছুই বিকারী বা পরিবর্তনশীল, সুতরাং অসৎ বা অনিত্য। তাই পরমচৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার নাম জ্ঞান। এই জ্ঞানে অজ্ঞানের বা সংসার-বন্ধনের নাশ হয়, মানুষ মুক্ত হয়, আনন্দস্বরূপ হয়, তখন ঈশ্বর-ভিন্ন পার্থিব জ্ঞানে আনন্দ পেলেও মায়ার ও সংসারবন্ধনে আর বাঁধা পড়ে না। পার্থিব বিষয়ের জ্ঞান অজ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অজ্ঞানের পারে যেতে বলেছেন ঈশ্বররূপ পরমজ্ঞানকে উপলব্ধি ক'রে। আর বলেছেন, সংসারের সকল-কিছুর পারমার্থিক সত্তা নাই এটি উপলব্ধি করার নাম জ্ঞান।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, সাকার যিনি, তিনিই নিরাকার; সগুণ বা গুণযুক্ত যিনি, তিনিই নির্গুণ বা সকল গুণবিহীন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত হোল—'ঈশাবাস্যং ইদং (বিশ্বং) সর্বম্',—সংসারের সকল-কিছুই ঈশ্বর বা পরমচৈতন্যের দ্বারা পরিব্যাপ্ত, সুতরাং বিশ্বের অণু-পরমাণুতে যদি ঈশ্বরচৈতন্য ছাড়া আর কোন-কিছুর সত্তা ও প্রকাশ না থাকে তবে আকার তিনি, নিরাকারও তিনিই; গুণ তিনি বা গুণ তাঁর, আবার গুণহীনতাও তিনি—নির্গুণ। সুতরাং গুণ ও গুণীর মধ্যে ভেদ কোথায়? আসলে তিনি কিছুই হন নি, আবার বিশ্বের সকল-কিছু তিনিই হয়েছেন; সুতরাং আপাতপ্রতীয়মান বিকারও তিনি, আবার বিকারশূন্যতাও তিনি। যেখানে এক ও অদ্বৈত, সেখানে দুই বা ভিন্নের জ্ঞান থাকে কিভাবে—এ পরমতত্ত্বই বুঝিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। এটি ভাল ক'রে অনুভব করা দরকার। আচার্য শঙ্কর বিশ্ববৈচিত্র্যকে অনিত্য ও মিথ্যা বলেছেন সংসারের পরিবর্তন, বিকার ও নাশ হয় বলে, আর যার বিকার বা পরিবর্তন হয় না, তাকে তিনি বলেছেন নিত্য ও সত্য। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ সম্বন্ধে সত্যকারভাবে কি বলেছেন তা বোঝা দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "নিরাকার সত্য, আবার সাকারও সত্য," অথবা—"এ বুদ্ধি করো না যে, এইটিই কেবল সত্য, আর সব মিথ্যা"। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভিমত হোল, শক্তিরই পরিণাম ও বিকার হয়, আবার শক্তি ব্রহ্ম ছাড়া অন্য-কিছু নন; যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। শিব ও শক্তি—ব্রহ্ম ও মায়া, অগ্নি ও তার দাহিক-শক্তির মতো আত্মা এক ও অভিন্ন—এ কথাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, সাপের স্থির থাকা ও সাপের চলা (গতি) দুটি ভিন্ন

ভিন্ন অবস্থা বলে মনে হলেও সাপ কিন্তু একটাই—দুটো নয়। তেমনি নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মই আবার মায়াযুক্ত সগুণ সাকার-রূপে প্রকাশিত হন। আসলে তিনি (শুদ্ধব্রহ্ম) সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ, জীব-জগৎ ও চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সবই হতে পারেন, আবার তা ছাড়া আরও কত-কিছু হতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে, এক ও অদ্বৈত ব্রহ্মসমুদ্রে সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ ও ব্রহ্ম-শক্তির অপরূপ অনন্ত বিলাস। নিত্য ও লীলার সেখানে অবিরাম খেলা চলেছে। সেখানে নিত্যও সত্য, লীলাও সত্য, কেননা শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—"যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা"। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র, আর ফেণায়িত তরঙ্গচঞ্চল সমুদ্র—একই সমুদ্র, কেবল অবস্থান্তর—নিস্তরঙ্গ ও তরঙ্গ। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে, তরঙ্গ জলেরই তরঙ্গ, তা' জল ছাড়া অন্য-কিছু নয়। বিক্ষুব্ধ জলই তরঙ্গ, আর অক্ষুব্ধ শান্ত জলই নিস্তরঙ্গ সমুদ্র। এক ও অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্যসমুদ্রের জল কখনও স্থির, কখনও চঞ্চল। এই অবস্থান্তর হওয়া ও না-হাওয়া ব্রহ্মচৈতন্যের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এ হওয়া ও না-হওয়া এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই একরূপ ও অন্যরূপ—যেমন টাকার এপিঠ ও ওপিঠ, কিন্তু এপিঠ ওপিঠ হলেও একই টাকা। সাধক কমলাকান্ত গেয়েছেন—

কখনো পুরুষ, কখনো প্রকৃতি
কখনো শূন্যরূপা রে।

একই ব্রহ্মময়ী মা কখনো পুরুষরূপে, কখনো প্রকৃতি বা স্ত্রীরূপে, আবার কখনো পুরুষ-প্রকৃতির পারে শূন্য তথা নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ ব্রহ্মসত্তারূপে নিজেকে প্রকাশ ক'রে লীলা করেন। লীলারূপিণী শক্তি। ব্রহ্ম লীলায় বহু ও বিচিত্র, আবার নিত্যে তিনি এক অদ্বিতীয়। সাধক কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ প্রভৃতির সিদ্ধান্তের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তত্ত্বদৃষ্টির মিল থাকলেও অমিলও যথেষ্ট আছে। আচার্য শঙ্করের সঙ্গে অমিল তো আছেই। তাহলেও এক ও অদ্বিতীয় সত্তাই দুই বা বহু রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন লীলার জন্য। সাধক কমলাকান্ত তাই ব্রহ্মময়ী মা-র লীলার মর্ম সহজে বুঝে পাগল হয়ে বলেছেন—

মায়ের এ'ভাব ভাবিয়ে কমলাকান্ত
সহজে পাগল হল রে।

ব্রহ্মতত্ত্বের স্বরূপ নির্ধারণ করতে গেলে পাগল হওয়ারই কথা। কিন্তু এ পাগল হওয়ার মধ্যে মাধুর্য আছে। জাগতিক হিসাব-নিকাশের পাশে দাঁড়িয়ে সরল ভক্তি, বিশ্বাস ও অনন্যসাধারণ অনুভব ও সাধনা নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবও পাগল হয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ তাই তাঁকে অনেক সময়ে পাগল বলেই অভিহিত করতো। রহস্যময় ব্রহ্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মময়ীর তত্ত্ব সঠিক ভাবে অনুধাবন ও উপলব্ধি করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গলীলাপার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাই বলতেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভিনব দর্শনতত্ত্ব ও উপদেশরহস্য সম্যক্‌ভাবে বুঝতে হলে আচার্য শঙ্কর-প্রভাবিত চশমাটি খুলে তার পরিবর্তে শ্রীরামকৃষ্ণভাবযুক্ত চশমা চোখে পরতে হবে, তবেই শ্রীরামকৃষ্ণদর্শন ঠিক ঠিক বোঝা যাবে। অন্যথা সংশয়-সন্দেহের মাঝে তত্ত্ব নির্ধারণ করা কঠিন হবে।

শ্রীম বা মাস্টার মহাশয় বলছেন: "আজ্ঞা. তিনি (ব্রহ্ম) সাকার—এ বিশ্বাস যেন হলো, কিন্তু মাটির প্রতিমা তিনি তো নন।" তার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "মাটি কেন গো, চিন্ময়ী প্রতিমা।" চিন্ময়ী অর্থে চৈতন্যময়ী। শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরতীর্থের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত পাষাণ-প্রতিমা শ্রীশ্রীভবতারিণীকে চৈতন্যময়ী বা চিন্ময়ীরূপে দর্শন করেছিলেন। শুধু দেবী শ্রীশ্রীভবতারিণীকে কেন, দক্ষিণেশ্বরমন্দিরের চৌকাঠ, পূজার কোশাকুশী প্রভৃতিকেও তিনি চৈতন্যময় দর্শন করেছিলেন। মাটির অণু-পরমাণুতে যে চৈতন্যের স্ফূরণ, সে চৈতন্যই পাষাণে ও স্বর্ণে শুধু নয়, বিশ্ব-চরাচরের সর্বত্রই ওতপ্রোত। ব্রহ্মচৈতন্য ছাড়া বিশ্বসংসারে আর কোন-কিছুরই সত্তা নেই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যানুভূতির দৃষ্টিতে মাটি, কাঠ, পাথর সমস্তই চৈতন্যে জারিত হয়েছিল। তাই তাঁর চোখে মৃত্তিকা ও পাষাণের মূর্তিও চৈতন্যময়ী বলে প্রতিভাত হয়েছিল। সুতরাং ঈশোপনিষদের সেই কথা—'ঈশাবাস্যং ইদং (বিশ্বং) সর্বম্'—সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ, ব্রহ্ম-শক্তি—সমস্তই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের প্রকাশ।[১]

১। নচেৎ বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে: "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতরং ইতরং পশ্যতি।" (বৃহ উঃ ৪।৫।১৫)। অর্থাৎ অজ্ঞানের ক্ষেত্রেই দ্বৈত।
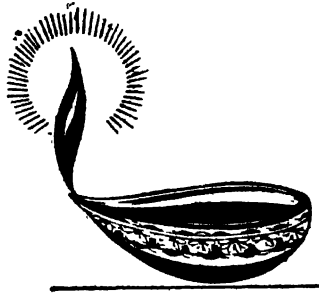
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ মহাকালী নানাভাবে লীলা করেন ॥

[কেশবের সহিত কথা—মহাকালী ও সৃষ্টিপ্রকরণ]

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী।

*　　　*　　　*

"শ্মশানকালীর সংহারমূর্তি। তিনি শব, শিবা, ডাকিনী, যোগিনীর মধ্যে শ্মশানের উপর থাকেন। সর্বাঙ্গে রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ। জগৎ যখন নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজসকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নীর কাছে যেমন একটি ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নী পাঁচ রকম জিনিস তুলে রাখে। (কেশবের ও সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। হ্যাঁ গো, গিন্নীদের ঐ রকম হাঁড়ি থাকে। ভিতরে সমুদ্রের ফেনা, নীলবড়ি, ছোট ছোট পুঁটলিবাঁধা শশাবীচি, কুমড়া-বীচি, লাউবীচি এই সব রাখে, দরকার হলে বার করে। মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টি-নাশের পর ঐ রকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন। সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে উর্ণনাভের কথা: মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা ভিতর থেকে জাল বার করে, আবার নিজে সেই জালের উপর থাকে। ঈশ্বর জগতের আধার আধেয় দুই।"

—শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, ১৩৬৬, পৃঃ ৫২-৫৩

শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'আদ্যাশক্তি প্রকৃতি ও তা থেকে বিশ্ববৈচিত্রের সৃষ্টি'-সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে। কালী সাংখ্যে প্রকৃতি, তন্ত্রে শক্তি ও বেদান্তে মায়া বা মায়াশক্তি। শক্তি-সম্বন্ধে বিভিন্ন দর্শনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী, কিন্তু সকলেই শক্তিকে বিশ্বসৃষ্টির কারণ বলেছে। তবে কারো মতে শক্তি নিত্য ও সত্য, আবার কারো মতে শক্তি অনিত্যা ও মিথ্যা। মিথ্যা কিনা চিরপরিবর্তনশীল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এখানে তন্ত্রের ও সাংখ্যের দৃষ্টিভঙ্গীর কথাই বিশেষভাবে বলেছেন। মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী ও শ্যামাকালী—এক আদ্যাশক্তি কালীর রূপভেদ ও নামভেদ। এ রূপভেদ ছাড়াও সিদ্ধকালী, দক্ষিণাকালী, বামাকালী প্রভৃতি কালীর নাম ও রূপভেদ আছে। ভিন্ন ভিন্ন কালীর রূপভেদেরও অর্থ শ্রীরামকৃষ্ণদেব দিয়েছেন তন্ত্রদৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে। যেমন,

(ক) মহাকালী। যখন সৃষ্টি হয়নি, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, পৃথিবীর কোন অস্তিত্বই ছিল না, নিবিড় আঁধার, না ছিল সৎ—না অসৎ, তখন আকার-বিহীনা নিরাকারা মহাকালী ছিলেন মহাকালের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে। এখানে ঋগ্বেদের নাসদীয়সূক্ত স্মরণ করতে বলি।

(খ) শ্যামাকালী। কোমলস্বভাবা, বরাভয়দায়িনী। গৃহবাসী গৃহস্থেরা শ্যামাকালীর পূজা করেন। শ্যামাকালীকেই দক্ষিণাকালী বলে। দক্ষিণা অনুকূলা ও কল্যাণী। দক্ষিণার বিপরীত বামা বা বামাকালী। সিদ্ধকালী দক্ষিণার পূর্বরূপ। দক্ষিণার দক্ষিণপদ সম্মুখে প্রসারিত ও বামাকালীর বামপদ সম্মুখে প্রসারিত। আর সব বেশভূষা, সাজসজ্জা উভয়েরই এক রকম। দক্ষিণার পূজা করেন গৃহস্থ ও বামার পূজা করেন বনবাসী ও ত্যাগ-মার্গী সন্ন্যাসীরা। দক্ষিণা সকল-কিছু রক্ষা করেন—ভোগ ও ত্যাগ, আর বামা সকল-কিছু নাশ করেন, অর্থাৎ সংসারভোগ নাশ ক'রে ত্যাগমার্গে সাধককে পরিচালিত করেন। এজন্য বামাকালীর পূজা ও সমাদর সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের সমাজে।

(গ) রক্ষাকালী। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয় তখন রক্ষাকালীর পূজা হয়।

(ঘ) শ্মশানকালী। শ্মশানকালীর সংহারমূর্তি। শিবের সংহারকার্যকে তিনি সার্থক করেন। কালী ভয়ঙ্করী, কেননা নাশের প্রতিমূর্তি রুদ্র-শিবের

তিনি সঙ্গিনী। আবার বেদের রুদ্র থেকে তিনি অভিন্না। এই কালী তমোগুণের প্রতীক, আবার তমোগুণনাশিনী। শব (মৃতদেহ), শিবা (শৃগাল), ডাকিনী-যোগিনী-পরিবৃতা দেবী নরকঙ্কালবেষ্টিত শ্মশানে বাস ও বিচরণ করেন। এখানেও প্রমথগণবেষ্টিত শিব, সদাশিব ও মহাকালের সঙ্গে কালীর ভিন্নতা নেই। রুধিরধারা শরীরকে সিক্ত করছে, ছিন্ন নরহস্ত ও নরমুণ্ডকে কটিদেশে ও গলায় আভরণ ক'রে তিনি পরেছেন। বর্ণনা ও রূপ রহস্যপূর্ণ ও তত্ত্বপূর্ণ। কালী কালপরিধির অতীতা, সুতরাং সনাতনী ও নিত্যা।

কালীর রূপভেদের অন্ত নেই। ফলহারিণী, রটন্তী প্রভৃতি কালীরূপেরও উল্লেখ আছে। তাছাড়া কালী, ভদ্রকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী প্রভৃতির অর্থসার্থকতার তুলনা নেই। যেমন,

(ক) শিবযুক্তা (শিব-মঙ্গলযুক্তা) হয়ে তিনি ভদ্রকালীরূপে প্রকাশ পান।

(খ) রোগ-শোক-তাপাদি থেকে রক্ষা করেন বলে রক্ষাকালী।

(গ) শ্মশানে ভয়শূন্য শরণাগত সাধককে সিদ্ধি দান করেন বলে শ্মশানকালী।

(ঘ) জন্য-জীব-জগতের ও ব্রহ্মাদির জননী বলে তিনি নিত্যকালী।

কালী নিত্যা—

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং যস্যা সৃষ্টি নিজেচ্ছয়া।
পুনঃপ্রলীয়তে যস্যাং নিত্যা সা পরিকীর্তিতা॥

কালী কৌলাদিপূজিতাও। সুতরাং কৌল কে?

(ক) কুলং কুণ্ডলিনী শক্তিরকুলন্তু মহেশ্বরঃ।
কুলাকুলস্য তত্ত্বজ্ঞঃ কৌল ইত্যভিধীয়তে॥

(খ) ন কুলং কুলমিত্যাহুঃ কুলং ব্রহ্মসনাতনম্।
তৎকুলে নিরতো যো হি কৌল ইত্যভিধীয়তে॥

কালীকুল ও শ্রীকুল উভয় কুলে তন্ত্রসাধনসিদ্ধ সাধককেই কৌল বলা হয়। কৌল জীবন্মুক্ত সিদ্ধসাধক।

সৃষ্টি যখন ছিল না তখনও মহাশক্তি কালী ছিলেন। কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে নর বা মানুষ ছিল না, অথচ নরহস্ত ও নরমুণ্ডকে কালী আভরণ করেন কি করে? সাধক কমলাকান্ত এ সমস্যার প্রশ্নই করেছিলেন,

ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন
মুণ্ডমালা কোথায় পেলি।

মহাকালীর চিন্তা বা ধ্যান সাধনার জন্য। মহাকালীর রূপ এবং অর্থও তত্ত্বপূর্ণ। মুণ্ডমালার নরমুণ্ড মাতৃকাবর্ণ অ, আ…ক, খ, গ, ঘ প্রভৃতি স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ এই পঞ্চাশটি। অ ক চ ট ত প য ল ব হ প্রভৃতি মাতৃকাবর্ণই স্ফোট তথা শব্দব্রহ্ম। ঋষি পতঞ্জলি মহাভাষ্যে নিত্যবর্ণ স্ফোটের পরিচয় দিয়েছেন। স্ফোট অবিনশ্বর ও আদি-অন্তহীন। মাতৃকাতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব ও স্ফোটতত্ত্ব একই। প্রণব বা ওঙ্কার ঐ শব্দতত্ত্বেরই প্রকাশক। স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ ওঙ্কারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁদের রচনাবলীর বহু স্থানে। অ-উ-ম এই তিনটি মাতৃকাবর্ণ 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'—ঈশ্বরের মতো সমগ্র বিশ্ব বা বিশ্বের অণু-পরমাণুকে পরিব্যাপ্ত ক'রে রয়েছে। অ-বর্ণে সকল শব্দের ও বস্তুর আরম্ভ, উ-বর্ণে তাদের স্থিতি ও ব্যপ্তি ও ম-বর্ণে সমাপ্তি ও সম্পূর্ণ। বিশ্বের সকল-কিছু শব্দের ও পদার্থের ব্যাপক রূপই ওঙ্কার। কালীর গলদেশে মুণ্ডমালা স্ফোটতত্ত্বের প্রকাশক এবং তা' মাতৃকাবর্ণ। শ্রীরামপ্রসাদ বলেছেন,

কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী
তুমি বর্ণে বর্ণে নাম ধর।

স্বরবর্ণ শক্তির রূপ বলে পরিচিত থাকলেও সকল বর্ণই (স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ) মাতৃকা বা মহাশক্তি কালীর রূপ। কালী—'কলয়তি ইতি', 'লয়ং করোতি ইতি', বা 'লয়স্য বিলয়ং করোতি ইতি' কালী। 'কলয়তি'—'শুভাশুভবুদ্ধিঃ বুদ্ধি-লয়ং করোতি' বা 'ইন্দ্রজালবৎ মায়াক্ষেপণং বা সৃষ্টিং করোতি' বা 'ভক্ষয়তি বা গ্রাসয়তি সর্বম্' ইতি কালী। স্বরবর্ণ সঙ্গীতে রসকলাত্মক। বর্ণ তাই সঙ্গীতে রস সৃষ্টি করে। রুধির অমৃত। অফুরন্ত অমৃতময়ী ও সদানন্দময়ী মা কালী। কালী লয়ের বিলয়সাধন ও পুনঃ সৃষ্টি করেন। লয়ের মধ্যেই সৃষ্টি-কল্যাণ নিহিত। মাতৃতত্ত্ব অনুধাবন ও উপলব্ধি করলে মানুষ শাশ্বত জীবন লাভ করে। শাশ্বত জীবনই মুক্তি ও জীবনসিদ্ধি। মরণজয়ী নিত্য ও সত্য আত্মার জ্ঞানই (আত্মজ্ঞানই) অমৃত। কালী মহাকালের বুকে মরণকে জয় ক'রে নৃত্য কিনা লীলা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন: "আদ্যাশক্তি লীলাময়ী"। লীলা—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপ কর্ম। নিত্য অভয়, অমৃত ও অদ্বিতীয়। লীলাও অমৃত, তবে দ্বিতীয় কিনা স্বরূপে ভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব

বলেছেন, নিত্য ও লীলা অবিচ্ছেদ্য। ব্রহ্ম নিত্য ও শক্তি লীলা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন—এক ও অদ্বিতীয়; ব্রহ্ম ও মায়া এক ও অদ্বিতীয়। আচার্য শঙ্করের দৃষ্টিতে মায়া মিথ্যা কিনা চিরপরিবর্তনশীল অনিত্য, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে মায়া বা মায়াশক্তিও ব্রহ্ম। তিনি বলেছেন: "তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে (Absolute) ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না।" (শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, ১৩৬৬, পৃঃ ৫২)। শুধু তাই নয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কোন কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই, আর যখন তিনি এই সব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি—শক্তি বলি। একই ব্যক্তি, নাম-রূপ-ভেদ" (কথামৃত, ১ম, পৃঃ ৫২)। এ আলোচনা পূর্বেও হয়েছে।

তারপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব সৃষ্টিপ্রকরণের কথা বলেছেন: "যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজসকল কুড়িয়ে রাখেন—" ইত্যাদি। সাংখ্যদর্শনে কপিল এ রকম সৃষ্টিতত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মহর্ষি কপিল বলেছেন, অসৎ থেকে কোনদিনই সতের সৃষ্টি সম্ভব নয়, আর সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনগুণের সাম্যাবস্থারূপিণী প্রকৃতি থেকেই বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি। মনে রাখতে হবে সাংখ্যকার কপিলের মতে, প্রকৃতি নিষ্ক্রিয় ও জড়া ও স্বতন্ত্রা, চৈতন্যময় পুরুষের সান্নিধ্যে এসে বা পুরুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেন। এখানে তন্ত্রধারণার সঙ্গে সাংখ্যধারণার অনেক মিল, আবার পার্থক্য আছে। পার্থক্য এই যে, তন্ত্রে শক্তি শিবসম্পৃক্ত হয়ে নৃত্য, কিনা লীলা তথা বিশ্বচরাচর সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কার্য করেন, তন্ত্রে শক্তি চেতনাময়ী ও জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়ারূপিণী। শিবও চৈতন্যময়। কিন্তু সাংখ্যে শক্তি বা প্রকৃতি জড়া ও নিষ্ক্রিয়া, তিনি চৈতন্যময়ী ও সক্রিয়া হন চৈতন্যময় পুরুষের সঙ্গে মিলিত হলে।

সৃষ্টি-সম্পর্কে সাংখ্যকার কপিল বলেছেন, সৃষ্টির অর্থ অভিব্যক্তি, বা যা ছিল, তারই বিকাশ। প্রকৃতির গর্ভে সৃষ্টির বীজ অব্যক্ত আকারে থাকে এবং চেতনাদীপ্ত পুরুষের সান্নিধ্যে এসে প্রকৃতির গর্ভে নিহিত কারণ বা বীজ কার্যাকারে ব্যক্ত অর্থাৎ প্রকাশিত হয়। তাই কপিলের মতে, সৃষ্টির অর্থই

অব্যক্তের ব্যক্ত অবস্থা, অপ্রকাশিতের প্রকাশ অবস্থা, বীজ বা কারণের কার্যাবস্থা, সুতরাং সৃষ্টি নিত্য ও অনন্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সৃষ্টি-সম্পর্কে সাংখ্যতত্ত্বেরই পরিচয় দিয়েছেন তন্ত্রতত্ত্বকে সম্পর্কিত ক'রে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছিল সমন্বয়ী দৃষ্টি। তাই সকল দর্শনের মত ভিন্ন ভিন্ন হলেও তাঁর মহাসমন্বয়ী দৃষ্টি সকল ভিন্নতার মধ্যেও একটি ঐক্যসূত্রের সন্ধান দিয়েছে। যেমন, সৃষ্টিতত্ত্বের পরিচয় দিয়ে তিনি বলেছেন: "গিন্নীর কাছে যেমন একটি ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নী পাঁচ রকম জিনিস তুলে রাখে।" আবার বলেছেন: "মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টি নাশের পর ঐ রকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন। সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন" ইত্যাদি। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এ কথা শ্রুতি তথা উপনিষদের "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশাৎ",—'ব্রহ্ম (সগুণ-ব্রহ্ম) বিশ্বচরাচর সৃষ্টি ক'রে অর্থাৎ বিশ্বের অভিব্যক্তির বিকাশসাধন ক'রে তার মধ্যেই প্রবেশ করেন।' তাই তিনি বিশ্বোত্তীর্ণ হলেও সৃষ্টির পর বিশ্বগত হন। একথা "ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্" ঈশোপনিষদের সর্বানুস্যূতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। স্মরণ করিয়ে দেয় যে, দ্বিতীয় বা বৈচিত্র্যের বিকাশ হলেও তা অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি। শঙ্কর যেমন ব্রহ্মকে সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত দু'রকম কারণ বোঝানোর জন্য ঊর্ণনাভ বা মাকড়সা ও মাকড়সার জালের উদাহরণ দিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তেমনি বলেছেন: "মাকড়সা ও তার জাল। মাকড়সা ভিতর থেকে জাল বার ক'রে আবার নিজে সেই জালের উপর থাকে।" মাকড়সা নিজের নাল দিয়ে জাল সৃষ্টি ক'রে নিজেই সেই জালে আশ্রয় লাভ, করে। গুটিপোকাও তেমনি নিজের নালে আবরণ তৈরী ক'রে নিজেই তাতে আবদ্ধ হয় ও পরে সেই আবরণ কেটে প্রজাপতির আকারে বাইরে আসে। মাকড়সার সঙ্গে গুটিপোকার অনেকটা সাদৃশ্য আছে কর্মে ও গুণে, কিন্তু মাকড়সা আবদ্ধ হয় না কোনদিনই, আর গুটিপোকা নিজেকে আবদ্ধ করে, আবার নিজেকে মুক্তও করে। মাকড়সার উদাহরণ দিয়ে শঙ্কর বলেছেন, মাকড়সা যেমন নিজেই নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ, তেমনি ব্রহ্মও বিশ্বসৃষ্টির নিমিত্ত ও উপাদান কারণ—'যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ' (উপনিষৎ) আবার শ্রীরামকৃষ্ণদেব এটিকে একটু ভিন্নভাবে বলেছেন: 'ঈশ্বর জগতের আধার ও আধেয় দুই'। উভয়ের উদাহরণ ও তত্ত্ব একই, পার্থক্য কেবল কারণ

ও আধার শব্দদুটিতে। বেদান্তও ব্রহ্মকে (সগুণ-ব্রহ্মকে) কারণ ও আধার দুই বলেছে, আবার যুক্তি দিয়ে ব্রহ্মের কারণত্ব ও আধারত্ব খণ্ডনও করেছেন।

মোটকথা বিশ্বের সকল বস্তু ও প্রাণীর সংস্কার মহাপ্রলয়ে বীজাকারে নিহিত থাকে প্রকৃতির গর্ভে, কল্পারম্ভে বা নূতন সৃষ্টির সময়ে সেই সুপ্ত বীজরূপ সংস্কারগুলিই আবার স্থূল কার্যাকারে অভিব্যক্ত হয়। ঋগ্বেদে এই ধারণা আরও সুস্পষ্টভাবে আছে—

> ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
> ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ॥
> সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
> অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতো বশী॥
> সূর্য্যাচন্দ্রমসো-ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।
> দিবাঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥

'তপঃ' ও 'তপসঃ' শব্দ বেদে ও উপনিষদে আছে (১।১।৯)। একে 'জ্ঞানময় তপঃ' বা সৃষ্টির ইচ্ছা বলা হয়েছে—"যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ"।[১] সগুণ-ব্রহ্মের কল্যাণী ইচ্ছা থেকেই বিশ্বসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। উপনিষদেও আছে—'তিনি ইচ্ছা করলেন 'আমি এক বা একক আছি, বহু হব', তাঁর ইচ্ছা (তপঃ)[২] মাত্রে সৃষ্টি হয়েছিল। তা ছাড়া 'ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ' শব্দের ব্যাখ্যায় সায়ণ ঋগ্ভাষ্যে বলেছেন: "ধাতা বিধাতা যথাপূর্বং পূর্বস্মিন্ কালেঽকল্পয়ৎ সৃষ্টিবান, তথৈবাগামিন্যপি কল্পে কল্পয়িষ্যতীত্যর্থঃ।" 'পদানুসরণী'-টীকায় বলা হয়েছে: "যথাপূর্বং পূর্বকল্পানুসারেণ অকল্পয়ৎ।" সংবৎসররূপী প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মা বিশ্বসৃষ্টির কর্তা (বিধাতা), সুতরাং ঋগ্বেদ ও উপনিষৎ থেকেও বোঝা যায়, পূর্বাপর সৃষ্টিক্রম থাকে এবং মহাপ্রলয়ে একটি সৃষ্টির নাশ হলে পূর্বজীবসংস্কারকে অবলম্বন ক'রে পরবর্তী নূতন সৃষ্টি সম্ভব হয়। আসলে সৃষ্টি—ব্যক্ত ও প্রলয়—অব্যক্ত। একটি জাগ্রত ও অপরটি স্বপ্ন বা সুষুপ্তি। এই স্বপ্ন বা সুষুপ্তির প্রসঙ্গে উপনিষৎ বা শ্রুতি বলেছে—"তর্হি আব্যাকৃতমাসীৎ"। এই অব্যাকৃত বা অব্যক্তই প্রকৃতি বা মহাপ্রকৃতি

১। এ প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ-প্রণীত *Cosmic Evolution and Its Purpose*-গ্রন্থ এবং সৃষ্টিসম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী দ্রষ্টব্য।

২। ইচ্ছা = তপঃ (heat-energy)।

(Primordial Energy)। উপনিষৎ ও সাংখ্যের প্রকৃতিই তন্ত্রে মহাশক্তি কালী। কালী—সৃষ্টিরূপিণী। তিনি সচঞ্চল নৃত্য করেন বলেই কালী। শঙ্করাচার্য ও পদ্মপাদ প্রভৃতি বিবরণাচার্যেরা সৃষ্টিবীজরূপ মায়ার অধিষ্ঠান ব্রহ্ম বলেছেন,—অজ্ঞানের অধিষ্ঠান যেমন জ্ঞান। তন্ত্রে কালী বা শক্তির অধিষ্ঠান (background বা substratum) যে শিব (মহাকাল ও সদাশিব) তা শিবের বুকে শ্যামার নৃত্যই প্রমাণ করে। তবে মহাকাল ও সদাশিব ব্রহ্মের অভিন্ন রূপ হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য : মহাকাল সগুণ ও সদাশিব নির্গুণ-ব্রহ্মের প্রতীক। তন্ত্রে লীলাময়ী কালী মহাশক্তি। তিনিই সাংখ্যের প্রকৃতি ও উপনিষদের অব্যাকৃত বা অব্যক্ত এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদাহরণে গিন্নী বা গিন্নির ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়ি। শক্তিই লীলা এবং প্রকৃতির অথবা প্রকৃতিতেই সৃষ্টি। আবার নিত্যেরই লীলা, অর্থাৎ নিত্যই লীলারূপে বিশ্বে সৃষ্টিবিলাস করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদাহরণে সেখানে পুঁটুলিতে বাঁধা বা ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়িতে রাখা শশাবীচি, কুমড়াবীচি, লাউবীচি প্রভৃতি সকল প্রাণীরই সংস্কাররাশি, তারা সঞ্চিত (জমা) থাকে প্রকৃতিতে বা লীলাময়ী মহাশক্তির গর্ভে এবং অভিব্যক্তির সময়ে লীলা-কালে তাদের অভিব্যক্তি হয়। এ অভিব্যক্তির নামই সৃষ্টি বা বিকাশ—'যথাপূর্বং অকল্পয়ৎ'।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু অক্ষর-ব্রহ্মের অনুভূতি লাভ ক'রে সর্বশাস্ত্রতত্ত্ববিদ্ হয়েছিলেন। তিনি সাংখ্য, বেদান্ত, উপনিষৎ, তন্ত্র কোন শাস্ত্রই পড়েন নি, অথচ তাঁর সাধনলব্ধ প্রজ্ঞাচক্ষুতে সকল শাস্ত্র ও শাস্ত্রতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয়েছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

॥ নানারকম জীব ॥

"শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নানারকম জীব, জন্তু, গাছপালা আছে। জানোয়ারের মধ্যে ভাল আছে, মন্দ আছে। বাঘের মত হিংস্র জন্তু আছে। ** তেমনি মানুষের মধ্যে ভাল আছে, মন্দও আছে; সাধু আছে, অসাধু আছে; সংসারী জীব আছে, আবার ভক্ত আছে।

জীব চার প্রকার: বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব।

নিত্যজীব: যেমন—নারদাদি; এরা সংসারে থাকে জীবের মঙ্গলের জন্য; জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য।

বদ্ধজীব: বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে, আর ভগবানকে ভুলে থাকে, ভুলেও ভগবানকে চিন্তা করে না।

মুমুক্ষুজীব: যারা মুক্ত হবার ইচ্ছা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হতে পারে, কেউ বা পারে না।

মুক্তজীব: যারা সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে আবদ্ধ নয়, যেমন সাধু মহাত্মারা; যাদের মনে বিষয়বুদ্ধি নেই, আর যারা সর্বদা হরিপাদপদ্ম চিন্তা করে। ***

[সংসারী লোক—বদ্ধজীব]

বদ্ধজীবেরা সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ হয়েছে। হাত-পা বাঁধা। ***

বদ্ধজীবেরা ঈশ্বরচিন্তা করে না। যদি অবসর হয় তাহলে হয় আবোল-তাবোল গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, ১৩৬৬, পৃঃ ৩৪-৩৫

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নানারকম জীব, জন্তু, গাছপালা আছে। বিরাট বিশ্বসৃষ্টির ভিতর প্রাণহীন ও প্রাণবান কোন বস্তুকেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বাদ দেন নি। অবশ্য জীবজন্তুর প্রকৃতি বা স্বভাবের কথা নিয়েই তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি ভাল-মন্দ—সৎ-অসৎ, আর এ দুটি আলো-ছায়ার ভিতর দিয়েই মনুষ্যসমাজকে সকল দেশের নীতিধর্মবাদী লোকেরা বিচার করেছেন ও করেন। বাস্তব, নৈতিক ও অধ্যাত্ম—material, ethical, spiritual-এর বিকাশের স্তর দিয়ে মনুষ্যসমাজকে বা মনুষ্যকে দার্শনিকরাও বিশেষভাবে বিচার করেন। সকল দেশের ধর্ম ও অধ্যাত্মশাস্ত্রের তো কথাই নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমগ্র মনুষ্যস্তরকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন—যে ভাগগুলি দিয়ে মানুষ ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগতভাবে সমাজে ও জীবনে চিন্তা করে, কর্ম করে ও জীবন গঠন করে। এ চারটি স্বাভাবিক ও নৈতিক জীবন-স্তরই সমগ্র মনুষ্যসমাজের পরিচয়কে পরিস্ফুট করে—যেমন সাধারণ, তেমনি বিশেষজ্ঞ সমাজে। ধর্ম ও অধ্যাত্মচিন্তার ক্ষেত্রে এ চারটি বিভাগের মূল্য ও চিন্তাবোধই বিশেষভাবে সকলের মনোরাজ্য ও হৃদয়ক্ষেত্রকে অধিকার ক'রে আছে বলা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব গোড়ার দিকে নিত্যজীবের পরিচয় দিলেও বদ্ধজীবের নামই প্রথমে উল্লেখ করেছেন। তা করাও স্বাভাবিক, কেননা মায়া-মমতার সংসারে মানুষ মোহের বন্ধনকে সহজে এড়িয়ে উঠতে পারে না। এ বদ্ধ বা বন্ধনদশার চিন্তাক্ষেত্রেই মুক্তি-অবস্থার স্বচ্ছন্দতা ও আনন্দের ধারণা মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে আসে। মায়ার সংসারে বাস ক'রে মায়া-মমতার বন্ধন কাটাবার কথাই সকল দেশের অধ্যাত্মশাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: 'মানুষের মধ্যে ভাল আছে, মন্দ আছে; সাধু আছে, অসাধু আছে'। কিন্তু বদ্ধজীব বা মায়া-মমতার জালে আবদ্ধ সংসারী মানুষের মধ্যেও সৎ লোক ও অসৎ লোক—ধার্মিক ন্যায়বান লোক ও অধার্মিক মলিন চিত্তের লোকের অভাব নাই। তবে সংসারী লোক হলেই কি কেউ সকলের প্রতি অন্যায় ও অধর্ম আচরণ করে? তা কেন, সংসার-পরিবেশে বাস করেও কত লোক পুণ্যকর্ম করে, কত লোক ধর্ম আচরণ করে ও দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বক্তব্য বা

অভিপ্রায় একটু ভিন্ন। তিনি বলেছেন বদ্ধজীবের কথা ; তা কেউ সংসারী, আবার অসংসারী হতে পারে, কেউ ধর্মাচারী হতে পারে, কেউ অধর্মাচারীও হতে পারে। কিন্তু মায়ায় আবদ্ধ হয়ে চলমান সংসারকে, মৃত্যুশীল জীবনকে, ক্ষণিকের ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা ও আত্মীয়স্বজনকে যারা নিত্য জ্ঞান করে, রক্তমাংসের ক্ষয়শীল শরীরকে যারা অবিনশ্বর আত্মা বলে ভ্রম করে, তারাই বদ্ধজীব। মায়া-শৃঙ্খলের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা অনেক বেশী। টাকা-কড়ি, ধনসম্পত্তি ক্ষণিকের সম্পদ, অথচ মায়ার বন্ধনে পড়ে তাদেরই মানুষ চিরস্থায়ী বোলে জ্ঞান করে, আর এটাই তাদের জীবনে কম ভুল নয়! একেই দর্শনের ভাষায় ভ্রম, ভ্রান্তি, মোহ, অজ্ঞান, অবিদ্যা, অধ্যাস প্রভৃতি বলে। আচার্য শঙ্কর বেদান্তসূত্রের 'অধ্যাস'-ভাষ্যে বলেছেন, যেটা যা নয় তাকে তাই বলে ভাবার নাম অধ্যাস, ভ্রম বা ভুল-ধারণা। এটাই মিথ্যাজ্ঞান—যা সত্যজ্ঞানের বিপরীত। বদ্ধজীব মোহে ও মায়ায় বিবেকজ্ঞান হারিয়ে অনিত্য যা, অসৎ যা—তাকে নিত্য ও সত্য ভাবে, আর এই ভুল ভেবেই সে ভ্রমের নেশায় অমূল্য জীবনকে অসারতায় পরিণত করে। এটাই বদ্ধজীবের স্বভাব বা প্রকৃতি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলেছেন : '(বদ্ধজীব) বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে, আর ভগবানকে ভুলে থাকে, ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না।' আবার বলেছেন : 'বদ্ধজীবেরা সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ হয়েছে—হাত-পা বাঁধা। * * বদ্ধজীবেরা ঈশ্বর চিন্তা করে না।'

সাধারণত সংসারে আসক্ত বিবেকহীন মানুষের কথাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন। মায়ায় একেবারে আসক্ত নয়, অবসর মতো ও স্বভাব অনুসারে ধর্মকাজ করে, ধ্যান-ভজন করে, পূজা-অর্চনা করে—এমন লোকও সংসারে আছে। কিন্তু কথা হোল, অনিত্য ও অনর্থ বস্তুকে যদি নিত্য ও পরমার্থ জ্ঞান ক'রে মানুষ সংসারের মায়ায় আবদ্ধ থাকে, আবার অবসর মতো স্বভাব-অনুসারে জপ-ধ্যান, গঙ্গাস্নান, দেবার্চনা ও মাঝে মাঝে পরোপকারও করে—তাহলেই বা হলো কি? সংসার চলমান ও অনিত্য, ঈশ্বর বা ভগবানই সার ও নিত্য—এ' ধরনের বিচার ও বিবেক-বৈরাগ্য নিয়ে অনাসক্তভাবে সংসারের সকল কাজ করে, অথচ মন-প্রাণ ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করে—এ ধরনের লোকই বা ক'জন পাওয়া যায়। শ্রীরাম-

কৃষ্ণদেব বদ্ধজীব বলতে মায়ায় আসক্ত মানুষের কথাই বলেছেন। শাস্ত্রজ্ঞান আছে, ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, পরোপকার ও ধর্মাচরণ করে, অথচ সংসারে আত্মীয়স্বজনের ও ধন-সম্পত্তির মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারছে না। এ অবস্থা কিন্তু মুক্ত ও ধার্মিক মানুষের লক্ষণ নয়। বন্ধনকেও চাইবে আর ভগবানকেও ডাকবে, চিরদিনের জন্য বন্ধনের অবসান ক'রে ভগবানের পাদপদ্মে নিজেকে মিশিয়ে দেবে না—এ অবস্থা মুক্তজীব বা ধার্মিক জীবের লক্ষণ নয়। এটি বদ্ধজীবেরই লক্ষণ।

তাই বদ্ধজীবের মুক্তির পথকে আরো সচ্ছল ও সুগম করার পথের সন্ধান দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব মুমুক্ষুজীবের উদাহরণ দিয়ে। মুমুক্ষুজীব কি রকম? শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: 'যারা মুক্ত হবার ইচ্ছা করে তারা মুমুক্ষু। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হতে পারে, কেউ বা পারে না।' মুক্তিলাভের ইচ্ছাকেই মুমুক্ষুত্ব বলে। বন্ধনদশায় যে জ্বালা ও বেদনা তা তীব্রভাবে অনুভব না করলে অন্তরে মুক্তির ইচ্ছা জাগে না। তাই সংসারে ঈশ্বরকে ভুলে মানুষ সুখেই দিন যাপন করে। তবে মাঝে মাঝে একটু গীতা, চণ্ডী বা উপনিষদাদি মোক্ষশাস্ত্র পড়ে, কিন্তু এভাবে কি আর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে চিরস্থায়ী হয়? হৃদয়ে যথার্থ ব্যাকুলতার ভাব না থাকলে শ্মশানবৈরাগ্যে মুক্তির ইচ্ছা মনে জাগে না। সংসারের বিষয়ে বিতৃষ্ণা ও সাংসারিক বস্তুতে অনিত্য জ্ঞান না এলে কেবল কথায় মুক্তির ইচ্ছা জাগে না। ঈশ্বরলাভই জীবনের একমাত্র সার, মুক্তির আনন্দের কাছে বিষয়ভোগের আনন্দ তুচ্ছ ও অনিত্য—এ ধরনের জ্ঞান হৃদয়ে না জাগ্‌লে সংসারভোগ যে দুঃখময় ও মুক্তি যে সুখের ও পরম-আনন্দময় এ বুদ্ধি আসবে কেমন ক'রে। তাই যথার্থ অনাসক্তির ভাব না এলে মুক্তির জন্য সাধনা করেও মুক্তির আস্বাদন মুমুক্ষুজীব পায় না। আবার অনেকে মুক্তিপথের সন্ধানও পায়।

এরপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব মুক্তজীবের উদাহরণ দিয়েছেন। ভাগ্যবান না হলে মুক্তজীব হওয়া যায় না। মুক্তজীব কারা? শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, যারা সংসারে কামিনীকাঞ্চনে আবদ্ধ নয় * *, যাদের মনে বিষয়-বুদ্ধি নাই, আর যারা সর্বদা হরিপাদপদ্ম চিন্তা করে তারাই মুক্তজীব। ঈশ্বরলাভ না হওয়া পর্যন্ত মুক্ত হওয়া যায় না। জ্ঞানীরা বিচার করেন। সদসৎ বিচার ক'রে সৎ যে ঈশ্বর ও অসৎ যে অনিত্য ও মায়ার বন্ধন একথা জ্ঞানীরা বোঝেন।

অজ্ঞানের নাশেই জ্ঞানের প্রকাশ, আর এর নাম মুক্তি। ভক্তেরা ভজন-সাধন ক'রে ভক্তির দ্বারা ভগবানকে লাভ করেন। যোগীরা যোগ সাধন ক'রে সমাধিতে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন করেন। যথার্থ কর্মীরা নিরাসক্ত-ভাবে সংসারে সকল কাজ করেন এবং কর্মই ঈশ্বরের পূজা ও আরাধনা—এ বুদ্ধিতে কাজ ক'রে চিত্তশুদ্ধির পর আত্মজ্ঞান লাভ করেন। ঐকান্তিকতা ও ব্যাকুলতা থাকলে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম সকল সাধনপথ দিয়েই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। ঈশ্বরলাভ ও অজ্ঞানের নিবৃত্তি-এর নামই মুক্তি।

এরপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিত্যজীবের উদাহরণ দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "নিত্যজীব, যেমন নারদাদি। এরা সংসারে থাকে জীবের মঙ্গলের জন্য, জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য।" জীবন্মুক্ত কারা? যাঁরা শরীর থাকতে থাকতেই অজ্ঞানের পারে গিয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করেন তাঁরাই জীবন্মুক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গপার্ষদ স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রভৃতি, আচার্য শঙ্কর ও শঙ্করানুসারী এবং আরও অনেকে 'জীবন্মুক্তি' স্বীকার করেছেন। অনেকে আবার বিদেহমুক্তি ও ক্রমমুক্তি স্বীকার করেন। মোটকথা নারদাদি মহামানবরা জীবন্মুক্ত বা মুক্তপুরুষ ছিলেন। অবতারগণ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অবতার। তাঁরাও জীবকল্যাণের জন্য পৃথিবীতে আসেন বিশ্বমানবকে শিক্ষা দেবার জন্য।

পরিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিত্য, মুমুক্ষু ও বদ্ধ জীবদের উদাহরণ দিয়েছেন সহজ সরল সাধারণভাবে। তিনি বলেছেন: "যেমন জাল ফেলা হয়েছে পুকুরে। দু'চারটা মাছ এমন সেয়ানা যে, কখনও জালে পড়ে না। এরা নিত্য জীবের উপমাস্থল। কিন্তু অনেক মাছই জালে পড়ে। এদের মধ্যে কতকগুলি পালাবার চেষ্টা করে; এরা মুমুক্ষুজীবের উপমাস্থল। কিন্তু সব মাছই পালাতে পারে না; দু'চারটা ধপাঙ ধপাঙ ক'রে জাল থেকে পালিয়ে যায়, তখন জেলেরা বলে—ঐ একটা মস্ত মাছ পালিয়ে গেল, এরা মুক্তজীব। কিন্তু যারা জালে পড়েছে, অধিকাংশই পালাতে পারে না। * * এরাই বদ্ধজীবের উপমাস্থল।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সারগর্ভ সকল উপদেশই সহজ ও সাবলীল। তাই এগুলিকে বিশেষ বিচার ক'রে উপলব্ধি করার প্রয়োজন। উপদেশগুলি

সহজ হলেও তাদের মর্মকথা গভীর তত্ত্বপূর্ণ ও জীবনে প্রতিপালনের যোগ্য। বদ্ধজীবই মুক্তির আশীর্বাদ লাভ করে বিবেক-বৈরাগ্যের অধিকারী হলে; মুক্ত হলে, পাকাল মাছের মতো নিরাসক্তভাবে সংসারে থাকা যায়। তবে মনকে সংসারের ভোগে একেবারে ডুবিয়ে না রেখে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে হয়। মোটকথা সংসারে ও জীবনে সৎ কি ও অসৎ কি, নিত্য কি ও অনিত্য কি—এ বিচার-বুদ্ধি পাকা ক'রে না ধরলে সংসারবন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন। গতানুগতিক ধারণা ও ধর্মাচরণ না ক'রে ধারণা ও আচরণের সঙ্গে সঙ্গে সদসদ্‌বিচারের জাগপ্রদীপ হৃদয়ে সর্বদা জাগিয়ে রাখতে হয়, তবেই মুক্তির ইচ্ছা ও আকুলতা অন্তরে জাগে ও জীবন সার্থক হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

॥ পাপ-পুণ্য নাই ॥

[প্রতিবেশী। তবে পাপ-পুণ্য নাই ?]

"শ্রীরামকৃষ্ণ। আছে, আবার নাই। তিনি যদি অহংতত্ত্ব রেখে দেন, তাহলে ভেদবুদ্ধিও রেখে দেন, পাপ-পুণ্য-জ্ঞানও রেখে দেন। তিনি দু'এক-জনেতে অহংকার একেবারে পুঁছে (মুছে) ফেলেন, তারা পাপ-পুণ্য—ভাল-মন্দের পার হ'য়ে যায়। ঈশ্বরদর্শন যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি—ভাল-মন্দ জ্ঞান থাকবেই থাকবে। তুমি মুখে বলতে পারো—'আমার পাপ-পুণ্য সমান হয়ে গেছে, তিনি যেমন করাচ্ছেন, তেমনি করছি', কিন্তু অন্তরে জান যে, ও সব কথামাত্র, মন্দ-কাজটি করলেই মন ধুগ্‌ ধুগ্‌ করবে। ঈশ্বর-দর্শনের পরও তাঁর যদি ইচ্ছা হয় তিনি 'দাস-আমি' রেখে দেন। সে অবস্থায় ভক্ত বলে—'আমি দাস, তুমি প্রভু'। সে ভক্তের ঈশ্বরীয় কথা—ঈশ্বরীয় কাজ ভাল লাগে, ঈশ্বরবিমুখ লোককে ভাল লাগে না, ঈশ্বর-ছাড়া কাজ ভাল লাগে না। তবেই হলো, এরূপ ভক্তেতেও তিনি ভেদবুদ্ধি রাখেন।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, (১ম ভাগ ১৩৬৬), পৃঃ ১৪৪

উল্লেখযোগ্য যে, নিত্যজীব, মুক্তজীব, মুমুক্ষুজীব ও বদ্ধজীবের লক্ষণ ও প্রকৃতির আলোচনা পূর্বে করেছি এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের (১ম ভাগ, ১৩৬৬,) ১৯৬ পৃষ্ঠায়ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব সে প্রসঙ্গে আলোচনা করছেন। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে পাপ-পুণ্য-জ্ঞানের ও ভেদবুদ্ধির কথা বলেছেন তা বদ্ধজীবের সম্বন্ধেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কেননা ঈশ্বরীয় জ্ঞান লাভ ক'রে মুক্তজীবের জীবন, কর্ম ও চিন্তার সকল-কিছুই পরিবর্তিত বা

রূপান্তরিত হয়। আত্মজ্ঞান-লাভের পর জীবন্মুক্ত পুরুষ পৃথিবীতে ও মায়ার সংসারে বাস করেন এবং সর্বসাধারণের মতোই আচরণ করেন বটে, কিন্তু সেই বাস করা ও জীবন-আচরণের সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনচর্যার কোন-কিছুর সঙ্গেই মেলে না। তখন পাপ-পুণ্য, সদসৎ, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, লাভ-অলাভ সব সমান জ্ঞান হয়। গীতায় দেখি, অর্জুন যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে মোহে আচ্ছন্ন হয়ে সাধারণ মানুষের মতো যুদ্ধকর্ম থেকে নিবৃত্ত হতে চাচ্ছেন অথচ সারথি, বন্ধু, গুরু, সর্বজ্ঞানবিৎ ও ব্রহ্মজ্ঞানবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সম্মুখে উপবিষ্ট, তখন অর্জুনের মোহ ও ভ্রম দূর করার জন্য, জীবন্মুক্ত পুরুষের জীবন-লক্ষণের কথা স্মরণ করতে বলেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন: "সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ" (২।৩৮)। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে অজ্ঞান দূর ক'রে জ্ঞানের আশীর্বাদ লাভ করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন: "ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি" (২।৩৮)। যখন পাপ-পুণ্যের তুল্য বা সমান জ্ঞানের উদয় হয় তখন পাপ-পুণ্য—জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে সর্বোত্তীর্ণ ও পরমশ্রেয়স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধি হয়। ভাসাভাসা, বৌদ্ধিক জ্ঞান বা শাস্ত্রজ্ঞান নয়, প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ-ব্রহ্মানুভূতি লাভ যখন হয় তখনই রিলেটিভ বা আপেক্ষিক জগতের দ্বন্দ্বজ্ঞান ও ভেদবুদ্ধি দূর হয়, অন্যথা দুইয়ের বা দ্বন্দ্বদৃষ্টি মায়ার জগতে বাস ক'রে ভেদবুদ্ধির পারে যাওয়া যায় না। যাওয়ার ভান করলেও তা মিথ্যাচারে পরিণত হয়, অথবা তা উপহাসের সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলেছেন: "ঈশ্বর দর্শন যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি ও ভাল-মন্দ জ্ঞান থাকবেই থাকবে। তুমি মুখে বলতে পার—আমার পাপ-পুণ্য সমান হয়ে গেছে, তিনি যেমন করাচ্ছেন তেমনি করছি, কিন্তু অন্তরে জান যে, ও সব কথা মাত্র।"

সত্য যে, পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ জগতে নাই, আবার আছেও। সেকথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন: "আছে, আবার নাই।" আছে, আবার নাই—একথা সাধারণত হেঁয়ালীর মতো শোনায় বটে, কিন্তু দেশ-কালে সীমাবদ্ধ মায়ার জগতে একটি জিনিস আর-একটি জিনিসকে অপেক্ষা ক'রে রয়েছে—'one exists in relation to the other'। কলকাতা-শহর বা এখানকার যে-কোন গ্রাম বা নগরের অস্তিত্ব রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে

যুক্ত হয়ে। তেমনি পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে ভারতবর্ষকে অপেক্ষা ক'রে, অর্থাৎ ভারতবর্ষের মধ্যে যুক্ত হয়ে। তাই দেশ-কাল-নিমিত্তের সংসারে কোন জিনিসই স্বাধীন বা একক নয়। পৃথিবীও আছে সূর্যের দ্বারা আকর্ষিত হয়ে, চন্দ্র রয়েছে পৃথিবীর আকর্ষণে এবং অপরাপর গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রপুঞ্জও সৌরজগতের প্রাণকেন্দ্র সূর্যের আকর্ষণকে অপেক্ষা ক'রে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। সুতরাং পাপ ও পুণ্য—ভাল ও মন্দ পদার্থ বা গুণ আপেক্ষিক সত্তারূপে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে আছে। একটি পরিবেশে বা অবস্থায় যে বস্তুটি আমাদের কাছে ভাল বা পুণ্যময় বলে মনে হয়, পরিবেশের বা অবস্থার পরিবর্তনে সে বস্তু আবার মন্দ বা পাপময় বলে মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গের বহু অধিবাসীই মৎস্য-মাংস আহার করেন, মৎস্য বা মাংস তাঁদের কাছে মন্দ বা পাপযুক্ত বলে মনে হয় না, অথচ দক্ষিণ-ভারতের বহু অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে মৎস্য-মাংস-আহার নিষিদ্ধ, সুতরাং মন্দ ও পাপময় বলে তাঁরা মনে করেন। আসলে বস্তুহিসাবে মৎস্য ও মাংস কিন্তু পাপ-পুণ্য বা ভাল মন্দ-দোষ দুষ্ট নয়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিয়েছেন একই প্রদীপের আলোর নীচে ভাগবদ্‌পাঠ ও দলিল জাল-করার উপমা দিয়ে। পাপ-পুণ্য বা ভাল-মন্দ কর্মফল ও পরিবেশকে অপেক্ষা ক'রে রূপগ্রহণ করে। এ উপমা হয়তো ষোলআনাভাবে আপেক্ষিক বস্তু বা গুণ হিসাবে পাপ-পুণ্যের উদাহরণের বেলায় খাটে না, কিন্তু একই নিরপেক্ষ বস্তু, পরিবেশ ও অবস্থার পরিবর্তনের জন্য যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রূপায়িত হয় একথা সত্য।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ Philosophy of Good and Evil (ফিলজফি অব্ গুড এ্যাণ্ড ইভিল্) পুস্তিকায় এভাবে আপেক্ষিকতার উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পাপ-পুণ্য বা ভাল-মন্দ বলে সত্যকারের কোন জিনিস নেই, কেননা একই বস্তু অবস্থাবিশেষে, দেশবিশেষে বা ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ অনুযায়ী পাপ বা পুণ্য—ভাল বা মন্দ বলে মনে হয়। তিনি ঐ মৎস্য-খাওয়ার উদাহরণটিও দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণদেশীয় লোকের ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক, লৌকিক ও আচার-ব্যবহারের দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য। মানুষের মধ্যে তাই এবং জীব-জন্তুর মধ্যেও তাই। একজন মানুষকে পাপী বলে মনে হয় তার পাপ বা মন্দ কর্ম বা ব্যবহারের

জন্য, আবার সে মানুষই যখন মানব-কল্যাণের বা দেশহিতের জন্য কর্ম করে, তখন তাকে পুণ্যবান বা সৎ বলে মনে হয়। সুতরাং পাপ ও পুণ্য—ভাল ও মন্দ সম্পূর্ণ আপেক্ষিক বস্তু বা ধর্ম, বিভিন্ন পরিবেশ বা অবস্থাকে অপেক্ষা ক'রে তাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ দেখা যায়; তারি জন্য যাকে আমরা পাপ বলে মনে করি, সেই অবস্থা বা পরিবেশের পরিবর্তন হলে তাকেই আবার পুণ্য বলে মনে করি। তাহলে সত্যকার ভাবে পাপ ও পুণ্য আছে কিনা?—এ প্রশ্ন যদি কেউ করে, তবে বলবো যে, আসলে পাপ ও পুণ্যের অস্তিত্ব নাই, অথচ আপেক্ষিক জগতে কর্মানুসারে, চিন্তা-অনুসারে ও পরিবেশ-অনুযায়ী পাপ ও পুণ্যের প্রকাশ হয় মন্দ ও ভালোর রূপ ও অবস্থা নিয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "তিনি যদি অহংতত্ত্ব রেখে দেন, তাহলে ভেদ-বুদ্ধিও রেখে দেন। পাপ-পুণ্য জ্ঞানও রেখে দেন।" এখানে বদ্ধজীব ও মুক্তজীব এ উভয়পক্ষেই একথার ব্যাখ্যা করা যায়। বদ্ধজীব যে, তার অজ্ঞান থাকে, সুতরাং তার ভেদবুদ্ধি ও পাপপুণ্যবুদ্ধি থাকে। কিন্তু মুক্তজীব যিনি, তিনি সংসারে থাকলেও ব্যবহারিকভাবে লোকত নিজের মধ্যে ভেদবুদ্ধি রেখে দেন।

সাংখ্যদর্শনে সৃষ্টিক্রমে পুরুষ, প্রকৃতি, প্রকৃতি-বিকৃতি বা মহৎ, অহং বা অহংতত্ত্ব প্রভৃতির কথা আছে। অহংতত্ত্ব জীব বা মায়ার নামান্তর। আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের পর অহং, অহংকার বা মায়া থাকে না। মায়াই অজ্ঞান। অজ্ঞান অন্ধকার ও জ্ঞান আলোক। আলোক থাকলে অন্ধকার থাকে না। ঈশ্বরজ্ঞান লাভ হলে মায়া বা অহংতত্ত্বের লোপ হয়। কিন্তু যাঁরা ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করেও জীবন্মুক্ত মহামানবের মতো মায়ার সংসারে থাকেন কোন কল্যাণময় উদ্দেশ্যসাধনের জন্য, তাঁদের অজ্ঞানের কার্য স্থূলশরীর যখন থাকে তখন অজ্ঞান বা অহংতত্ত্বও (পার্থিব 'আমি'-জ্ঞান বা কিছুটা অহংজ্ঞান) থাকে। অহংজ্ঞান বা অহংতত্ত্ব থাকার অর্থ কিছুটা মায়িক কিংবা ব্যবহারিক ভেদজ্ঞান দ্বৈতবুদ্ধিও রাখা। বেদান্তদর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্র স্বীকার করে যে, লোকব্যবহারের জন্য 'আমি-তুমি' এ ব্যবহারিক ভেদবুদ্ধি থাকে, অন্যথা মায়িক সংসারে ব্যবহার বা কোন কার্যই করা চলে না। তবে বেদান্ত ও অন্যান্য অধ্যাত্মশাস্ত্র একথাও বলে যে,

জীবন্মুক্ত পুরুষের লোকব্যবহারের জন্য, অথবা মায়িক সংসারে কাজ করার জন্য মায়া বা অহংতত্ত্ব থাকলেও তা জীবন্মুক্ত জ্ঞানীর কোন অনিষ্ট-সাধন করতে পারে না, কিংবা সে অজ্ঞান কোনদিন জ্ঞানীর বন্ধন সৃষ্টি করে না। জ্ঞানীর পক্ষে লোকব্যবহারের জন্য ব্যবহারিক ভেদবুদ্ধি বা লোকত পাপ-পুণ্যজ্ঞান থাকলেও সে ভেদজ্ঞান জ্ঞানীর জ্ঞানের কোন অন্যথা করে না। ভেদের বা দ্বৈতের সংসারে 'আমি-তুমি'-ভেদ, পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ প্রভৃতি জ্ঞান না থাকলে সংসারে ব্যবহার করার কোন সার্থকতা থাকে না। তাই জ্ঞানীরা ব্যবহারিকভাবে সকল-কিছুর ভেদবুদ্ধি রাখেন বটে, কিন্তু পারমার্থিকভাবে সকল-কিছুতেই তাঁদের অভেদ-ব্রহ্মবুদ্ধির প্রকাশ থাকে। জ্ঞানীর ভেদবুদ্ধি আপাতত এবং তা পোড়া-দড়ির মতোই থাকে। পোড়া-দড়ি দিয়ে যেমন কোন-কিছুর বন্ধনকার্য হয় না, ব্রহ্মজ্ঞানীর আপাত-ভেদবুদ্ধিতেও তেমনি সংসারবন্ধন হয় না। আর শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বলেছেন: 'তিনি দু'একজনেতে অহংকার একেবারে মুছে ফেলেন, তারা পাপ-পুণ্য ভাল-মন্দের পার হয়ে যায়' তার অর্থ—'ঈশ্বরদর্শন যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি ও ভাল-মন্দ জ্ঞান থাকবেই থাকবে।' পূর্বেই বলেছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা বা বাণীকে দু'রকমভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমত, অজ্ঞানীর অজ্ঞান ও তার কার্যরূপ ভেদবুদ্ধি ও পাপ-পুণ্যের জ্ঞান স্বাভাবিক ভাবেই থাকে, আর দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরকে দর্শন যিনি করেছেন, বা যিনি আত্মজ্ঞানী, তিনি লোককল্যাণের জন্য যদি পৃথিবীতে থাকেন তাহলে তিনিও ব্যবহারিকভাবে বা লোকত ভেদবুদ্ধি নিজেকে রাখেন—যদিও পারমার্থিকভাবে রাখেন না। আবার ঈশ্বরের দর্শন লাভ ক'রে ও সমস্ত ভেদবুদ্ধির পারে গিয়ে যাঁরা লোককল্যাণ করার জন্য পার্থিব শরীর রাখতে চান না, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র, তাঁরা ঈশ্বরকোটি নন। ঈশ্বর-দর্শনের পর তাঁদের আর কোন ভেদবুদ্ধি থাকে না, কেননা ভেদবুদ্ধির কারণ যে অজ্ঞান, সে অজ্ঞান ঈশ্বরদর্শনের পর আর থাকে না, নষ্ট হয়ে যায়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ "জ্ঞানাগ্নি সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন" শ্লোকে এ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। টীকাকার ও ভাষ্যকাররা বিচিত্রভাবে ঐ শ্লোকের উপর আলোক-পাত ক'রে বলেছেন দু'রকম ভাবে: (১) আত্মজ্ঞানের পর সকল কর্ম ও অজ্ঞান ধ্বংস হয়ে যায়, (২) আর আত্মজ্ঞানের পর যিনি জীবন্মুক্তির আশীর্বাদ লাভ

ক'রে মায়ার সংসারে থাকেন লোককল্যাণের জন্য, তাঁদের কিছুটা অজ্ঞান অর্থাৎ পার্থিব শরীর থাকে লোকব্যবহারের জন্য ও সে অজ্ঞান জ্ঞানীর বন্ধনের কারণ হয় না।

তবে যারা জ্ঞানের ভান করে ও অজ্ঞানে বলে—'তিনি (ঈশ্বর) সব করাচ্ছেন, আমি কিছুই করি না,'—তারা মিথ্যাচারী, কেননা আত্মজ্ঞানের উপলব্ধি না হলে কোনদিনই অহংজ্ঞান ও ভেদবুদ্ধি দূর হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "ঈশ্বর-দর্শনের পরও তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তিনি 'দাস আমি' রেখে দেন। সে অবস্থায় ভক্ত বলে—'আমি দাস, তুমি প্রভু'।" প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরদর্শনের পর যাঁরা লোককল্যাণের জন্য শরীর রেখে দেন, তাঁরা কর্তৃত্বহীন 'আমি'-বোধকে 'তুমি'-বোধে রূপান্তরিত করেন—যে নিদর্শন দেখি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিজের জীবনে। শঙ্করাচার্যও ব্যবহারিকভাবে 'আমি'-ভাব রেখে মঠপ্রতিষ্ঠা, ধর্মপ্রচার, শাস্ত্র ও ভাষ্যাদির প্রণয়ন প্রভৃতি কার্য করেছিলেন, কিন্তু সে 'আমি' বিদ্যার আমি, সে আমিতে বন্ধন হয় না, সে আমি বা অহংতত্ত্ব হিংচেশাক বা মিছরির মতো, কিছু অনিষ্ট করে না, বরং উপকার সাধন করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, আচার্য শঙ্কর প্রভৃতি অবতারগণ ছিলেন জ্ঞানী ও যথার্থ প্রেমিক। তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরজ্ঞান ছিল জলন্তভাবে ও সেই জলন্ত ঈশ্বরজ্ঞান নিয়ে তাঁরা সংসারে বিশ্বকার্য ও লোককল্যাণ সাধন করতেন। সুতরাং ঈশ্বরকে জেনে বা আত্মজ্ঞান উপলব্ধি ক'রে সংসার করা যায়, আবার ঈশ্বরজ্ঞান লাভ না ক'রেও অজ্ঞানে সংসার করা যায়। এ দু'রকম সংসার করাতে পার্থক্য অনেক, কেননা জ্ঞান লাভ ক'রে সংসার করা—যাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন 'তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙা'—তাতে সংসারের ময়লা জ্ঞানীর গায়ে লাগে না, তখন তিনি পাঁকের মধ্যে থাকেন পাঁকাল মাছের মতো, অথচ তাঁর গায়ে কোন পাঁক বা কাদা লাগে না। অজ্ঞানীর পক্ষে সংসারে থাকা স্বাভাবিক। অজ্ঞানী মায়ার সংসারে থেকে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়, ভেদবুদ্ধি তখন সত্যকারের হয়, ভাল-মন্দ-জ্ঞান তখন সম্পূর্ণভাবে থাকেই, আর কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ—এ বিচার-বুদ্ধিও তখন ম্লান হয়ে যায়। সুতরাং ঈশ্বর অহংতত্ত্ব রেখে দেন দু'রকমভাবে দু'জনের পক্ষে—তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে ও অজ্ঞানীর পক্ষে। তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে 'অজ্ঞানলেশ' থাকে ব্যবহারিকভাবে লোকব্যবহাররূপ

সংসারকর্ম করার জন্য, কিন্তু সে অজ্ঞান জ্ঞানীর কোন অনিষ্ট সাধন করতে পারে না। অজ্ঞানীর পক্ষে সাধারণভাবেই থাকে অহংজ্ঞান। তখন অজ্ঞান সাধারণ সংসারীকে আবদ্ধ ও মোহিত করে। পুনরায় উল্লেখযোগ্য যে, জ্ঞান না হলে উপলব্ধির ভান ক'রে যদি কেউ বলে যে, ঈশ্বরই সকল-কিছু করাচ্ছেন, আমি সকল কার্য করি যেমন তিনি করান, তাহলে তার নাম মিথ্যাচার। সে মিথ্যাচারে অকল্যাণ হয়। তবে যদি কেউ অহংকার বা অহংজ্ঞান দূর করার জন্য সাধন ক'রে বলে 'আমি যন্ত্র, তিনি (ঈশ্বর) যন্ত্রী', 'আমি অকর্তা, তিনি কর্তা', তাহলে সে অহংজ্ঞানের পারে যেতে পারে। কিন্তু বলাটা অন্তর থেকে ও মন-মুখ এক ক'রে হওয়া চাই।

নবম পরিচ্ছেদ

॥ অহং গেলেই মুক্তি ॥

[মায়া বা অহং-আবরণ গেলেই মুক্তি বা ঈশ্বর লাভ]

"বিজয়। মহাশয়, কেন আমরা-এরূপ বদ্ধ হয়ে আছি? কেন ঈশ্বরকে দেখতে পাই না?

শ্রীরামকৃষ্ণ। জীবের অহংকারই মায়া। এই অহংকার সব আবরণ ক'রে রেখেছে।

আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল। যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেল তা হলে সে ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (১ম ভাগ ১৩৬৬), পৃঃ ৯৪

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মাঝে মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট আসেন, এবারও এসেছেন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে শ্রীভগবানের অবতার বলে স্বীকার করেছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে 'জীবের বন্ধন ও ও মুক্তি'-প্রসঙ্গ নিয়ে যখন আলোচনা করছিলেন তখন মানুষ মায়াশৃঙ্খলে বদ্ধ হয় এবং ঈশ্বর সর্বভূতে ও সর্বত্র বিরাজমান থাকলেও কেন তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না সে'-সবের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন, মায়ার জন্যই মানুষ ঈশ্বরকে দর্শন করতে পারে না।

কিন্তু মায়া কি? শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'মায়াই অহংকার' বা অহং-আবরণ। গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ে সাতাশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন: "অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে", অর্থাৎ অহংকারে বিমূঢ় হ'য়ে

ঈশ্বর কর্তা ও যন্ত্রী আর মানুষ যন্ত্র মাত্র—এ তত্ত্ব ভুলে গিয়ে নিজেকেই যন্ত্রী ও কর্তা বলে মনে করে। এই মনে করার নাম ভ্রম। আচার্য শঙ্কর বেদান্তসূত্রভাষ্যে একে ভুলজ্ঞান বলেছেন। এ সম্পর্কে আলোচনার সময়ে অধ্যাসভাষ্যে শঙ্কর ভুলজ্ঞানকে 'মিথ্যাপ্রত্যয়' বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আরও সোজা ক'রে পরিষ্কারভাবে বলেছেন—'জীবের অহংকারই মায়া'। 'অহং' কিনা অহংকার। 'আমি আমি' ইত্যাকার জ্ঞানের নাম অহংকার। অহংকারও জ্ঞান, তবে ভুলজ্ঞান বা অযথার্থজ্ঞান। সে রকম অজ্ঞানও জ্ঞান, তবে ভ্রমজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান।

আচার্য শঙ্কর ভ্রম বা মিথ্যাজ্ঞান কী তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন: "মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য অহমিদং মমেদমিতি নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ।" মিথ্যাজ্ঞান নৈসর্গিক। সাধারণভাবে মানুষ মিথ্যাজ্ঞানই ব্যবহার করে। ভুল হওয়াই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কোন্‌টি সত্য ও কোন্‌টি অসত্য না বোঝার নাম অবিবেক বা বিবেকবুদ্ধিহীনতা। কোন্‌টি সত্য ও কোন্‌টি অসত্য, কিংবা কোন্‌টি নিত্য বা শাশ্বত এবং কোন্‌টি অনিত্য ও পরিবর্তনশীল তা বুঝে প্রথমে একটি থেকে অপরটিকে পৃথক্ করে, পরে পৃথক ক'রে নিত্যকে গ্রহণ করে, অনুসরণ করে ও জীবনে প্রতিভাত ও আচরণ করে, এরই নাম 'বিবেক'। অবিবেক তা পারে না। অবিবেকের নাম অজ্ঞান। বিচারবিহীনতা ভ্রম, একে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন 'অহংকার'। অহংকারই অজ্ঞান ও ভ্রম। তার কারণ, ঈশ্বর বা ব্রহ্মচেতন্যই যে সকল-কিছু পদার্থের ও কর্মের কারণ ও উৎস—ভ্রম তা জানতে ও বুঝতে দেয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মাঝে মাঝে আবৃত্তি করতেন—'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু', অর্থাৎ অহংকারযুক্ত জীব বা জীবাত্মা সকল-কিছুর কারণ নয়, ঈশ্বর বা পরমাত্মাই কারণ—এ বিচারের নাম জ্ঞান ও তার বিপরীত অজ্ঞান বা অবিদ্যা। অধ্যাসভাষ্যে আচার্য শঙ্কর এ সম্বন্ধে বলেছেন: "এবমবিরুদ্ধঃ প্রত্যগাত্মন্যপ্যনাত্মাধ্যাসঃ। তমেতমেবং লক্ষণমধ্যাসং পণ্ডিতা অবিদ্যেতি মন্যন্তে। তদ্বিবেকেন চ বস্তুস্বরূপাবধারণং বিদ্যামাহুঃ।"

অবিদ্যা ও বিদ্যা—দুটি শব্দ। একটি অজ্ঞান ও অন্ধকার—negative ও অপরটি জ্ঞান ও আলোক—positive। অজ্ঞান বা অবিদ্যা অহং-রূপ আবরণ। এর নাম অবিবেক। জ্ঞান বা বিদ্যা বিবেক—যা বস্তুর যথার্থ স্বরূপ বুঝিয়ে দেয়

বা নিশ্চয় (ascertain) করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব পণ্ডিতের মতো পঙ্‌ক্তি লাগিয়ে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ও অপর অধ্যাত্মগ্রন্থ পড়েন নি, কিন্তু ভাষ্যের অর্থ ও তত্ত্ব অধিগত করেছিলেন সর্বাবভাসক দিব্যজ্ঞানের আলোক লাভ ক'রে। সেজন্য অজ্ঞান, অবিদ্যা বা মায়ার অর্থ করতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, অহংকার আবরণ অর্থাৎ আচ্ছাদনের মতো। বলেছেন: "অহংকার সব আবরণ ক'রে রেখেছে"। এই আবরণ কি রকম? শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্য সূর্যকে দেখা যায় না, মেঘ সরে গেলেই সূর্যকে দেখা যায়।" ঠিক এভাবে এবং এরকম ভাষায়ই শ্রীসদানন্দ যোগীন্দ্র-সরস্বতী 'বেদান্তসার'-গ্রন্থে আবরণশক্তির উদাহরণ দেবার সময়ে বলেছেন: "আবরণশক্তিস্তাবৎ অল্পঃ অপি মেঘঃ অনেকযোজনাতয়ম্ আদিত্যমণ্ডলম্ অবলোকয়িতৃনয়নপথপিধায়কতয়া যথা আচ্ছাদয়তি তথা অজ্ঞানং পরিচ্ছিন্নম্ অপি আত্মানম্ অপরিচ্ছিন্নম্ অসংসারিণম্ অবলোকয়িতৃ-বুদ্ধিপিধায়কতয়া আচ্ছাদয়তি ইব তাদৃশং সামর্থ্যম্ তদুক্তম্" বলে হস্তামলক-রচিত স্তোত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন:" "ঘনচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনচ্ছন্নমর্কম্ যথা * * চাতিমূঢ়"—অর্থাৎ আচ্ছন্নদৃষ্টি অতিমূঢ় ব্যক্তি যেমন সূর্যকে মেঘাচ্ছন্ন ও নিষ্প্রভ মনে করে, তেমনি মূঢ় বা ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট আত্মা বদ্ধবৎ প্রকাশিত হন, আমিই সেই নিত্যোপলব্ধি রূপ আত্মা এ তত্ত্ব তার উপলব্ধি হয় না। অজ্ঞানরূপ মেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন বা আবৃত হওয়ার জন্য আকাশে সূর্যকে কিছুক্ষণের জন্য দেখা যায় না, কিন্তু মেঘ সরে গেলে আবার সূর্য প্রকাশিত হয়। সূর্য আকাশেই ছিল, মেঘের আবরণের জন্য দেখা যাচ্ছিল না—এই যা। ঠিক তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "সামান্য মেঘের জন্য সূর্যকে দেখা যায় না, মেঘ সরে গেলেই দেখা যায়।"

অহংকার অজ্ঞান বা আবরণ। স্বার্থকেন্দ্রিক (ego-centric) মানুষ 'পাকা-আমি'-রূপ পরমাত্মাকে স্বার্থপরতার আবরণের (আচ্ছাদনের) জন্য 'কাঁচা-আমি' বা রক্ত-মাংসযুক্ত জড় শরীরবান জীবাত্মা বলে মনে করে, বা জীবাত্মাকে আত্মা বলে ভ্রম করে। এই ভ্রম হয় সীমিত বুদ্ধির জন্য। সীমায়িত বুদ্ধি বা আচ্ছন্ন জ্ঞানকেই অহংকার বলে। অজ্ঞান বা মমত্ববুদ্ধিরূপ অহংকার চলে গেলে জ্ঞানের প্রকাশ হয়। আচার্য শঙ্কর অধ্যাসভাষ্যে বলেছেন: "দেহেন্দ্রিয়াদিষ্বহংমমাভিমানরহিতস্য প্রমাতৃত্বানু-

পপস্তৌ" প্রভৃতি। দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জড় ও অচেতন, তারা চৈতন্যময় হয় আত্মার চৈতন্যে প্রদীপ্ত হয়ে। কিন্তু দেহকেন্দ্রিক মোহবদ্ধ মানুষ আত্ম-চৈতন্যকে চৈতন্যহীন জড় ও দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা বলে মনে করে। সে মনে করার নাম ভ্রম বা ভুল। এই ভ্রম বা ভুলজ্ঞানকে আচার্য শঙ্কর 'মিথ্যাপ্রত্যয়' বলছেন সেকথা পূর্বে বলেছি। প্রত্যয় কিনা মনে করা, জ্ঞান, বিশ্বাস, অনুভূতি প্রভৃতি। প্রত্যয় সত্য হয়, আবার মিথ্যা হয়। মিথ্যাপ্রত্যয়ই সংসারে মানুষের অনিষ্ট সাধন করে। আচার্য শঙ্কর একথাই একটু ভিন্নভাবে বলেছেন: "এবময়মনাদিঃ অনন্তো নৈসর্গিকোঽ-ধ্যাসো মিথ্যাপ্রত্যয়রূপ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বপ্রবর্তকঃ সর্বলোকপ্রত্যক্ষঃ।" মিথ্যা-প্রত্যয়রূপ ভুলজ্ঞানই 'অধ্যাস'। ভুলজ্ঞানই কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব—'আমি কর্তা, আমি ভোক্তা' প্রভৃতি অহংকারের বীজ রোপণ করে। এটি অনর্থ এবং অনর্থই পাপ। সুতরাং অনর্থ ও পাপ-রূপ মিথ্যাজ্ঞানকে দূর করতে হলে আত্ম-স্বরূপের উপলব্ধি প্রয়োজন। আত্মচৈতন্যই যে সকল বস্তু, সকল প্রাণী ও বিশ্বচরাচরের প্রাণ, প্রতিষ্ঠা ও কারণ এই যথার্থজ্ঞান উপলব্ধি করা প্রয়োজন। আচার্য শঙ্কর অধ্যাসভাষ্যে বলেছেন: "অস্যানর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ব-বিদ্যা প্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে।" অনর্থের কারণ ভ্রম বা মিথ্যা-জ্ঞান এবং এ ভ্রম, অজ্ঞান, অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয় সত্যজ্ঞানরূপ 'পাকা-আমি'-র জ্ঞান (আত্মজ্ঞান) হলে। বেদান্তশাস্ত্র ভ্রমজ্ঞান দূর ও আত্মজ্ঞান-উপলব্ধি করার জন্য বারবার বলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরও আকুলতা তাই। তিনি সকলকে মুক্তিপথের সন্ধান দেবার জন্য ভিন্নভাবে কখনও ভক্তিপথে, কখনও জ্ঞানপথে মানুষকে প্রেরণা দিয়েছেন। ভক্তিপথের সন্ধান দিয়ে তিনি বলেছেন:

(ক) "যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেলে সে ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই।"

(খ) "মেঘ সরে গেলেই সূর্যকে দেখা যায়। যদি গুরুর কৃপায় একবার অহং-বুদ্ধি যায়, তাহলে ঈশ্বর দর্শন হয়।"

(গ) "মানুষের কি সাধ্য অপরকে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত করে। যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া, তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন।"

এর অর্থ শরণাগতি ও অহংকারশূন্যতা এলে ঈশ্বরের কৃপা হয়। গুরুই

ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি। তাই মানুষ যখন অহংকাররূপ মোহ ও ভ্রমের পারে যায় ও ঈশ্বরকে একান্তভাবে লাভ করার জন্য একাগ্রতা ও ধ্যানসমাহিত মন নিয়ে এগিয়ে যায় তখনই ঈশ্বরের ও গুরুর কৃপা হয়। কৃপা কোন বস্তুর অধীন বা conditional নয়, চিত্তশুদ্ধি হলে ও চিত্তের একতানতা এলে কৃপা-বাতাস প্রবাহিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন ঃ "কৃপা-বাতাস বইছে, পাল তুলে দেনা।" কৃপা-বাতাস সর্বদাই প্রবাহিত, শুধু আমাদের পালতোলারূপ চেষ্টা, অভ্যাস ও সাধনা করা দরকার। তাই অদৃষ্ট থাকলেও পুরুষকার চাই।

জ্ঞানপথের নির্দেশ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন ঃ

(ক) "মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ। * *। আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র—যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, মধ্যে সীতারূপিণী মায়া ব্যবধান আছে বলে লক্ষ্মণ-রূপ জীব সেই ঈশ্বরকে দেখতে পান না। * * সেইরূপ ভগবান সকলের চেয়ে কাছে, তবু এই মায়ার আবরণের দরুন তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না।"

(খ) "জীব তো সচ্চিদানন্দস্বরূপ। কিন্তু এই মায়া বা অহংকারে তাদের সব নানা উপাধি হয়ে পড়েছে, আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব উপাধির কথা বলেছেন। উপাধিই গুণ, অর্থাৎ অজ্ঞান বা মায়া। অজ্ঞান বা মায়া যেমন মিথ্যাবস্তুকে সত্য বলে দেখায়, সত্য ও মিথ্যা এ দুটি জ্ঞানকে মানুষের সামনে উপস্থিত ক'রে কোন্‌টি সত্য ও কোন্‌টি মিথ্যা তা বুঝতে দেয় না, বরং ভুল বোঝায় ও ভুলই দেখায়, সেরূপ উপাধির স্বভাব ও স্বরূপ হোল পূর্ণবস্তুকে খণ্ড ও পৃথক ক'রে এবং সীমায়িত করে। উদাহরণ যেমন, ফুল বললে পৃথিবীর সকল ফুলকেই বোঝায়, কিন্তু লালফুল বললে সকল ফুল থেকে পৃথক ক'রে কেবল লালফুলকেই বোঝায়। আবার যদি বলি ছোট লালফুল, তাহলে লালফুলের মধ্যে সেগুলি ছোট, মাত্র সেগুলিকেই বোঝায়। সুতরাং ফুলকে সীমায়িত বা সঙ্কীর্ণ করাই উপাধির কাজ ও ধর্ম। মায়া পরিবর্তনশীল বস্তু, গুণ ও কর্ম। এবং উপাধিও। ঈশ্বরের সঙ্গে সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব—সাকারত্ব ও নিরাকারত্ব প্রভৃতি গুণ যুক্ত করার অর্থ সর্বব্যাপক ঈশ্বরচৈতন্যকে সীমাবদ্ধ করা। সেজন্য নিরাধার মায়াবিহীন শুদ্ধব্রহ্মে কোন উপাধি কল্পনা করা হয় না। উপাধি থাকার জন্যই ব্রহ্মবস্তু স্বরূপত যে কি তা উপলব্ধি করা যায় না।

সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব দু'রকভাবে মায়োত্তীর্ণ আত্মা ও মুক্তিস্বরূপের পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

(ক) "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।"

(খ) "জ্ঞান লাভ হলে অহংকার যেতে পারে। জ্ঞান লাভ হলে সমাধিস্থ হয়। সমাধিস্থ হলে তবে অহং যায়। সে জ্ঞান লাভ বড় কঠিন।"

(ক) 'আমি' মরার অর্থ মমত্ববোধরূপ অহংকার বা মায়া দূর হওয়া। অজ্ঞানই জঞ্জাল। সকল-কিছু অনর্থের সৃষ্টি করে অজ্ঞান বা অবিদ্যা। তাই আমি-র স্থানে তুমি-র আসন নির্বাচন করতে হয়। আমিত্ব ত্যাগ করার নামই ভ্রমজ্ঞান দূর করা—correction of error। অবিদ্যার নাশ যা, আত্মজ্ঞানের প্রকাশও তাই। অন্ধকারের অভাব ও আলোক একই। জ্ঞানরূপ আলোক স্বতঃসিদ্ধ, আবরণ বা আচ্ছাদন থাকার জন্য আলোককে দেখা যায় না—এই যা। তেমনি আত্মা স্বতঃপ্রকাশশীল, অজ্ঞানরূপ প্রতিবন্ধক দূর হলেই মানুষ নিজেকে আত্মস্বরূপ বলে উপলব্ধি করে।

(খ) জ্ঞানলাভের অর্থ আত্মজ্ঞানের উপলব্ধি ও অহংকাররূপ অজ্ঞান বা অবিদ্যা দূর করা। সংকীর্ণতার পরিবর্তে তখন সর্বব্যাপকতারূপ উদারতা আসে। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্র 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্'—ঈশ্বরচৈতন্য বিশ্বচরাচরের সর্বত্র বিদ্যমান। এ পরমরহস্য জ্ঞান হলে জানা যায়। জ্ঞানলাভ ও সমাধি প্রায় এক কথা। সমাধি মোটামুটি দু'রকম—সবিকল্প ও নির্বিকল্প, সবীজ ও নির্বীজ প্রভৃতি। সবিকল্পে একটু মায়ার লেশ—'আমি'-বোধ থাকে, নির্বিকল্পসমাধিতে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞানের নাশ হয়। অজ্ঞানের নাশ হয় বলতে ভুলজ্ঞানের পরিবর্তে সত্যজ্ঞানের প্রকাশ হয়। "জ্ঞানলাভ বড় কঠিন"—এ কথা উপনিষৎ ও বিশেষ ক'রে কঠোপনিষৎ "দুর্গমপথস্তৎ", "ক্ষুরস্য ধারা নিশিত দুরত্যয়া" প্রভৃতি কথাদ্বারা বুঝিয়েছে। তাহলেও দার্শনিক কাণ্ট যেমন বলেছেন আত্মা বা ব্রহ্ম (Absolute) অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় (unknown and unknowable), বেদান্ত সেকথা স্বীকার করে না। বেদান্ত বলে, আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান জ্ঞানের অবিষয় নয়, বরং ভুলজ্ঞানের পরিবর্তে সত্যজ্ঞানের উদয় হলে ব্রহ্মের যথার্থস্বরূপ জানা যায় এবং 'আত্মার আত্মা' বলে ব্রহ্মকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে উপলব্ধি করা যায়।

দশম পরিচ্ছেদ

॥ ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নাম ॥

[এক ঈশ্বর—তাঁর ভিন্ন নাম—জ্ঞানী যোগী ও ভক্ত]

"শ্রীরামকৃষ্ণ : 'জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে, আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান বলে।

একই ব্রাহ্মণ যখন পূজা করে, তার নাম পূজারী; যখন রাঁধে, তখন রাঁধুনি-বামুন। যে জ্ঞানী, জ্ঞানযোগ ধরে আছে, সে 'নেতি নেতি' এই বিচার করে—ব্রহ্ম এ নয়, ও নয়; জীব নয়, জগৎ নয়। এইরূপ বিচার করতে করতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্ম-জ্ঞানীর ঠিক ধারণা—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; নাম-রূপ এসব স্বপ্নবৎ। ব্রহ্ম কি যে, তা মুখে বলা যায় না; তিনি যে ব্যক্তি (Personal God) তাও বল্‌বার যো নাই।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, (১ম ভাগ ১৩৬৬), পৃ: ৫০

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, কেবল নামে ও রূপে ভিন্ন—একথাই শিক্ষা দিয়েছেন। ঈশ্বর (ব্রহ্মচৈতন্য) ভিন্ন ভিন্ন নামে ও রূপে কল্পিত হন ভিন্ন ভিন্ন সাধকের চিন্তা, দৃষ্টি ও বিচার অনুসারে। এর নিদর্শন দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, ব্রাহ্মণ একই ব্যক্তি, কিন্তু তার কাজের জন্য সে কখনও পূজারী, কখনও রাঁধুনি বলে অভিহিত হয়। একই অভিনেতা—কখনও রাজা, কখনও সেনাপতি, আবার কখনও ভৃত্য বা দূত সেজে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে। অভিনয়ের ভূমিকা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন হলেও ব্যক্তি বা অভিনেতা একজনই। একই পুকুরের জলকে কেউ

বলে পানি, কেউ ওয়াটার, কেউ এ্যাকোয়া, আবার কেউ বলে বারি। একই তুলো কখনও বালিশের খোলে বালিশ, কখনও তোষকের খোলে তোষক, আবার কখনও লেপের খোলে লেপ হয়। একই সোনা, কখনও বালা, কখনও হার, কখনও আঙটি প্রভৃতির আকার ও নাম গ্রহণ করে। তেমনি একই ঈশ্বর, পরমাত্মা বা ব্রহ্ম—তাঁকে জ্ঞানীরা বলেন 'ব্রহ্ম', ভক্তেরা বলেন, 'ভগবান' এবং যোগীরা বলেন 'পরমাত্মা'। বস্তু বা ব্যক্তি এক, কেবল নামে ও রূপে আলাদা।

নাম ও রূপ নিয়েই জগৎ। 'জগৎ' কিনা যা নদীর জলের মতো চলমান ও অস্থির। যা এই আছে ও পরক্ষণে নেই তাই জগৎ। মানুষের জন্ম হোল, সেই মানুষ যুবক হোল, আবার কিছুদিন পরে বৃদ্ধ হোল ও তারপর সংসার থেকে বিদায় নিয়ে সে নিরুদ্দেশের পথে চিরদিনের জন্য যাত্রা করলো। জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয়, অপচয়, বিকার এ সব নিয়েই পার্থিব সকল-কিছু। এদের কোনটারই স্থায়িত্ব নেই। পার্থিব বস্তুমাত্রই আজ আছে, কাল নেই। এটাই জগৎ, বিশ্বপ্রপঞ্চ বা সংসার। 'সম্ সরতি ইতি সংসারঃ', —সম্যক্‌রূপে বা ক্রমাগতই সরে সরে যায়, যার ক্রমাগতই পরিবর্তন, স্থায়িত্ব নেই, তাই সংসার। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: "বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, জীব-জগৎ—এসব শক্তির খেলা। বিচার করতে গেলে এসব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু। শক্তিও স্বপ্নবৎ—অবস্তু" (শ্রীশ্রীরামকথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ৫১)। চলমানতাই শক্তির লক্ষণ। অদ্বৈতবেদান্তের মতে, শক্তি মিথ্যা কিনা অনিত্য। অনিত্য অস্থিরতার জন্য। শক্তি গুণও বটে। শক্তি মায়ালেশহীন বিশুদ্ধ ব্রহ্মে কল্পনা করলে ব্রহ্ম সগুণ অর্থাৎ গুণযুক্ত বলে মনে হন। গুণ প্রকৃতির ধর্ম, সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তে প্রকৃতি বা শক্তি মায়া ও অবিদ্যারই সামিল। বেদান্ত প্রকৃতি, শক্তি, মায়া, অবিদ্যা এ সকলকে বলেছে অনিত্য অর্থাৎ পরিবর্তনশীল। বেদান্তের এই মত, কিন্তু তন্ত্র একথা স্বীকার করে না। তন্ত্রশাস্ত্রে শক্তি আদ্যাশক্তি ও পরমচৈতন্যরূপিণী। তন্ত্রে শক্তি নিত্যা ও বিশুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ শিবের অভিন্ন রূপ। নিত্যে শিব, লীলায় শক্তি। শক্তিতেই লীলা। অবতাররা শক্তির অবতার। তন্ত্রশাস্ত্রের মতে, শিব যখন স্বরূপে থাকেন না তখন শক্তি, আর শিবের সঙ্গে শক্তি যখন অবিনাভাবসম্বন্ধে চনকাকারে

যুক্ত থাকেন, তখন চৈতন্য ও চৈতন্যময়ী—শিব ও শক্তি উভয়েই এক ও অদ্বিতীয়। সুতরাং শক্তি তন্ত্রশাস্ত্রের দৃষ্টিতে অনিত্যা বা মিথ্যা নয়। তন্ত্রে শক্তির কার্য বা পরিণতি বিশ্বপ্রপঞ্চ সত্য, কেননা সত্যস্বরূপিণী নিত্যা শক্তিরই সত্য বিশ্বপ্রপঞ্চ লীলাবিলাস। অদ্বৈতবেদান্ত তন্ত্রের এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করে না। অদ্বৈতবেদান্তের মতে, মায়াবিরোহী শুদ্ধ ব্রহ্মই এক ও অদ্বিতীয়—একমাত্র নিত্য ও সত্য, আর দ্বিতীয় সমস্তই চিরপরিবর্তনশীল, সুতরাং অনিত্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব (অদ্বৈত-) বেদান্তের প্রসঙ্গে তন্ত্রসিদ্ধান্তের উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন নি। তিনি বলেছেন : "যে জ্ঞানী—জ্ঞানযোগ ধরে আছে, সে নেতি নেতি এই বিচার করে। ব্রহ্ম এ' নয়, ও নয় ; জীব নয়, জগৎ নয়—এরূপ বিচার করতে করতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশের অর্থ সুদূরপ্রসারী ও গভীর তত্ত্বপূর্ণ। সামান্য একটি বাণী, কিন্তু তার অর্থের প্রসারতা ও সার্থকতা অনেক বেশী। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী যেন সূত্রাকারে উপনিষদের বিশদ ও গভীর তত্ত্বের আলোচনা। বেদব্যাস উপনিষদের গভীর তত্ত্ব সূত্রাকারে লিখে বেদান্ত-দর্শনের সৃষ্টি করেছেন এবং আচার্য শঙ্কর, আচার্য রামানুজ, মাধ্ব, নিম্বার্ক, শ্রীকণ্ঠ, বলদেব প্রভৃতি ঐ সূত্রগুলির উপর আলোকপাত ক'রে ভাষ্য রচনা করেছেন। 'তত্তু সমন্বয়াৎ' বেদান্তদর্শনের চতুর্থ সূত্র। কথার স্বল্পতা, কিন্তু শঙ্করাদি আচার্যেরা বিশদভাবে তার অর্থ ও তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীও তাই। এই উনবিংশ-বিংশ শতকের সমাজে সহজ সরল ভাষায় সূত্রাকারে তিনি বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, পুরাণ, ভাগবত ও অন্যান্য অধ্যাত্মশাস্ত্রের তত্ত্বরাশির যথার্থ মর্ম উদ্ঘাটন করেছেন। তাঁর বাণী তাই শুনতে ও পড়তে বেশ সহজ বলে মনে হয়, কিন্তু সেই সহজ বাণী বা উপদেশের মধ্যে গভীর অর্থ ও তত্ত্ব লুকোনো আছে।

যেমন ধরা যাক্, তিনি বলেছেন : 'যে জ্ঞানী—জ্ঞানযোগ ধরে আছে, সে নেতি নেতি বিচার করতে করতে'···প্রভৃতি (পূর্বে একথার উল্লেখ করেছি)। 'নেতি নেতি' বিচারের অর্থ—এ বিশ্বপ্রপঞ্চ ও তার পদার্থ নিত্য চিরস্থায়ী নয়, প্রতিমুহূর্তেই তাদের পরিবর্তন হচ্ছে, তারা চলমান, সুতরাং স্থির নয়। তাহলে স্থির ও নিত্য কোন্ বস্তুর অস্তিত্ব আমরা মানবো ?

অদ্বৈতবেদান্ত ও জ্ঞানীরা বলেন, একমাত্র পরিবর্তনহীন ব্রহ্ম বা ব্যাপক-চৈতন্য যিনি—তিনিই নিত্য ও সত্য। তিনিই বিশ্বপ্রপঞ্চের সকল বস্তুতে অনুস্যূত রয়েছেন, আবার উত্তীর্ণ হয়েও আছেন। এই শাশ্বত ও নিত্য ব্রহ্মই বস্তু; আর সব অবস্তু কিনা অনিত্য। জীব এবং জগৎ অনিত্য ও চলমান, কিন্তু জীব ও জগতের যিনি প্রাণকেন্দ্র ও অধিষ্ঠানস্বরূপ, তিনি (সেই ব্রহ্মচৈতন্য বা ঈশ্বর) নিত্য ও সত্য। ঈশোপনিষদে ঐ অনুস্যূত ব্যাপকচৈতন্যকে 'ঈশ' বা 'ঈশ্বর' বলা হয়েছে—'ঈশা বাস্যং ইদং সর্বম্'। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "নিত্য ও অনিত্য, বস্তু ও অবস্তু কোন্‌টি এই ক্রমাগত বিচার করতে হয়, তাহলেই মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান।" মন স্থির হওয়ার নাম মনের লয়। মনের লয় হয় বলতে মনের যে সংকল্প ও বিকল্প দুটি বৃত্তি তাদের লয় বা নাশ হয়। তখন মন স্থির হয়। মন তখন নিজের স্বরূপ যে চৈতন্য তাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। পাতঞ্জলদর্শনে ঋষি পতঞ্জলি একথারই আভাস দিয়েছেন 'চিত্তবৃত্তির নিরোধ' ও 'নিরুদ্ধ মন স্বরূপে অবস্থান করে' এ' দুটি সূত্রের অবতারণা ক'রে। একথাও পূর্বে আলোচনা করেছি যে, যোগদর্শনে মনের নিরুদ্ধ অবস্থা ও মনের স্বরূপে অবস্থান ঠিক অদ্বৈতবেদান্তের শুদ্ধমন বা নির্মল অন্তঃকরণ, কিংবা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের পর ব্রহ্মোপলব্ধি নয়। কিন্তু সে যাই হোক, মনের লয় হওয়ার অর্থ মন চৈতন্যে রূপান্তরিত হয়। মন স্থির হলে তখন আর তাকে 'মন' বলা চলে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই অচঞ্চল ও বৃত্তিহীন মনকে 'শুদ্ধমন' বলেছেন। তিনি বলেছেন: "ব্রহ্ম মন-বুদ্ধির অগোচর, কিন্তু শুদ্ধমনের গোচর"। শুদ্ধমন ও শুদ্ধচৈতন্য এক কথা। 'বোধে বোধ'। প্রথম বোধের অর্থ শুদ্ধমন, বিশুদ্ধ-জ্ঞান বা চৈতন্য এবং দ্বিতীয় বোধের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান। মনের বৃত্তি দূর হলে সেই বৃত্তিহীন স্থির মন ব্রহ্মচৈতন্যের আকারে আকারিত হয়। একেই অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে জ্ঞানদৃষ্টি বলে। ব্রহ্মাকারে আকারিত মন বা বুদ্ধি তখন উপলব্ধিরূপ ব্রহ্মস্বরূপে প্রকাশিত হয়। তখন অজ্ঞানের নাশ ও ব্রহ্ম-জ্ঞানের প্রকাশ হয়। তখনই ঠিক মনে হয় যে, নাম-রূপময় জীব-জগৎ মিথ্যা স্বপ্নের মতো। স্বপ্ন ততক্ষণই সত্য যতক্ষণ মানুষ স্বপ্ন দেখে, কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে গেলে স্বপ্ন মিথ্যা বলে জ্ঞান হয়। তেমনি যতক্ষণ অজ্ঞান বা অবিদ্যার মধ্যে মানুষ বাসকরে, ততক্ষণ জীব-জগৎ ঈশ্বর বা ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন ও জগৎ সত্য

মনে হয়, কিন্তু অজ্ঞান বা অবিদ্যার ঘুম ভেঙে গেলে জীব-জগৎ অনিত্য বলে জ্ঞান হয় ও তখন মনে হয় একমাত্র ঈশ্বর[১] বা ব্রহ্মই সত্য। আরও পরিষ্কার ক'রে বল্লে বলা যায়, ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মানুভূতি হলে বিশ্বপ্রপঞ্চের সকল জিনিসেই তখন ব্রহ্মদৃষ্টির স্ফূরণ হয়। তখন মনে হয় যে, লবণ যেমন সমগ্র জলে ওতপ্রোতভাবে ছড়িয়ে থাকে, তেমনি ব্রহ্মচৈতন্য বিশ্বের চেতন ও অচেতন সকল জিনিসেই ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞানীর দৃষ্টি তখন ভিন্ন হয়,—চৈতন্যদৃষ্টি হয়। তখন জড়ও চৈতন্যরূপে প্রতীয়মান হয়। এটি অনুভবের বিষয়, কেবল বিচার, অনুশীলন বা পাণ্ডিত্যের জিনিস নয়। মানুষের এ অনুভূতি হলে তবেই সে বোঝে—ব্রহ্মদৃষ্টির সত্যকারের অর্থ কি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভিন্নভাবে বলেছেন: "ব্রহ্ম কি যে, তা মুখে বলা যায় না, তিনি যে ব্যক্তি, তাও বলবার যো নাই।" বাক্য বা বুদ্ধি দিয়ে বোঝার অর্থ দ্বৈতজ্ঞান। দ্বৈতজ্ঞান আমি-তুমি বা জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়ের রাজত্ব এবং তার অর্থ—তখন অজ্ঞানের ক্ষেত্র, মায়ার রাজত্ব। সুতরাং বাক্য ও মন সেই অবর্ণনীয় ও অনির্বচনীয় ব্রহ্মানুভূতির ব্যাখ্যা করতে পারে না, কেবল সাধক সে অবস্থা ও সে তত্ত্ব নিজে অনুভব করেন। নারদ শাণ্ডিল্যসূত্রে এ অবস্থার উল্লেখ ক'রে বলেছেন—'মূকাস্বাদনবৎ', অর্থাৎ মূক বা বোবা লোক যেমন কোন খাদ্যদ্রব্য খেয়ে তার স্বাদ কি রকম তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে না, মিষ্টির মিষ্টত্ব কী তা নিজেই বোঝে, কিন্তু অপরকে তা বোঝাতে পারে না, তেমনি বাক্য-মনের অতীত ব্রহ্মবস্তুর অনুভূতি যাঁর হয়েছে তিনিই ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ কি তা নিজে বোঝেন, কিন্তু অপরকে বোঝাতে পারেন না। তবে তিনি বাক্য ও মন বা বিচার দিয়ে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করতে পারেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরও ঠিক এ অবস্থা হয়েছিল—যখন ভক্তগণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি ব্রহ্মানুভূতির স্বরূপ বলতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেন নি।[২] তিনি বলেছিলেন, যখন আজ্ঞাচক্রের উপর সহস্রারে মন উঠে সমাধি হয় তখন আর জগতের দিকে হুঁস থাকে না, তখন সব-কিছু ব্রহ্মে লীন হয়, মুখে আর কিছু বলা যায় না।

১। অদ্বৈতবেদান্তে ঈশ্বরের কল্পনা একটু ভিন্ন। তিনি তুরীয় বিশুদ্ধব্রহ্ম থেকে একটু পৃথক তা'তে কারণরূপী অজ্ঞান বা মায়া থাকার জন্য।

২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন বেদান্ত বা জ্ঞানের প্রসঙ্গ করেছেন তখনই তিনি বলেছেন: "জ্ঞানীরা ঐরূপ বলে—যেমন বেদান্তবাদীরা"। কিন্তু তার মানে এনয় যে, তিনি পুরোপুরি বেদান্ত অর্থাৎ শাঙ্করবেদান্তের মতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি আচার্য শঙ্করের মতোই অদ্বৈতবাদী ছিলেন, কিন্তু তাঁর অদ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতদৃষ্টি আচার্য শঙ্কর থেকে একটু ভিন্ন ছিল। এ আলোচনা অন্যত্র করেছি। এখানে এটুকুমাত্র বলা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব জ্ঞানী, ভক্ত, যোগী ও কর্মী, অথবা জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ও কর্মযোগ সকল পথ বা সাধনমার্গকে সমান সমাদর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সকল পথ ও মত বা ধর্মমতই সত্য—'যত মত তত পথ', সকল সাধনপথে ও সকল ধর্মমতে মন-মুখ এক ক'রে অগ্রসর হলে এক সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরকে দর্শন ও অনুভব করা যায়। তিনি সেজন্য বলেছেন: "জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে, আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান বলে।" যেমন, একই ব্রাহ্মণ পূজারী, আবার রাঁধুনি; একই অভিনেতা রাজা, আবার দূত বা ভৃত্য; একই জল বারি, এ্যাকোয়া, আবার ওয়াটার। মোটকথা একই ঈশ্বর নানা নামে ও নানা রূপে জ্ঞানীর কাছে, ভক্তের কাছে, যোগীর ও কর্মীর কাছে প্রকাশিত হন। আসলে বস্তু ও তত্ত্ব এক, কেবল নানাভাবে তাদের ব্যাখ্যা ও অনুভূতি হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই সর্বানুভূতির বাণী বেদ, উপনিষৎ ও শ্রীমদ্ভাগবতেরই প্রতিধ্বনি। তারপর জ্ঞানী, ভক্ত ও যোগী আসলে কারা—তিনি তার ব্যাখ্যা করেছেন, উদাহরণ দিয়েছেন (শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ৫০) এবং পরিশেষে সিদ্ধান্তে বলেছেন: "কিন্তু একই বস্তু, নামভেদ মাত্র। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর আত্মা, ভক্তের ভগবান" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ৫১)। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কথামৃতের তৃতীয় পরিচ্ছেদে (১ম ভাগ, পৃঃ ৪৯) স্পষ্ট ক'রে সকল ধর্মের ও সকল যোগের সমন্বয়সাধনের কথা বলেছেন: "জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের সমন্বয়" (এখানে শ্রীশ্রীকথামৃতে গীতার 'যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে' প্রভৃতি ৫।৫ বাণীর উল্লেখ আছে)। তিনি বলেছেন: "বালিশ ও তার খোলটা—দেহী ও দেহ।" দেহে যিনি চৈতন্যরূপে থাকেন, দেহকে যিনি সচঞ্চল করেন, তিনিই দেহী, শরীরী বা আত্মা। এই আত্মা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নানা রূপে ও নানা

নামে প্রকাশিত থাকলেও তাঁর স্বরূপ এক, অদ্বিতীয় ও অভিন্ন। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্যই সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ, বিশ্বগত-বিশ্বাতীত, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও জীব-জগৎ ছাড়া আরও কত-কিছু রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। বস্তু এক, বিকাশে নানা। কিন্তু এ ভিন্নতার জন্য ব্রহ্মে কোন বিভেদের বিকাশ হয় না। এটিই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈত-ব্রহ্মের রূপ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

॥ গৃহস্থাশ্রমে ঈশ্বরলাভ ॥

[গৃহস্থাশ্রমে ঈশ্বর-লাভ—উপায়]

"শ্রীরামকৃষ্ণ : গান শুনলে ? 'কালীনামে দাওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না'। ঈশ্বরের শরণাগত হও—সব পাবে। 'সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া! তাঁর কাছেতে যম ঘেঁষে না'। শক্ত বেড়া! তাঁকে যদি লাভ করতে পারো, **সংসার অসার বলে বোধ হবে না**। যে তাঁকে জেনেছে, সে দেখে যে, জীব-জগৎ সব তিনিই হয়েছেন। ছেলেদের খাওয়াবে, যেন গোপালকে খাওয়াচ্ছো। পিতা-মাতাকে ঈশ্বর-ঈশ্বরী বলে দেখবে ও সেবা করবে। তাঁকে জেনে সংসার করলে বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ঐহিক সম্বন্ধ থাকে না। দু'জনেই ভক্ত, কেবল ঈশ্বরের কথা কয়, ঈশ্বরের প্রসঙ্গ লয়ে থাকে। ভক্তের সেবা করে। সর্বভূতে তিনি আছেন, তাঁর সেবা দু'জনে করে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ (১৩৬৬), পৃঃ ১৪১

গৃহস্থাশ্রমে থেকে—কামনা-বাসনা ও কর্মের মধ্যে থেকে গৃহবাসী পুরুষ কিভাবে ঈশ্বর লাভ করে সে প্রসঙ্গের আলোচনা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। উপনিষদে ও বেদান্তে বলা হয়েছে : 'ত্যাগেনৈক অমৃতত্বমানশুঃ',—অমৃতত্ব বা ব্রহ্মানুভূতি লাভ করতে হলে সংসারাশ্রমের পারে যেতে হয়, ত্যাগ অর্থাৎ বাসনাত্যাগই একমাত্র মন ও অন্তঃকরণকে নির্মল করে, চিত্তকে শুদ্ধ ও শান্ত করে, তখন নির্মল অন্তঃকরণে বা চিত্তে ব্রহ্মচৈতন্য প্রতিফলিত হন ও তখনই ব্রহ্মানুভূতি লাভ হয়। ব্রহ্মানুভূতি ও ঈশ্বরলাভ এক কথা,

যদিও অদ্বৈতবেদান্তের ক্ষুরধার তর্ক বা বিচারের চক্ষে ব্রহ্মের (মায়াবিরহী তুরীয়-ব্রহ্মের) সঙ্গে মায়াধীশ ঈশ্বরের কিছুটা ভেদ আছে।

প্রাচীন কালে ও বিশেষ ক'রে বৈদিক যুগে মানুষের সমগ্র জীবনচর্যায় বেশ কয়েকটি বিভাগ ছিল: ছাত্র ও ব্রহ্মচর্য জীবন, সংসার জীবন, বাণপ্রস্থাশ্রম জীবন ও সন্ন্যাস জীবন। গুরুর নিকট সুকুমার বয়সেই ছাত্রেরা সমিৎপাণি হয়ে যেত শিক্ষালাভের জন্য ও গুরুগৃহে সংযত ব্রহ্মচারী-জীবন অতিবাহিত করতো। ইচ্ছা করলে সংসারে অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে ফিরে গিয়ে আবার বিবাহ করতো ও গৃহস্থজীবন যাপন করতো; অথবা অনেকে ব্রহ্মচারীর মতো গুরুগৃহে থেকেই ঈশ্বরের আরাধনা করতো ও অধ্যাত্মজীবন যাপন ক'রে পরমশান্তি লাভ করতো। যারা বিবাহ ক'রে সংসারী হোত, তারা পঞ্চাশ বৎসর পরে বাণপ্রস্থী হয়ে গ্রাম বা শহরের বহুদূরে নিভৃত স্থানে অরণ্যে বাস করতো ধারণা ও ধ্যানের সাধনায় সমাধিতে স্বরূপানুভূতি লাভ করার জন্য। বাণপ্রস্থাশ্রম ছিল প্রস্তুতিপর্বের জীবন (life of preparation) —যে জীবন সকল-কিছু ভোগ-বাসনার উর্ধ্বে থেকে ত্যাগ বা সন্ন্যাসজীবন লাভের জন্য প্রস্তুত হোত এবং বাণপ্রস্থাশ্রমে জ্ঞানবিচারাদি অভ্যাস ক'রে পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করতো। এ সন্ন্যাসাশ্রমই ত্যাগের বা বাসনাত্যাগের পথ। এ আশ্রমে সাধক বিরজানুষ্ঠান ক'রে সকল ভোগবাসনার উর্ধ্বে অবস্থান করতো ও পরিশেষে বিচারের পথে তত্ত্বজ্ঞান লাভ ক'রে জীবনকে কৃতকৃতার্থ করতো।

এখন অবশ্য সে চতুরাশ্রম নাই। তবে ভোগ-বাসনার মধ্যে থেকে, বা ভোগ-বাসনার অতীত হ'য়ে ব্রহ্মানুভূতি লাভ ক'রে জীবনকে কৃতার্থ করার আকুলতা এখনও আছে। এখনও মানুষ ভোগের মধ্যে থেকে ঈশ্বরের উপাসনা করে, ত্যাগের পথকে বেছে নিয়ে সাধন-ভজন করে ঈশ্বরলাভের বাসনা হৃদয়ে পোষণ ক'রে। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়—ত্যাগ ও ভোগের লীলাচঞ্চল খেলার আর অন্ত ন'ই। বহু মানুষই ভোগের মধ্যে থেকে ঈশ্বরকে ডাকে, আবার ঈশ্বরকে ভুলে আসক্তির সংসারে ডুবেও থাকে। অনেকে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ ক'রে সমগ্র জীবন 'আত্মমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' ব্রত নিয়ে সাধনায় ও কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভোগ ও ত্যাগ এ উভয় জীবনে ঈশ্বরলাভকেই জীবনের সার বলেছেন। তাই ত্যাগের তুলনায়

ভোগকে, সন্ন্যাসাশ্রমের তুলনায় গৃহস্থাশ্রমকে, বনবাসীর তুলনায় গৃহবাসীর জীবনকে তুচ্ছ বলেন নি, বরং শান্তিপূর্ণ উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে উভয় আশ্রম বা পথকে তিনি সমান জ্ঞান করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, গৃহবাসীও ভগবানকে পাবে, আবার বনবাসী তথা ত্যাগী সন্ন্যাসীরাও ভগবানকে পাবে। তবে পাবার উপায় অন্তরের একান্ত আকুলতা, মন ও মুখের সমতা ও সর্বোপরি সকল সময়ে ঈশ্বরদৃষ্টিকে সজাগ রাখা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ছিল ঐ উদার আদর্শের জলন্ত উদাহরণ। বিবাহিত ছিল তাঁর জীবন। ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরীর নিকট তিনি তন্ত্রমতে সাধনা করেছিলেন। আবার তোতাপুরীর নিকট অদ্বৈতবেদান্তমতেও অদ্বৈততত্ত্বের সাধনা করেছিলেন। সুতরাং লোকত তাঁর জীবন ছিল আদর্শ সংসারী ও আদর্শ সন্ন্যাসী জীবনের মিলনক্ষেত্র। তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন গৃহী বা সংসারী যাঁরা তাঁদের গৃহস্থজীবনের যথার্থ আদর্শ শিক্ষা দিবার জন্য, আবার তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছিলেন ত্যাগমার্গী সন্ন্যাসীদের ত্যাগ ও সন্ন্যাসের পরম-আদর্শ শিক্ষা দিবার জন্য। তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু পত্নী শ্রীসারদাদেবী ছিলেন তাঁর দৃষ্টিতে সাক্ষাৎ শক্তি-স্বরূপিণী ও আদ্যাশক্তি। তিনি পত্নীকে পূজা করেছিলেন সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তি জগজ্জননীরূপে এবং বিশ্বের সমগ্র নারীজাতিকে দেখেছিলেন শ্রীশ্রীমাকে মহামায়ার জলন্ত প্রতিচ্ছবি বোলে। তাই কী সংসারাশ্রম ও কী সন্ন্যাসাশ্রম উভয় আশ্রমই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট ছিল ঈশ্বরলাভের সমান্তরাল পথ। তাই যার যেমন ইচ্ছা, রুচি ও নির্বাচন, তিনি তেমনই ভাবে ও তেমনই পথে সকলকে এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর লাভ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব ছিলেন সর্বভাবগ্রাহী, সর্বভাবসহিষ্ণু ও অসাম্প্রদায়িক। সংকীর্ণতার বহু উর্ধ্বে তিনি ছিলেন বিধৃত, তাই গৃহস্থাশ্রমেও যে ঈশ্বর লাভ করা যায়, তার উপায়ের কথা তিনি বলেছেন অসীম করুণা ও একান্ত সহানুভূতির ভাব ও দৃষ্টি নিয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন একটি গানের কথা ও সে গানটি হোল—'কালীনামে দাও রে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না'। উদাহরণটির সাধারণ ও লৌকিক অর্থ—শাকসবজীর ফসল করলে তার চারিদিকে বেড়া দিতে হয় সেই ফসলকে গরু-বাছুর প্রভৃতির অত্যাচার থেকে বাঁচাবার জন্য। সংসারও

একটি ফসলবিশেষ। সংসারে দায়িত্ব, কর্ম এবং কর্তব্য প্রচুর। স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজন, দেশ-দশ এ সকলের সঙ্গে ব্যবহার ছাড়াও ভালবাসা, প্রীতি, সেবা, স্নেহের দান ও প্রতিদানের কর্তব্য সংসারে অনেক বেশী। তাছাড়া সম্পদ-বিপদ, ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ এ সকল দ্বন্দ্বখেলার অভিনয় তো আছেই। তাই কর্তব্য ও দায়িত্বপূর্ণ সংসারে বাস করতে গেলে বিশ্বসংসারের যিনি প্রাণকেন্দ্র ও সচল উৎস সেই ঈশ্বর বা ভগবানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে এভাবে যে, 'সংসারে সংসারী সেজে থাকলেও আমার ক্ষুদ্র অহং-এর জন্য আমি যেন ভুলে না যাই যে, ঈশ্বরই জীবনের একমাত্র সহায় ও সম্বল। এভাব সর্বদা স্মরণে রাখলেই সকল কর্মে ও সকল কর্তব্যে আর অহং-বুদ্ধি আসে না, সংসারে কাজ করলেও তার ফলে আর আসক্তি আসে না। ফলপ্রাপ্তি-রূপ সকাম-কর্মের চেয়ে ফলের আশাহীন নিষ্কাম-কর্ম করা কঠিন। তবে ঈশ্বরে শরণাগতি থাকলে সকল মমত্ব, সকল আমিত্ব ও অহংভাব আমাদের আর অভিভূত করতে পারে না, তখন 'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি' এই শরণাগতির ভাবে সাধক অর্জুনের মতো ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম ও কর্তব্য সাধন ক'রে ঈশ্বরলাভের পথ ও উপায়কে সুগম ও সচ্ছল করতে সক্ষম হন।

ঈশ্বর বিচিত্র নামে ও রূপে প্রকাশিত। কখনো পুরুষ কখনো প্রকৃতি; কখনও সত্তাময়ী, কখনও শূন্যরূপা; কখনও মাতা, কখনও পিতা; আবার কখনও শিব ও কখনও শক্তি; কখনও নিত্য আবার কখনও লীলা-রূপে প্রকাশিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাধক রামপ্রসাদের একটি শ্যামাসঙ্গীতের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—'কালীনামে দাও রে বেড়া'। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে মহামায়া কালী ও মায়াতীত ব্রহ্ম—শক্তি ও শিব এক ও অভিন্ন। তাই তিনি কালীনামকে ঈশ্বরেরই নাম বলেছেন। বলেছেন, ব্রহ্মময়ী কালীকে জীবনে সহায়-সম্বল করলে, কিংবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারণরূপিণী কালীর চরণে মন-প্রাণ অর্পণ করলে তিনি সন্তানের সকল ভার গ্রহণ করেন, সন্তানের সকল অহমিকা দূর ক'রে চিত্তকে নির্মল ও ঈশ্বরলাভের পথকে সচ্ছল করেন। ঈশ্বরকে বা ব্রহ্মময়ী কালীকে রক্ষাকবচরূপে গ্রহণ করলে সংসারের সকল ঝঞ্ঝা ও সকল বিপদ থেকে তিনি সন্তানকে রক্ষা ও উদ্ধার করেন। তখন সংসারের কর্মে ও কর্তব্যে আর ত্রুটি বা তচ্ছরূপ (প্রত্যবায়) হয় না। তার জন্য

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : 'ঈশ্বরের শরণাগত হও—সব পাবে', কেননা 'সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁষে না'। 'সব পাবে' অর্থে ভোগও পাবে, আবার ত্যাগও পাবে ; সংসারে সুখ-শান্তি পাবে, আবার মুক্তির শাশ্বত শান্তিও লাভ করবে। 'যাঁহা রাম তাঁহা নাহি কাম', অর্থাৎ ভোগ যেখানে সেখানে মুক্তির প্রসঙ্গ নিষ্ফল—একথা আমরা জানি, কিন্তু কল্পতরুরূপ কালী ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারি ফলও ভক্তকে দান করেন। 'কালী নামে দাও রে বেড়া' বা 'মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া' প্রভৃতি সম্পূর্ণ গানটি হোল—

'মন রে কৃষি কাজ জানো না।
এমন মানব-জমিন রইলো পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা ॥
কালীনামে দাও রে বেড়া
ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া,
তার কাছেতে যম যাবে (ঘেঁসে) না ॥
অদ্য কিংবা শতাব্দান্তে
বাজাপ্ত হবে জান না।
এখন, একতারে মন রে,
চুটিয়ে ফসল কেটে নে না ॥
গুরুদত্ত বীজ রোপণ ক'রে
ভক্তিবারি সেঁচে দে না।
একা যদি না পারিস মন,
রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না ॥

শ্রীরামপ্রসাদের এই গান জীবনসাধনা ও জীবনসিদ্ধির পথে প্রেরণা সৃষ্টি করে। আমাদের মানবজীবনই কৃষিক্ষেত্র, আবার কৃষিকর্মও। জীবনের কৃষিক্ষেত্রে কৃষিকর্ম ভালভাবে করলে অর্থাৎ আবাদ করলে জীবনসিদ্ধিরূপ মহামুক্তি ও শাশ্বত শান্তি লাভ করা যায়। কিন্তু বেশীর ভাগ লোক তা বোঝে না। দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করেও মানুষ হেলায় এ জীবনকে নষ্ট করে, সাধন-ভজনরূপ বারি সিঞ্চন ক'রে এই জীবনজমির মাটিকে সিক্ত ও সরস

করে না, ফলে কঠিন হয় মাটি এবং বীজ রোপণ করলেও সে বীজে আর অঙ্কুরোদ্গম হয় না, ভ্রষ্টবীজের মতো জীবন তখন নষ্ট হয়ে যায়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর পূর্বসূরী সাধক রামপ্রসাদের মতো জীবনজমিকে আবাদ করতে বলেছেন, আর আবাদ করার পিছনে মর্মকথার আভাস দিয়েছেন ঈশ্বরের প্রতি শরণাগতির ভাবকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে : 'ঈশ্বরের শরণাগত হও, সব পাবে।' 'সব পাবে' বলতে দু রকম অর্থ হয় : (১) সংসারে সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পাবে, আবার পারমার্থিক সুখ-শান্তি পাবে। তাছাড়া (২) 'সব' অর্থাৎ পরম ও চরম-শান্তিরূপ আত্মজ্ঞানও লাভ হবে। উপনিষদ্ বলেছে : 'একস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব বিজ্ঞতঃ ভবতি'।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : 'তাঁকে যদি লাভ করতে পারো, সংসার অসার বলে বোধ হবে না'। অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত ভিন্ন। অদ্বৈতবেদান্ত বলে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হোলে সংসার তখন অসার ও মিথ্যা বলে মনে হয়। তখন মনে হয়, ব্রহ্মই একবার সার ও সত্য, আর সব অসার ও অসত্য (অজ্ঞানে)। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্ম ও দর্শন আচার্য শঙ্কর থেকে এখানেই ভিন্ন। শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব বলেছেন, এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ ও চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন, আবার সে একই সকলের মধ্যে অনুস্যূত। তিনি এক, আবার বহু বা বৈচিত্র্য। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই বৈচিত্র্য বা বিশ্ব। যেমন জল ও তার তরঙ্গ। নাম ও রূপ নিয়েই এক থেকে বহু পৃথক। কিন্তু তরঙ্গ জলেরই তরঙ্গ, জল ছাড়া অন্য-কিছু না। সুতরাং 'তাঁকে লাভ হলে' অর্থাৎ সর্বব্যাপক ব্রহ্মচৈতন্যের উপলব্ধি হলে তখন মনে হয় 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,'—এ ব্রহ্মচৈতন্যই সব-কিছু হয়েছেন, বহু বা বৈচিত্র্য ব্রহ্মসত্তা ছাড়া অন্যকিছু নয়। সুতরাং তাঁকে বা ঈশ্বরকে লাভ করলে মনে হবে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই সব হয়ে আছেন, সুতরাং কোন-কিছুই অসার ও অসত্য নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : 'যে তাঁকে (ঈশ্বরকে) জেনেছে, সে দেখে এই জীব-জগৎ সব তিনিই হয়েছেন'। তখন 'ছেলেদের খাওয়াবে, যেন গোপালকে খাওয়াচ্ছ মনে হবে', কেননা সকল প্রাণীতে ও সকল বস্তুতে তখন গোপাল-ব্রহ্মেরই স্ফূরণ বা প্রকাশ দেখা যায়। 'যাঁহা যাঁহা নেত্র ফেরে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে'—এটি বাঙলার ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের দিব্য-অনুভূতি। শুধু শ্রীচৈতন্যদেবের কেন, ব্রহ্মানুভূতির অমোঘ আশীর্বাদ যাঁরা লাভ করেছেন জীবনে, তাঁরা

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ও সকল জিনিসে নিত্য এক ঈশ্বর বা ব্রহ্মেরই বিকাশ ও সত্তা অনুভব করেন। ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে পিতামাতা জীবন্ত ঈশ্বর-ঈশ্বরী এবং সেভাবেই তিনি পিতামাতার সেবা করেন। পিতামাতার সেবা তখন প্রাণবান নারায়ণের সেবায় পরিণত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই সাক্ষাৎ ঈশ্বর-ঈশ্বরীজ্ঞানে পিতামাতার সেবা করতে সকলকে উপদেশ দিয়েছেন।

ব্রহ্মজ্ঞান হলে ব্রহ্মদৃষ্টি হয়। তখন সংসার আর অনিত্য বা মিথ্যা বলে মনে হয় না। তখন মনে হয়, ঈশ্বরেরই লীলাভূমি—বিকাশভূমি এই বিশ্ব-সংসার। ব্রহ্মজ্ঞান মানুষের জীবদ্দশাতেই লাভ হয়। যাঁরা জীবদ্দশায় জ্ঞান লাভ করেন তাঁদের 'জীবন্মুক্ত' বলে। জীবনকালে অর্থাৎ রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে বেঁচে থাকার সময়েই মুক্তি কিনা ব্রহ্মজ্ঞানের অনুভূতি হয়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: 'তাঁকে (ব্রহ্মকে বা ঈশ্বরকে) জেনে সংসার করলে বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ঐহিক সম্বন্ধ থাকে না। দু'জনেই তখন ভক্ত। তখন তারা কেবল ঈশ্বরের কথা কয়, ঈশ্বরের প্রসঙ্গ লয়ে থাকে। ভক্তের সেবা করে। সর্বভূতে তিনি আছেন, তাঁর সেবা দু'জনে করে।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই কথা—'হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙলে হাতে আটা লাগে না'। সে'রকম ঈশ্বরকে লাভ ক'রে সংসার করলে সংসারের মায়া-মোহ আর সংসারীকে স্পর্শ করে না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজের জীবনে ঈশ্বরকে লাভ ক'রে যেমন বিশ্বের সকল মানুষের কাছে এক দিব্য-আদর্শ রেখে গেছেন, তেমনি সকল মানুষকেই ঈশ্বর লাভ করার জন্য তিনি উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ঈশ্বর অন্তর্যামী-রূপে সকল প্রাণীর ও সকল জিনিসের মধ্যেই আছেন। তিনি চৈতন্য-রূপে, মন-রূপে, ইন্দ্রিয়াদি সকল কিছু-রূপে রয়েছেন, আর তাঁর সত্তায়ই সকল প্রাণী ও সকল পদার্থ সত্তাবান ও সচেতন। এ তত্ত্ব ও দৃষ্টিই সত্য। এ সত্যকে উপলব্ধি করলে কোন প্রাণী ও কোন পদার্থকেই নিজেদের থেকে আর ভিন্ন বলে প্রতীত হয় না, তখন সকলেই প্রাণের প্রাণ ও আপনজন বলে মনে হয়। ঈশ্বরলাভের বা ব্রহ্মানুভূতির পর প্রাণে প্রাণে এ তত্ত্ব উপলব্ধি হয়। এ অনুভূতিকে শাস্ত্র 'ঈশ্বর লাভ' বা ব্রহ্মানুভূতি বলেছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

।। শক্তির খেলা ।।

"শ্রীরামকৃষ্ণ। বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে, স্থিতি, প্রলয়, জীব-জগৎ এসব শক্তির খেলা। বিচার করতে গেলে এ সব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু। শক্তিও স্বপ্নবৎ অবস্তু।

কিন্তু হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হলে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। 'আমি ধ্যান করছি', 'আমি চিন্তা করছি'—এসব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্যের মধ্যে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ (১৩৬৬), পৃঃ ৫১

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখনই অদ্বৈতবেদান্তের প্রসঙ্গ তুলতেন তখনই বলতেন : 'বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা' বা 'অদ্বৈতবেদান্ত বলে' প্রভৃতি। অদ্বৈতবেদান্ত বলতে সাধারণত বুঝি আচার্য শঙ্কর ও শঙ্করানুসারীরা যে ব্রহ্মবাদের কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে বলি, অনেকে আচার্য শঙ্করকে মায়াবাদী বলেন এবং অদ্বৈতবেদান্ত মায়াবাদ প্রতিপন্ন করে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত ও মতবাদ সম্পূর্ণ ভুল। আচার্য শঙ্কর বেদান্তদর্শনের ও উপনিষদের ভাষ্যে ও তাঁর অন্যান্য রচনায় কোথাও মায়াবাদ প্রতিপন্ন করেন নি, করেছেন 'ব্রহ্মবাদ'। ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের বহুস্থানে তিনি 'বয়ং তু ব্রহ্মবাদিনঃ'—'আমরা ব্রহ্মবাদী' এবং ব্রহ্ম-বাদ প্রতিপন্ন করারই পক্ষপাতী একথা বলেছেন। সিদ্ধান্তরূপে মায়াকে প্রতিপন্ন বা প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টাকে মায়াবাদ বলে। কিন্তু আচার্য শঙ্কর কোনদিনই মায়াকে প্রতিষ্ঠা করেন নি, মায়াকে ও মায়াবাদকে তিনি বরং খণ্ডনই করেছেন। তাঁর অধ্যাসভাষ্য এ সম্বন্ধে একটি অপূর্ব ও অভিনব

অবদান। অধ্যাসভাষ্যে, অন্যান্য ভাষ্যে ও রচনায় আচার্য শঙ্কর এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুই প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান বা অধ্যাসকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছেন। তিনি নিজেকে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের কোথাও কোথাও 'বয়ং তু ব্রহ্মবাদিনঃ' বলে পরিচয়ও দিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্বের রূপ আচার্য শঙ্কর থেকে কিছুটা পৃথক ও অভিনব, অথচ সিদ্ধান্তের দিক থেকে উভয়েই এক সেকথা বলেছি। মোটকথা আচার্য শঙ্কর ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব দু'জনেই এক ও অদ্বৈত ব্রহ্মসত্তাকেই সমর্থন ও প্রতিষ্ঠা করেছেন। দু'জনের মধ্যে পার্থক্য হোল: আচার্য শঙ্কর যেখানে সাকার, সগুণ প্রভৃতি গুণ ও বিকারকে মিথ্যা অসত্য বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেখানে সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ এ রূপ বা বিকাশভেদকে এক সত্য ও শাশ্বত ব্রহ্মের অভিন্ন বিকাশ বা রূপ বলেছেন।

আচার্য শঙ্করের প্রতিপাদিত অদ্বৈতবাদের মূলকথা—ব্রহ্ম সত্য ও জগন্মিথ্যা। ব্রহ্মের অবিকার চৈতন্যসত্তাই একমাত্র সত্য ও নিত্য এবং ব্রহ্মভিন্ন সকল পদার্থ অসত্য ও অনিত্য। অসত্য কিনা পরিণামী ও বিকারী। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈততত্ত্ব প্রমাণ করে যে, ব্রহ্মসত্তাভিন্ন অন্য কোন বস্তুর সত্তা নাই, সুতরাং মায়াও তিনি, বিকার বা ভিন্ন রূপও তিনি। আসলে এক ও অদ্বৈত ব্রহ্মচৈতন্যই বিষ্ণুর মতো ব্যাপনশীল ও ঈশ্বরের মতো সর্বব্যাপী—'ঈশা ব্যাস্যমিদং সর্বম্'। এটিই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্বৈততত্ত্বের অভিনবত্ব বা নূতনত্ব। এভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অদ্বৈতবাদের একটি নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

আচার্য গৌড়পাদ, গোবিন্দপাদ, শঙ্কর ও শঙ্করমতানুসারী আচার্যগণ ছাড়াও তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলকগণ, শৈবভাষ্যকার শ্রীকণ্ঠ ও দক্ষিণদেশীয় শৈব ও বীরশৈবমতের অনুসারীরাও অদ্বৈতবেদান্তবাদী নামে পরিচিত—যদিও তাঁদের বিচার-বিশ্লেষণশৈলী ও অদ্বৈতবস্তুসত্তার ধারণা কিছু কিছু পৃথক ও তার জন্য তাঁদের বলা হয় কেবলাদ্বৈতবাদী বা শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বা শাক্তাদ্বৈতবাদী, শিবাদ্বৈতবাদী প্রভৃতি। রসবস্তুর যাঁরা অনুশীলক ও একরস ব্রহ্মের উপাসক তাঁদের বলা হয় রসাদ্বৈতবাদী। এ সকল অদ্বৈতবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অদ্বিতীয় বস্তুর প্রতিপাদন করা—তা সে শক্তি বা

গুণবিরোহী হোক আর শক্তিগুণবিশিষ্টই হোক। এ সকল অদ্বৈতবাদীদের কারো কারো মতে, একমাত্র অপরিণামী কূটস্থ ব্রহ্মই সত্য, আর সকল বস্তু অসত্য ও পরিণামশীল। আবার কারো মতে, চিদ্‌রূপ অদ্বিতীয় শিবব্রহ্মের সঙ্গে চিতিরূপিণী শক্তির অবিনাভাবসম্বন্ধ, সুতরাং শিব ও শক্তির যুক্ত বা দ্বন্দ্ব রূপ এক ও অভিন্ন। আবার কারো মতে, শিব-ভট্টারক ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, বিশ্বপ্রপঞ্চ তাঁর লীলা ও বিলাস। মায়া ও বিশ্বপ্রপঞ্চের সত্যাসত্যনির্ণয় নিয়ে এঁদের মধ্যে মতভেদ আছে, কেননা কারো মতে, মায়ার কার্য বিশ্বপ্রপঞ্চ পরিবর্তনশীল বলে মিথ্যা বা অনিত্য, আবার কারো মতে, নিত্য অবিকারী বিশুদ্ধ শিবের অভিন্ন বিকাশ বলে মায়া, শক্তি বা বিশ্বপ্রপঞ্চ নিত্য ও সত্য। তাঁরা বলেন, নিত্য (Absolute) সত্য, সুতরাং নিত্যের লীলাও সত্য। পরিণামী ও অপরিণামীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণরীতির জন্য অদ্বৈতবাদীদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি শুদ্ধাদ্বৈতবাদীরা আবার রসবস্তুর নিত্যতা স্বীকার ক'রে 'ব্রহ্মস্বাদসহোদর' রসবস্তুকে অদ্বৈত বলেছেন এবং সেদিক থেকে তাঁরা রসাদ্বৈতবাদের সমর্থক ও পরিপোষক। এই রসাদ্বৈতবাদ-সম্বন্ধে রসবিচারিগণ বলেন, ভেদসম্বন্ধরহিত নির্বিকল্প রস বা রসস্বরূপ পরমানন্দ এক ও অদ্বিতীয়। মধুসূদন সরস্বতী 'ভক্তিরসায়ন'-গ্রন্থে বলেছেন,

নিত্যং সুখমভিব্যক্তং 'রসো বৈ সঃ' ইতি শ্রুতেঃ।
প্রতীতিঃ স্বপ্রকাশস্য নির্বিকল্পসুখাত্মিকা ॥ ১৩৮।২২

টীকাকার বলেছেন: "তত্তু নিরস্তসমস্তভেদসম্বন্ধতয়া ন কাঞ্চিৎ কথঞ্চিৎ বিকল্পকল্পনামবগাহতে, অতএব ব্রহ্মস্বাদসহোদরমিত্যাচক্ষতে সুধিয়ঃ।" যা নিত্য এবং উৎপত্তি ও বিনাশহীন সুখ তা রসস্বরূপ—এক ও অদ্বিতীয়, তা সর্বপ্রকার ভেদসম্বন্ধহীন বিশুদ্ধপ্রতীতি বা উপলব্ধিমাত্র। এ জন্য অদ্বৈতবাদীদের মতো রসবাদীরা নির্বিকল্পরসপ্রতীতি বা রসাস্বাদনকে ব্রহ্মস্বাদের মতো বলেন। মধুসূদন সরস্বতী ১৪০।২৪ শ্লোকে এই রসকে 'পরমানন্দ আত্মৈব রসঃ' বলেছেন। এটিই রসাদ্বৈতবাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। তাছাড়া আছে শব্দাদ্বৈতবাদ। শব্দাদ্বৈতবাদীরা প্রতিষ্ঠা করেছেন শব্দব্রহ্মতত্ত্ব। পতঞ্জলি, ভর্তৃহরি প্রভৃতি এঁরা শব্দব্রহ্মাদ্বৈতবাদী।

গৌড়পাদ, শঙ্কর ও শঙ্করানুবর্তীদের মতে, মায়া মিথ্যা, সুতরাং মায়ার

কার্য বা পরিণামও মিথ্যা ও অনিত্য। মায়ার বিকার আছে বলে মায়ার পারমার্থিকসত্তা (অপরিণামী সত্তা) নাই, কিন্তু তাই বলে মায়ার ব্যবহারিক-সত্তা আছে ততদিন—যতদিন না ব্রহ্মের পারমার্থিকসত্তা উপলব্ধি হয়। তাঁরা বলেন, পরমেশশক্তি মায়ার জন্যই সৃস্টি-স্থিতি-প্রলয় কার্য ও মায়ার জন্যই বিশ্বপ্রপঞ্চের আবির্ভাব ও তিরোভাব—অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি সম্ভব হয়। মায়াতেই লীলা এবং মায়াশক্তিহীন অবস্থার নাম নিত্য। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব বলেছেন, যিনি নিত্য, তিনিই লীলা। অব্যক্ত ও ব্যক্ত অবস্থাদুটি এক ও অদ্বিতীয় নিত্যবস্তুরই। সাংখ্যকার কপিল বলেছেন, পুরুষ-প্রকৃতির মিলনের (রাগের) জন্য সৃষ্টি, বিভাগের (বিরাগের) জন্য বিনাশ। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, মায়ার জন্য সৃষ্টি, কিন্তু সৃষ্টি স্বরূপে নাই। ভ্রমের জন্যই মনে করি সৃষ্টি ও স্রষ্টা, আসলে একটিমাত্র বস্তু ও সত্তা যেখানে, সেখানে দুইয়ের কল্পনা নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে—সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়, জীব-জগৎ—সব শক্তির খেলা।" একথা সত্য, কেননা অদ্বৈতবেদান্ত একটিমাত্র অবিকারী নিত্যসত্তা স্বীকার করে, আর বাকী সমস্তই তার (সত্যের) প্রতিভাস বা প্রতিচ্ছবি। দর্পণে মানুষের মুখের যে প্রতিবিম্ব, অদ্বৈতবাদীরা (বিম্ব-প্রতিবিম্ববাদী অদ্বৈতাচার্যেরা) বলেন, মুখ বা বিম্ব সত্য, আর মুখের প্রতিবিম্ব মিথ্যা ও অসত্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্বৈতদৃষ্টি থেকে হয়তো বলা যায়, প্রতিবিম্ব যখন সত্য বিম্বেরই প্রতিচ্ছবি বা প্রতিভাস, তখন তা-ই বা অসত্য হবে কেন? সেখানে বুঝতে হবে, সত্য বিম্বেরই সত্য প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছবি। দুইয়ের কল্পনা সেখানে না আনাই ভাল। অবশ্য এটি যথার্থ-অনুভবের বিষয়, বাদানুবাদের বিষয় নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব-সমর্থিত অদ্বৈত-বাদের একটি অভিনবত্ব অবশ্যই আছে—যার জন্য তাকে আচার্য শঙ্করাদি অদ্বৈতবাদীদের অদ্বৈতবাদ থেকে ভিন্ন বলেন নব্যবিচারী যাঁরা।

আবার শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "খাঁটি সোনার (অলঙ্কারের) গড়ন হয় না, তাই খাদ দিতে হয়।" মায়া বা মায়ার কল্পনাই খাদ। বিশ্বসৃষ্টির কল্পনায় ব্রহ্ম ও সৃষ্টি পরস্পরে পৃথক বলে মনে হয়। পার্থক্য বা ভেদ দ্বৈতকল্পনা—যা আবার অদ্বৈতের ধারণা এনে দেয়। দ্বৈতকল্পনাই আবার অদ্বৈতধারণার সৃষ্টি করে। যদি দ্বৈতবস্তুর সৃষ্টি কোনদিনই না হয় তবে অদ্বৈতবস্তুকে

উপলব্ধি করার প্রশ্ন কোনদিন উঠতো না, কিংবা 'নেতি নেতি' বিচারেরও কোন সার্থকতা থাকতো না। তাই অদ্বৈতের মহিমা অনুভব করার জন্য দ্বৈতের কল্পনা। তবে দ্বৈতের কল্পনা নিয়েই বেদান্তে যত গণ্ডগোল। কারো মতে দ্বৈতকল্পনা অসত্য, আবার কারো মতে তা আপাতত সত্য অদ্বৈতকে সঠিকভাবে অনুভব করার জন্য। আচার্য শঙ্কর দ্বৈত ও অদ্বৈত নিয়ে সমস্যার উদ্ভব হতে পারে বলে পরিশেষে সিদ্ধান্ত করেছেন, বিশুদ্ধ মায়াবিরহী ব্রহ্ম দ্বৈত ও অদ্বৈত-কল্পনার পারে—'দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্'। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর True Psychology-গ্রন্থে Our Relation to the Absolute-বিষয়-বস্তুর আলোচনাপ্রসঙ্গে অদ্বৈতবাদের দৃষ্টি থেকে বলেছেন: "It (Brahman) is not one or many but transcends the categories of one and many"। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্বৈতদৃষ্টির মধ্যে একটু অভিনবত্ব আছে সেকথা পূর্বে বলেছি। তিনি বলেছেন, একই তিনি (ব্রহ্ম) এক হয়েছেন, আবার বহু হয়েছেন। এক তিনি সাকার, আবার নিরাকার; সগুণ, আবার নির্গুণ। তাছাড়া তিনি (এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম) আরও কত-কিছু এবং চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। হওয়াই তাঁর নিত্য থেকে লীলায় যাওয়া। একই তিনি নিত্যে, আবার লীলায়ও। নট (অভিনয়কারী) এক ও বহুর অভিনয় করলেও অভিনয়ের মধ্যে নট একজনই। তাই বলি, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্বৈতদৃষ্টির মধ্যে একটু অভিনবত্ব আছে। তিনি সাধারণভাবে যখন অদ্বৈতবাদের কথা বলতেন, তখন বলতেন—'বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা'। 'বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা' বলতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আচার্য শঙ্কর ও শঙ্করানুবর্তীদেরই লক্ষ্য করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "বিচার করতে গেলে এ সব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু।" বিচার কিনা 'নেতি নেতি' বিচার। 'নেতি নেতি' বিচারের নিয়ম—'ইহা নয়, ইহা নয়', পরিবর্তন বা পরিণামশীল জীবজগৎ সত্য নয়, মায়া সত্য নয়, বৈচিত্র্য সত্য নয়—মিথ্যা, কেবল এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সত্য এবং এ তত্ত্ব-সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ ধারণা করা।

'নেতি নেতি' বিচারের নাম জ্ঞানবিচার—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক। জ্ঞানবিচারে যথার্থবস্তু কি তা নির্ধারিত হয়। পরিবর্তনশীল জগতের সত্যতা-সম্বন্ধে বিচার করলে দেখি মায়া অনিত্য বা অসত্য, কিন্তু ব্রহ্ম নিত্য ও

সত্য। অদ্বৈতবেদান্তে মায়া মিথ্যা, অনিত্য, কিন্তু শক্তিবিশিষ্ট অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত মতে, মায়া ঈশ্বরশক্তি, নিত্য ও সত্য। তাদের মতে, সত্তা ব্রহ্মেরই সত্য শক্তি ও বিকাশ। বিকাশ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, জীব-জগৎ ও চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এ সকল, অদ্বৈতদৃষ্টিতে স্বপ্নতুল্য মনে হয়। স্বপ্নতুল্য বলতে অনিত্য, কেননা যতক্ষণ স্বপ্ন থাকে ততক্ষণ স্বপ্ন সত্য, কিন্তু স্বপ্ন ভেঙে গিয়ে জাগরণ এলে স্বপ্ন মিথ্যা বলে মনে হয়। অদ্বৈতমতে সৃষ্টি ও লীলাকর্মও তাই। যতক্ষণ না ব্রহ্মবস্তুর যথার্থজ্ঞান হয় ততক্ষণ সৃষ্টি প্রভৃতি আপাতত সত্য বলে জ্ঞান হয়, ব্রহ্মজ্ঞান হলে এ সকল স্বপ্নের মতো অনিত্য বলে প্রতীত হয়। আচার্য শঙ্কর বলেছেন—"প্রাক্‌প্রবোধাৎ" ইত্যাদি। অজ্ঞানের ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ বা জীব-জগৎ সত্য, কিন্তু অজ্ঞান চলে গিয়ে জ্ঞানের জাগৃতি এলে দেখা যায়, ব্রহ্মচৈতন্যই সকলের মূলে এবং তাঁর সত্তার জন্য সকল-কিছু পার্থিব বস্তুর সত্তা প্রতীত হয়—এ তত্ত্ব তখনই উপলব্ধি হয়। এক ব্রহ্মই বস্তু কিনা নিত্য ও সত্য, অন্য সকল অবস্তু, অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তাতিরিক্ত সত্তা অসত্য। আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তাই বলেছেন: "সর্বব্যবহারাণামেব প্রাগ্‌ব্রহ্মাত্মতা বিজ্ঞানাৎ সত্যত্বোপপত্তেঃ। স্বপ্নব্যবহারস্যেব প্রাক্‌প্রবোধাৎ" (২।১।১৪)।

মায়ার প্রসঙ্গে শঙ্করপূর্ব ও শঙ্করোত্তর সকল আচার্য, মনীষী এবং স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতি আচার্যেরা এ সম্বন্ধে স্বপ্নের উদাহরণ দিয়েছেন। মায়ার সঙ্গে স্বপ্নের উদাহরণ দিতে গিয়ে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ প্রসঙ্গ-ক্রমে বলেছেন, মায়ার ইংরাজী শব্দ 'ইলিউসন' (illusion), কিন্তু ইলিউসনের পরিবর্তে 'ডেলিউসন' (delusion) বলা উচিত, কেননা ইলিউসনের কোন প্রাতীতিক ও ব্যবহারিক সত্তা নাই, তা আকাশকুসুমের ও বন্ধ্যাপুত্রের মতো একেবারে মিথ্যা, কিন্তু 'ডেলিউসন'-কে মায়ার ইংরাজী প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করলে মায়ার বা জগতের একটি প্রাতীতিক ও ব্যবহারিক সত্তা (অস্তিত্ব) স্বীকার করা সম্ভব হয়। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ পুনরায় বলেছেন, মায়া ও মায়ার কার্য বিশ্বপ্রপঞ্চকে স্বপ্নের সঙ্গে তুলনা করাই সমীচীন, কেননা নিদ্রার অবস্থায় স্বপ্ন যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ স্বপ্নকে সত্য বলে মনে হয়, কিন্তু নিদ্রা ভেঙে গেলে স্বপ্ন মিথ্যা বলে প্রতীত হয়। মায়া ও বিশ্বপ্রপঞ্চের সত্যতাও সে'রকম। স্বপ্নের মতো বিশ্বপ্রপঞ্চের স্থায়িত্ব তাই।

তা আপেক্ষিক সত্য, অর্থাৎ স্বপ্ন যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসকল সত্য বলে মনে হয়, আর স্বপ্ন ভাঙার পর তারা অসত্য। সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু আপেক্ষিক (কোন-কিছুর উপর নির্ভরশীল) সত্য, পারমার্থিক অর্থাৎ চিরস্থায়ী সত্য নয়। আচার্য শঙ্করের মতে, মায়ার আবেশ যখন চলে যায় ও জ্ঞানসূর্যের উদয় হয় তখন মায়াও স্বপ্নের মতো চলে যায়, সুতরাং মায়া তখন অবস্তু বলে মনে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপলব্ধি কিছুটা এর সমান হলেও তা অদ্বৈতবেদান্তে প্রচলিত উপলব্ধি থেকে একটু ভিন্ন। দেশ, কাল ও নিমিত্ত এ গুণের মধ্যে এলেই ব্রহ্মকে বলা হয় বিবর্তিত। বিবর্তিত কিনা আপন স্বরূপ পরিত্যাগ না করেও পরিবর্তিত (changed)। এ পরিবর্তনকে শঙ্কর ও শঙ্করপন্থী অদ্বৈতবেদান্তীরা বলেন অসৎ অর্থাৎ যা ঠিক নয়। এ ঠিক নয়-রূপ প্রকাশই মায়া বা অবিদ্যা। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বানুস্যূতির উপলব্ধিতে মায়াও ব্রহ্মস্বরূপ, আর বিবর্তিত বা অবিবর্তিত (changed or unchanged) রূপ শুধু দৃষ্টিভেদে বিকাশভেদ মাত্র। এ ভেদকে শঙ্কর বলেছেন অসৎ, আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন একেরই আর একটি রূপ বা ভিন্ন রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, বিশ্বের প্রতিটি বিকাশে অনুস্যূত হয়ে আছে সেই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্য, তা না হলে বৈচিত্র্যের কোন সার্থকতা থাকতো না। এক থেকে অন্য বা বহু হলেই মিথ্যা—এ সিদ্ধান্ত শঙ্করের, আর এক বহু হলেও তা একেরই বিকাশ—এ তত্ত্ব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুসুপ্তি একেরই তিন অবস্থা। এ অবস্থা-তিনটিকে শঙ্কর বলেছেন অসৎ, আর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন নিত্য একেরই তিন অবস্থা, সুতরাং একেবারে মিথ্যা নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "কিন্তু হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হলে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নেই।" কথাটি সত্য, কেননা বিচার-বিশ্লেষণ বুদ্ধির বৃত্তি। মন ও বুদ্ধি অন্তঃকরণের বৃত্তি। অন্তঃকরণ মায়া বা অজ্ঞানের পরিণতি। তাই বেদান্ত বলেছে, ব্রহ্মবস্তু মন-বুদ্ধির অগোচর—'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্'। সুতরাং 'নেতি নেতি' বিচার কর, বা আত্মা-অনাত্মার বিচার কর, বিচারের ক্ষেত্র বুদ্ধি ও অজ্ঞানের এলাকা। অজ্ঞান, মন, বুদ্ধি এ সকল শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন নাম। অদ্বৈতবেদান্তের মতে, শক্তি অনিত্য, সুতরাং অনিত্য শক্তির কার্যও অনিত্য।

'আমি ধ্যান করছি', 'আমি চিন্তা করছি'—এ সকল শক্তির এলাকার মধ্যে। 'আমি ধ্যান করছি' বলার অর্থ আমি কোন ধ্যেয় বস্তু-সম্বন্ধে চিন্তা করছি, সুতরাং ধ্যাতা, ধ্যেয় ও ধ্যান, কিংবা জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান পরস্পরে পরস্পর থেকে ভিন্ন। পৃথক ভাব বলতে অদ্বৈত বস্তু থেকে ভিন্ন। এ ভিন্নতার মধ্যে ব্যবধান, পরিবর্তন ও বিকার থাকে। আচার্য শঙ্কর বলেছেন, যার বিকার বা পরিবর্তন আছে, তাই মিথ্যা কিনা অনিত্য। সুতরাং 'আমি ধ্যান করছি' বা 'আমি চিন্তা করছি' এক্ষেত্রে অদ্বৈতভাবনা হয় না, তা দ্বৈতভাবনার ক্ষেত্র। কিন্তু এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সকল-কিছু বিকার ও পরিবর্তনের অতীত। তাই ব্রহ্মবস্তু অপরিণামী ও অবিকারী। শঙ্কর অদ্বৈতবেদান্তে ব্রহ্মকে কূটস্থ, স্থির ও অচঞ্চল বলেছেন।

শাঙ্কর বেদান্তের দৃষ্টি নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু।" ব্রহ্ম বস্তু কিনা ব্রহ্ম সত্তাবিশেষ। তিনি বস্তু না হলে কোনদিন কেউ তাঁকে উপলব্ধি করতে পারতো না। বেদান্ত বলেছে—'সন্মাত্র-গোচরত্বাৎ', 'বস্তুতন্ত্রত্বাৎ' বা 'অস্তিত্যেব উপলব্ধব্যম্'। ব্রহ্মানুভূতির পর আর বিচার থাকে না, তখন বিচার অনুভূতিতে লয় হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না উপলব্ধি হয় ততক্ষণ পর্যন্তই বিচার কিনা জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, বা ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয়—এই ত্রিপুটির ক্ষেত্র। এ তিনটির নাম ত্রিপুটি। বেদান্ত বলেছে, ত্রিপুটিভেদ না হলে, জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়ের অতীত না হলে অজ্ঞানের পারে যাওয়া যায় না; অজ্ঞানের পারে না গেলে ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় না। উপলব্ধির অপর নাম 'বোধে বোধ'। তখন কে কাকে উপলব্ধি করবে। যেখানে দুই নাই, একেরই মাত্র সত্তা, সেখানে অন্যকে জানাজানি বা দেখাদেখির প্রশ্ন থাকে না। উপনিষৎ বলেছে, তখন 'কেন কং পশ্যেৎ?' 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ?' যোগসাধনার ক্ষেত্রে নির্বিকল্পসমাধি না হলে এবং অদ্বৈত-সাধনার ক্ষেত্রে এক ও অদ্বৈত ব্রহ্মের উপলব্ধি না হলে 'জানাজানি'-এলাকার পারে যাওয়া যায় না, আর জানাজানি এলাকার পারে না গেলে যথার্থ মুক্তি লাভও হয় না। বন্ধনমুক্তিই জীবনের লক্ষ্য। তাই অজ্ঞান-বন্ধনের পারে যেতে হয় যথার্থশান্তি বা মুক্তি লাভ করতে হলে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীর সিদ্ধান্ত কি? শ্রীরামকৃষ্ণদেব যো সো ক'রে শক্তির এলাকার পারে যেতে বলেছেন। শক্তির এলাকা মায়ার

এলাকা। মায়ার এলাকাই অজ্ঞানের রাজ্য। মায়ার রাজ্যে সত্যকারের শান্তি নাই, সুখ নাই, আনন্দ নাই, অথচ মানুষ শান্তি চায়, বন্ধনমুক্তির আনন্দ চায়। মায়াবন্ধনের পারে না গেলে মুক্তির স্বাদ মিলবে ক্যামন ক'রে! অন্ধকারের পারে না গেলে আলোকের প্রকাশ ও আনন্দ পাওয়া যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মায়ার পারে যেতে বলেছেন। কিন্তু এই পারে যাবার উপায় কি? উপায়—সদসদ্‌বিচার। উপায়—'আমি জীব নই, ব্রহ্মস্বরূপ' এই চিন্তা করা, ধ্যান করা। 'আমি জীব, ব্রহ্ম নই'—এ চিন্তা করার নাম ভেদবুদ্ধি। ভেদবুদ্ধিই অজ্ঞান। তাই ভেদবুদ্ধি বা ভুলধারণার সংশোধন করতে হয় শুদ্ধবিচার দিয়ে। 'আমি জীব, ব্রহ্ম নই', 'আমার মরণশীল দেহই আত্মা' এগুলি ভুল-ধারণা। এই ভুল-ধারণা থাকতে মুক্তি নাই, শান্তি নাই। দেহের মৃত্যু আছে, কিন্তু দেহের মধ্যে যিনি যথার্থ দেহী, তিনি আত্মা; তিনিই সত্যকারের সত্তা ও স্বরূপ। এ অনুভূতির নাম যথার্থজ্ঞান।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

॥ সিদ্ধি ও সিদ্ধের সিদ্ধ ॥

"শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভাবস্থ)—মা, কারণানন্দ চাই না, সিদ্ধি খাব।

সিদ্ধি কিনা বস্তু লাভ। 'অষ্টসিদ্ধি' সিদ্ধি নয়। সে (অণিমা, লঘিমাদি) সিদ্ধির কথা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন: 'ভাই, যদি দেখ যে অষ্টসিদ্ধির একটি সিদ্ধি কারও আছে, তাহলে জেনো যে, সে ব্যক্তি আমাকে পাবে না, কেননা সিদ্ধি (সিদ্ধাই) থাকলেই অহঙ্কার থাকবে, আর অহঙ্কারের লেশমাত্র থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।'

আর এক আছে প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ ও সিদ্ধের সিদ্ধ। যে ব্যক্তি সবেমাত্র ঈশ্বরের আরধনায় প্রবৃত্ত হয়েছে, সে প্রবর্তকের থাক। প্রবর্তক ফোঁটা কাটে, তিলক মালা পরে, বাইরে খুব আচার করে।

সাধক আরও এগিয়ে গেছে। তার লোকদেখানো ভাব কমে যায়। সাধক ঈশ্বরকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়, আন্তরিক ভাবে তাঁর নাম করে, তাঁকে সরল অন্তঃকরণে প্রার্থনা করে।

সিদ্ধ কে? যাঁর নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয়েছে, যিনি ঈশ্বরকে দর্শন করেছেন।

সিদ্ধের সিদ্ধ কে? যিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছেন—শুধু দর্শন নয়। কেউ পিতৃভাবে, কেউ বাৎসল্যভাবে, কেউ সখ্যভাবে, মধুরভাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ (১৩৬৬), পৃঃ ১৮৫-১৮৬

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুধুই তন্ত্রসাধনা করেন নি, সকল রকম সাধনা করেছিলেন সিদ্ধি লাভের জন্য। তাঁর সকল রকম সাধনা করার উদ্দেশ্য ছিল—এক সত্য-বস্তুকে সকল ধর্ম ও সাধনার মধ্য দিয়ে লাভ করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করা ও সঙ্গে সঙ্গে সকল সঙ্কীর্ণভাবের পারে যাওয়া। সঙ্কীর্ণতা মনের প্রসারতা নষ্ট করে, মনকে অহংগণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ক'রে জীবনের লক্ষ্য ভ্রষ্ট করে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভের পরও অপরাপর ধর্মসাধনা করেছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন, পথ বা সাধনপদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হলেও সবার লক্ষ্যরূপ সিদ্ধি এক।

তন্ত্রসাধনায় অপরাপর উপকরণের মতো কারণও থাকে। তন্ত্রসাধকগণ তাকে পরিশুদ্ধ ক'রে অমৃতে পরিণত করেন ও পরমকারণরূপ পরব্রহ্মে বা ব্রহ্মময়ী কালীর উদ্দেশ্য তা উৎসর্গ করেন—অমৃত দান ক'রে অমৃতরূপ জীবন-সিদ্ধি লাভ করার জন্য। তন্ত্রে সাধারণত সাত রকম আচারের উল্লেখ আছে—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তচার ও কৌলাচার। কুলার্ণবতন্ত্র (২।৬-৮), সর্বোল্লাসতন্ত্রে (৯।৭-৯) ও অন্যান্য তন্ত্রে এদের বিবরণ আছে। নারায়ণীতন্ত্রে ও সর্বোল্লাসতন্ত্রে (৯।১-৪) পশ্বাচার ও বীরাচারের উল্লেখ আছে। অনেকের মতে পশ্বাচারের অন্তর্গত বীর, দিব্য ও কৌল আচার। অনেকে বাম, অঘোর, যোগ প্রভৃতি ন'রকম আচারের উল্লেখ করেন। পশ্বাচারকে গ্রহন ক'রে যাঁরা তন্ত্রসাধনা করেন তাঁরা সাধারণ প্রবর্তক সাধক। তাঁদের মধ্যে পশুভাব, বীরভাব, স্বভাব ও বিভাব এ চার রকম ভাগের উল্লেখ আছে। বীরাচারে কারণাদি উপচার বা উপকরণের সাহায্যে সাধনা হলেও আদ্যাশক্তিরূপিণী কালীরই তা আরাধনা। বামাচার একটি স্বতন্ত্র সাধনা। অনেকের মতে বীরাচারেরই অন্তর্গত বামাচার। বাম + আচার = বামাচার; 'বাম' শব্দের দু'রকম অর্থ, যেমন বাম অর্থে বিরুদ্ধ বা বিপরীত। এটি সাধারণ অর্থ। প্রকৃতপক্ষে 'বাম' অর্থে শক্তি বা কালী, সুতরাং বামাচারের অর্থ শক্তিসাধনা বা আদ্যাশক্তি কালীর আরাধনা। তন্ত্রসাধনার বাম বা বিপরীতমার্গে বিচরণ ক'রে বহু সাধকই মহামায়ার প্রসাদ ও প্রসন্নতা লাভের পরিবর্তে অষ্টসিদ্ধির অধিকারী হন, জন্মার্জিত সংস্কারের বশবর্তী হন এবং তাঁদের স্বার্থযুক্ত সাধনার জন্য বামাচার বিরুদ্ধ-আচরণে পরিণত ও কলুষিত হয়। পরশুরামকল্পসূত্র,

কৌলোপনিষৎ, শক্তিসঙ্গম, কুলার্ণব, নিত্যোৎসব প্রভৃতি তন্ত্রে বামার, শক্তির বা দেবী কালিকার উপাসনা যে পবিত্র ও কল্যাণকর সেকথার উল্লেখ আছে।[১]

তন্ত্রে বীরাচারকে বামাচারের ও দিব্যাচারকে কৌলাচারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বিকৃত বামাচারের নিন্দা করেছেন, কিন্তু তন্ত্রের দিব্যভাব ও প্রকৃত তত্ত্বের নিন্দা করেন নি, কারণ তন্ত্রদর্শন ও তন্ত্রতত্ত্ব তিনি বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। সাধারণত বীরাচার ও বামাচার ভোগমার্গীকে ত্যাগমার্গে উন্নীত করার সাধনপ্রণালী। ত্যাগমার্গীর জন্য তন্ত্রে দিব্যাচার ও কৌলাচার নির্দিষ্ট হয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্রের নির্দেশ যে, জ্ঞানপথের সাধক ও সন্ন্যাসিগণ যদি তন্ত্রাচারে মহামায়ার উপাসনা করেন তবে তাঁদের কৌলাচার গ্রহণ করা উচিত। ত্যাগী কৌলগণের জন্য নির্দিষ্ট আচারের নাম কৌলাচার। কুলর্ণবতন্ত্রে (৮।৯১-৯৫) 'কৌল' তাঁদেরই বলা হয়েছে যাঁরা পরিপূর্ণ জ্ঞান ও বিচারের অধিকারী। কৌলগণ 'অবধূত' নামে পরিচিত। পঞ্চতত্ত্বসাধনার উপকরণ মদ্য, মাংসাদি দিয়ে পূজার সময়ে কুলাচারী কৌলগণ আদ্যাশক্তি মহাকালীর শ্রীপাদপদ্ম চিন্তা ক'রে অঞ্জলি দান করেন। নারীমাত্রেই তাঁদের দৃষ্টিতে পরমাশক্তিরূপিণী জননী।[২] শ্রীরামকৃষ্ণদেব সিদ্ধসাধিকা ভৈরবী যোগেশ্বরী ব্রাহ্মণীর সাহায্য নিয়ে চৌষট্টিখানি তন্ত্রের সাধনা করেছিলেন। কৌলাচারের পূজারী হয়ে পঞ্চতত্ত্বাদি তিনি স্পর্শমাত্র করতেন, কিন্তু গ্রহণ করতেন না। কারণের নাম শোনা মাত্র তিনি সমাধিস্থ হতেন। তাই কারণানন্দ কারণ পান ক'রে আনন্দলাভের পরিবর্তে তিনি আদ্যাশক্তির শ্রীচরণচিন্তাই করতেন ব্রহ্মময়ীর বা শিব-ব্রহ্মের উপলব্ধির জন্য। ভৈরবী যোগেশ্বরীর নির্দেশে তন্ত্রসাধনায় আনন্দাসন-সাধনার সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমাধিস্থ হয়ে ব্রহ্মচৈতন্যের সঙ্গে একীভূত হয়েছিলেন। তন্ত্রসাধনা তিনি করেছিলেন ভারতবর্ষীয় সাধনার প্রতিটি সাধনাকে গ্রহণ ক'রে পরমবস্তুকে লাভ করার জন্য। সুতরাং কারণানন্দ কিংবা যোগ-

---

১। স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী-লিখিত বামাচারের সঠিক স্বরূপ-সম্বন্ধে 'বিশ্ববাণী' পত্রিকায় যে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন তা দ্রষ্টব্য।

২। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-রচিত 'অভেদানন্দদর্শন', ১ম সংস্করণ, পৃঃ ২০৩-২০৪ এবং 'তন্ত্রতত্ত্বনির্দেশিকা' দ্রষ্টব্য।

সাধনার ঐশ্বর্য অণিমা, লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধিকে তুচ্ছজ্ঞান ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তন্ত্রসাধনায় পরমার্থতত্ত্ব লাভ করছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "মা, কারণানন্দ চাই না। সিদ্ধি খাব।" কিন্তু সিদ্ধি কি? শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজেই বলেছেন, সিদ্ধি কিনা বস্তু (ব্রহ্মবস্তু) লাভ, অষ্টসিদ্ধির সিদ্ধি নয়। অণিমা (অনু-পরিমাণ শরীর লাভ করা), লঘিমা (শরীরের লঘুত্ব লাভ ক'রে যথেচ্ছা বিচরণ করা), প্রাকাম্য (যখন যা ইচ্ছা তাই লাভ করা) প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধিরূপ যোগবিভূতি চরমসিদ্ধি-লাভের পথে অন্তরায় বা বাধাস্বরূপ। কাজেই অষ্টসিদ্ধির একটি সিদ্ধি লাভ করারও যিনি ইচ্ছা করেন তিনি পরমতত্ত্ব লাভ করতে পারেন না। সিদ্ধি বা সিদ্ধাইয়ের অপর অর্থ অহংকার। অর্থাৎ 'আমার' এই শক্তি আছে, সুতরাং 'আমি' একজন শক্তিমান—এ আমিত্বের নাম অহংকার। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "অহংকারের লেশমাত্র থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।" গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এ অংহকারকে অজ্ঞানপ্রসূত 'কর্ম' বা 'অজ্ঞান' বলেছেন : "জ্ঞানাগ্নি সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুনঃ"—আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলে (জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা) সকল কর্মের নাশ হয়। সাধারণ 'কর্ম' বলতে অবিদ্যা। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষরা জীবিতকালেই আত্মজ্ঞান লাভ ক'রে জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা সকল কর্ম নাশ করেন। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য শরীর থাকলেও ব্রহ্মজ্ঞানী বলে পরিচিত হন, শরীররূপ অজ্ঞানলেশ তাঁদের জ্ঞানাবস্থার কোন হানি করতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "অহংকারের লেশ থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।" এ অহংকারের লেশই (সামান্যমাত্র অংশই) অজ্ঞানলেশ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, অহংকারের নাশ না হলে ঈশ্বরলাভ হয় না। একথা সত্যই। তবে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের শরীর বা অজ্ঞানলেশ 'পাকা-আমি'-র মতো। এ শরীরধারণের জন্য সামান্য অহং (পাকা-আমি) থাকলেও তা ব্রহ্মজ্ঞানের বাধক বা নাশক হয় না। সাধারণের পক্ষে কিন্তু বিপরীত।

অষ্টসিদ্ধিপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সিদ্ধি বা মুক্তিলাভের চার রকম অধিকারীর কথা বলেছেন ও তাঁরা হলেন প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ ও সিদ্ধের সিদ্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়ই বলি : যাঁরা সাধনার প্রারম্ভিক স্তরে বাস করেন, তাঁদের আরাধনার সঙ্গে বাহ্যিক আচরণের আড়ম্বর থাকে।

তাঁরা তিলকাদি বেশভূষা করেন, মালা প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ প্রবর্তক-সাধকরা সাধনপথে মাত্র যাত্রা আরম্ভ করেছেন, তাই যথার্থ তত্ত্বের সন্ধান না পেয়ে তাঁরা বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের আড়ম্বরকেই শ্রেয় মনে করেন।

সাধকশ্রেণীর উপাসকরা প্রবর্তকদের চেয়ে এক স্তর উচ্চে থাকেন। সাধনা ও সিদ্ধি-সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা অনেকটা স্বচ্ছ ও সাবলীল, তাই ব্যাকুলতা, অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা, সাধন-ভজনে নিষ্ঠা তাঁদের মধ্যে থাকে। তাঁরা বাহ্যিক আচরণের চেয়ে অন্তরের প্রার্থনা ও প্রচেষ্টাকেই অধিক প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। যীশুখৃষ্ট বলেছেন: "Knock and the door shall be opened unto you।" সাধকশ্রেণীর উপাসকরা অন্তঃকরণের দ্বারে তাই প্রার্থনা ক'রে আঘাত দেন জ্ঞানভাণ্ডারকে উন্মুক্ত করার জন্য। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ *Path of Realization*-গ্রন্থে 'Efficasy of Prayer' বা 'প্রার্থনার উপযোগীতা' শীর্ষক আলোচনায় প্রার্থনার রূপভেদ ও স্বরূপ-সম্বন্ধে বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন।

সিদ্ধসাধকের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি প্রবল। কোন্‌টি সৎ ও কোন্‌টি অসৎ, কোন্‌টি নিত্য ও কোন্‌টি অনিত্য—এ বিবেক ও বিচার যাঁর মধ্যে থাকে তিনি বিচারবুদ্ধিতে ঠিক করেন যে, যা চলমান ও অকল্যাণকর তাই অনিত্য, আর যা শাশ্বত ও শ্রেয়স্কর তাই নিত্য। এ নিত্যবস্তুতে নিষ্ঠ বা স্থিত হওয়ার জন্য যে বুদ্ধি ও বিচার তাকেই 'নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি' বলে। বুদ্ধির স্বভাব ও কাজই হোল কোন-কিছুর স্থিরসিদ্ধান্ত করা। সিদ্ধসাধক তখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে সন্দেহশীল হন না। তিনি জানেন ও বিশ্বাস করেন যে, এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে একজন বুদ্ধি ও বোধিযুক্ত ঈশ্বর আছেন—যাঁকে আমরা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা বলে মনে করি। সিদ্ধগণ সাধনার দ্বারা চিত্তকে নির্মল করেন, মনের বিচিত্র বৃত্তির গতিকে ঈশ্বরাভিমুখী ক'রে ঈশ্বরকে দর্শন করেন এবং তাঁর মহিমা ও সত্তা অনুভব করেন। ঈশ্বরের কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করেন, তার জন্য যথার্থ শান্তি ও মুক্তির অধিকারী হন।

সিদ্ধের সিদ্ধ চতুর্থ বা শেষ স্তরের সাধক। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "তিনি তাঁর (ঈশ্বরের) সঙ্গে আলাপ করেছেন, শুধু দর্শন নয়। শ্রীরাম-

কৃষ্ণদেব শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের অন্যত্র বলেছেন : 'কেউ দুধের কথা শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, আবার কেউ দুধ খেয়েছে। যে দুধ দেখেছে, সে জ্ঞানী : যে দুধ খেয়েছে, সে বিজ্ঞানী'। বিজ্ঞানী কিনা বিশেষ জ্ঞানী। যখন তত্ত্বসাধক নিজে বিচার ক'রে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন তখন তিনি বলেন—'অহং ব্রহ্মাস্মি', অর্থাৎ সসীম আমি অসীম ব্রহ্মবস্তু থেকে পৃথক নয়—এক ও অভেদ। যখন "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বা 'ঈশা বাস্যং ইদং সর্বং' বোধ হয় তখন বিশেষজ্ঞান বা বিজ্ঞান হয়—যা অসীম জ্ঞান। সিদ্ধের সিদ্ধ-সাধকের পূর্ণজ্ঞান হয়, বোধে বোধ হয়, ব্রহ্মের সাক্ষাৎ উপলব্ধি বা অপরোক্ষানুভূতি হয়। তাই শুধু শাস্ত্রমুখে নয়, মাত্র বিচার ক'রে নয়, তখন অনুভূতি দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে আত্মাকে জানা ও বোঝা হয়। এ জানা বা বোঝার ব্যাপারে কোন কোন সাধক যেকোন একটি ভাবকে আশ্রয় ক'রে ব্রহ্মবিজ্ঞানকে জানেন। যেমন, সন্তানভাব—যে ভাবে সাধক ভগবানকে মাতা-পিতারূপে দর্শন করেন। বাৎসল্যভাব—যে ভাবে ঈশ্বরকে সন্তানরূপে উপাসনা করেন ও দর্শন করেন। আবার কেউ বা সখাভাবে ও মধুরভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রে এ সকল ভাবের আলোচনা আছে। উপাসনার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্ত-সাধক কোন-না-কোন একটি মধুর সম্পর্ক স্থাপন করেন।

শাস্ত্র পাঠ ও আলোচনা ক'রে ঈশ্বরের স্বরূপ ধারণা করা যায় মাত্র, কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শন হয় না। কোন জিজ্ঞাসু শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে শাস্ত্র পড়ে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় কিনা জিজ্ঞাসা করলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন : "শাস্ত্র পড়ে হদ্দ অস্তি মাত্র বোধ হয়, কিন্তু নিজে ডুব না দিলে ঈশ্বর দেখা দেন না। * * বই হাজার পড়, মুখে হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হয়ে তাতে (ঈশ্বরচৈতন্য-সাগরে) ডুব না দিলে তাঁকে (ঈশ্বরকে) ধরতে পারবে না। শুধু পাণ্ডিত্যে মানুষকে ভোলাতে পারবে, কিন্তু তাঁকে (ঈশ্বরকে ভোলাতে) পারবে না" (শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, ১৩৬৬, পৃঃ ১৮৮)।

যাঁরা পাণ্ডিত্য অর্জন করার জন্য কেবল শাস্ত্র পড়েন, ব্যাকরণের বিধি-নিষেধ আরোপ ক'রে বিচার করেন, তাঁদেরকে শাস্ত্রই আবার চন্দনকাষ্ঠ-ভারবাহী পশু বলেছে। কথা এই যে, পশু চন্দনকাষ্ঠের ভার বহন করে, কিন্তু চন্দনের গন্ধমাধুর্য বোঝে না এবং তার মূল্যও জানে না। শাস্ত্রবিচারীরা বৌদ্ধিক বিচারের আনন্দে (intellectual pleasure) মশ্‌গুল হয়ে থাকেন,

কিন্তু তত্ত্বসাগরে অবগাহন না ক'রে ভাষা, ব্যাকরণ, পরিভাষা ও বাক্য-পারম্পর্যের আড়ম্বর নিয়ে মনে করেন সেটাই ঈশ্বরজ্ঞান। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব বলেছেন, শুধুই বৌদ্ধিক বিচারে নয়, প্রত্যক্ষ-অনুভূতি ছাড়া ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। শুধু শাস্ত্র আলোচনা একপ্রকার মোহ ও মায়ার আকর্ষণ। সে আলোচনার মধ্যে জীবন-উপলব্ধির ব্যাকুলতা না থাকলে জীবন লক্ষ্যহীন ও অসার বলে মনে হয়। উপনিষদ্‌ও (বৃহদারণ্যক) বলেছে: "জ্ঞাপকং হি শাস্ত্রম্‌",—শাস্ত্র ঈশ্বর বা ব্রহ্মস্বরূপের ইঙ্গিত দেয় মাত্র ও সে ইঙ্গিত অনুসারে সাধন-ভজন—শ্রবণ, মনন ও নিদি-ধ্যাসন করতে হয়। বেদান্তের সাধনায় ব্রহ্মকে প্রাণে উপলব্ধি করতে হয়, তবেই শাস্ত্র পড়া সার্থক হয়। *শাস্ত্র পথ, আর ঈশ্বর বা ব্রহ্ম লক্ষ্য।* সুতরাং পথে যারা বিবাদ ও কোলাহল করে তারা অধ্যাত্মজ্ঞানকামীদের চক্ষে কৃপার পাত্র ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাই মান-অভিমান সকল-কিছু ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরকে লাভ করার জন্য ব্যাকুল হতে হয়, তবেই পরমার্থতত্ত্ব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "কাঠে আগুন নিশ্চিত আছে—এই বিশ্বাস, আর কাঠ থেকে আগুন বার ক'রে ভাত রেঁধে খেয়ে শান্তি পায়—দুটি ভিন্ন জিনিস" (কথামৃত, ১ম ভাগ, ১৩৬৬, পৃঃ ১৮৬)। সিদ্ধের সিদ্ধ যাঁরা তাঁরা এ সকল তত্ত্ব জানেন, তাই ঈশ্বরের কথা শুধু শুনে নয়, শুধুই ঈশ্বরকে দেখে নয়, ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ ক'রে তবে শান্তি পান। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলেছেন: "ডুব দাও। ডুব না দিলে সমুদ্রের ভিতর রত্ন পাওয়া যায় না। জলের উপর কেবল ভাসলে রত্ন পাওয়া যায় না" (কথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৮৭)। শুধুই বুদ্ধির আনন্দের জন্য শাস্ত্র পড়া জলে ভাসার মতো, আর শাস্ত্র পড়ে সেই শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী নিজের জীবনে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার নাম জলের মধ্যে ডুব দেওয়া। বাঙলার বিদগ্ধ শক্তিসাধক রামপ্রসাদ তাই বলেছেন: "ডুব দে রে মন কালী বলে।' শ্রীরামকৃষ্ণদেবও গেয়েছেন: 'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন'। ডুব দিলে ঈশ্বরদর্শন হয়—সেকথা জোর দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: 'ডুব দাও! ঈশ্বরকে ভালোবাসতে শেখ। তাঁর প্রেমে মগ্ন হও। * * ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজলে তাঁর দর্শন হয়, কথা হয়—যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কইছি। **সত্য বলছি দর্শন হয়!**" (কথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৮৭)।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

॥ ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করো ॥

"শ্রীরামকৃষ্ণদেব। (মহিমের প্রতি) 'শাস্ত্র কত পড়বে? শুধু বিচার করলে কি হবে? আগে তাকে লাভ করবার চেষ্টা কর, গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে কিছু কর্ম কর। গুরু না থাকেন—তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর; তিনি কেমন—তিনিই জানিয়ে দেবেন।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ (১৩৬৬) পৃঃ ২১৩

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "পাঁজিতে বিশ আড়া জল হবে লেখা আছে, কিন্তু পাঁজি নিঙ্‌ড়ালে এক ফোঁটাও জল পড়বে না।" পাঁজিই শাস্ত্র, আর বিশ আড়া জল লেখা আছে এটি শাস্ত্রের অর্থ। শুধু পাঁজি নিঙ্‌ড়ালে যেমন এক ফোঁটাও জল পাওয়া যায় না, তেমনি সাধন-ভজন না ক'রে কেবল বিচার ক'রে শাস্ত্র পড়লে শাস্ত্রের সত্যকারের অর্থ জীবনে প্রতিভাত হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদের কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন—'যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি', অর্থাৎ সিদ্ধি লাভ করতে হলে সাধনা চাই।

হাতে-নাতে করার নামই সাধন—তা সে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য হোক, আর অপার্থিব শাশ্বত আনন্দ লাভের জন্যই হোক। সাধন বা সাধন-ভজন বলতে প্রধানত অধ্যাত্মসাধনা বুঝি। আত্মোপলব্ধি বা আত্ম-জ্ঞানের সঙ্গে যে কর্ম, চেষ্টা বা সাধনা জড়িত থাকে তাকেই সাধারণত অধ্যাত্ম-কর্ম বা অধ্যাত্মসাধনা বলে। শাস্ত্র এই আত্মতত্ত্বের রহস্য প্রকাশ করে। শাস্ত্র পথপ্রদর্শক ও নির্দেশক, তাই উপনিষদে শাস্ত্রকে 'জ্ঞাপক' বলা

হয়েছে—"জ্ঞাপকং হি শাস্ত্রম্'। ঈশ্বরতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব যে গ্রন্থ সাধককে জানিয়ে দেয় তাকে অধ্যাত্মশাস্ত্র বলে।

শাস্ত্র অনেক প্রকারের। অনেক প্রকারের বললে কোন শাস্ত্র সমাজশাসন ও রাজনীতির তত্ত্ব বুঝিয়ে দেয়—যেমন কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'। কোন শাস্ত্র মনুষের শরীরগঠনতত্ত্ব শিক্ষা দেয়। কোন শাস্ত্র গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রতত্ত্ব ও অসীম অনন্ত আকাশতত্ত্ব শিক্ষা দেয় ইত্যাদি। এভাবে মানুষের সমাজে কত বিদ্যা, কত তত্ত্ব, কত রহস্যই না আছে! বিশেষজ্ঞগণ অনুশীলন ক'রে মানুষকে সকল তত্ত্ব জানাবার জন্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। সে সকল গ্রন্থও শাস্ত্র, কেননা জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার পরিধিকে তারা প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করে। অধ্যাত্ম বা মোক্ষশাস্ত্রের দৃষ্টিতে এগুলি ইহবাহ্য হলেও সমাজবাসী ও কর্মশীল মানুষের কাছে এগুলির মূল্য ও সমাদর আছে, কোনটি অবহেলার বা অশ্রদ্ধার বস্তু নয়। তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বলেছেন: 'শাস্ত্র কত পড়বে' ইত্যাদি, সে শাস্ত্র অধ্যাত্ম বা মোক্ষশাস্ত্র। তা শাস্ত্রজ্ঞানের সীমায়িত পরিধিকে প্রশস্ত করে ও জ্ঞানের গভীরে ঈশ্বরতত্ত্বের প্রাণকেন্দ্রের অভিমুখে মনকে পরিচালিত করে। সাধারণ জ্ঞান তখন আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। শাস্ত্র সেজন্য পথ বা মত। অথবা বলা যায়, শাস্ত্র পথ ও মতের সন্ধান দেয়—যে পথ ও মতকে অনুসরণ ক'রে সাধন-ভজন করলে চরমলক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। শাস্ত্রকে তাই চরমলক্ষ্যের জ্ঞাপক বা বোধক বলে। উপনিষৎ (বৃহদরণ্যক) সেজন্য বলেছে—"জ্ঞাপকং হি শাস্ত্রম্', অর্থাৎ শাস্ত্র মুক্তি, মোক্ষ, তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মবিজ্ঞানের বোধক, দ্যোতক বা জ্ঞাপক, কিন্তু নিজে লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যের পথপ্রদর্শকমাত্র। তার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: 'শুধু বিচার করলে কি হবে? আগে তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা করো" প্রভৃতি।

'শুধু বিচার' বলতে শাস্ত্রপাঠ, শাস্ত্রের অর্থ ও মর্ম-বিচার, কিংবা শাস্ত্রে বর্ণিত তত্ত্বের বিচার। কিন্তু সে বিচারের মধ্যেও লক্ষ্যের প্রতি আকর্ষণ চাই। ঐ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আকুলতা দরকার, নচেৎ কেবলই বিচার-বুদ্ধির চাতুর্য বিস্তার ক'রে বাক্যের দ্বারা সকলকে বিমুগ্ধ করা। এ সকলে তত্ত্ব উপলব্ধি হয় না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব পর পর চারটি উদাহরণ দিয়েছেন তাঁর বাণীর উদ্দেশ্যকে পরিষ্কার ক'রে বোঝানোর জন্য। সে চারটি উদাহরণ হোল:

(১) "বই পড়ে কি জানবে! যতক্ষণ না হাটে পহুঁছানো যায়, ততক্ষণ দূর হতে কেবল হো হো শব্দ। হাটে পহুঁছিলে আর এক রকম। তখন স্পষ্ট দেখতে পাবে, 'আলু নাও' 'পয়সা দাও' স্পষ্ট শুনতে পাবে।"

(২) "সমুদ্র দূর হতে হো হো শব্দ করছে। কাছে গেলে কত জাহাজ যাচ্ছে, পাখী উড়ছে, ঢেউ হচ্ছে—দেখতে পাবে।"

(৩) "বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাত। তাঁকে দর্শনের পর বই, শাস্ত্র, সায়েন্স—সব খড়কুটো বোধ হয়।"

(৪) "বড়বাবুর সঙ্গে আলাপের দরকার। তাঁর ক'খানা বাড়ি, কটা বাগান, কত কোম্পানির কাগজ—এ আগে জানবার জন্য অত ব্যস্ত কেন? * * বাবুর সঙ্গে আলাপ হলে চাকর, দ্বারবান—সবাই সেলাম করবে (সকলের হাস্য)।"

উপরিউক্ত চারটি উদাহরণের সারমর্ম হোল, সাধারণ বুদ্ধিবিলাসী মানুষ মহামায়ার সংসারে বুদ্ধির খেলাই দেখতে চায়, বুদ্ধির খেলাকেই সে ভালোবাসে ও তাকে জীবনের সার ও পরমবস্তু বলে গ্রহণ করে, তার জন্য বুদ্ধির অনুশীলন করে সে সত্যবস্তুকে জানার ও বোঝার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, বুদ্ধির যত চর্চাই করো, বুদ্ধিকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন সেই পরমবোধিস্বরূপ আত্মাকে না জান্‌লে সকল জানাই চিরদিনের জন্য অজানা থেকে যাবে। আবার তাঁকে (আত্মবস্তুকে) জান্‌লে, তাঁর সম্যক জ্ঞান লাভ করলে সংসারের সকল জিনিসই জানা হয়, কোন-কিছু আর অজানা থাকে না। তাই শাস্ত্র (উপনিষৎ) বলেছে: "একস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি",—এক আত্মাকে জানলেই সংসারের সকল জিনিসি জানা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, একহাঁড়ি ভাতের একটা টিপলেই (জানলে) হাঁড়ির সকল ভাত যে সিদ্ধ হয়েছে তা জানা যায়। দেহের মধ্যে অন্তর্যামী আত্মার জ্ঞান হলে এক জ্ঞানস্বরূপ ও চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই সর্বভূতে—অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন তার জ্ঞান হয়। ঈশ-উপনিষদের প্রথম মন্ত্রের মর্মকথাই তাই—'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'হাটে পোঁছানো', 'সমুদ্রের কাছে গেলে', 'তাঁকে দর্শনের পর' ও 'বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ হলে' কথাগুলি জীবনোপলব্ধির বা তত্ত্বদর্শনের মর্মকথাই প্রকাশ করে। আম-বাগানে গাছের ও গাছের ডাল-

পালার বিচার প্রভৃতি 'নানাকথার' পরিবর্তে 'আম খাওয়ার' তত্ত্ব ও মর্মকেই গ্রহণ করতে হবে গ্রহণ ক'রে প্রকৃত সাধনের পথে অগ্রসর হয়ে সত্য বা তত্ত্ব উপলব্ধি করতে হবে। সকল ধর্মমতের ও সকল ধর্মপথের সাধনা ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি কারছিলেন চরমসত্যকে—যে সত্য সকল শাস্ত্রে, সকল তত্ত্বে ও তথ্যে এবং বিশ্বের সকল সত্তায় ওতপ্রোত হয়ে আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে কিছু কর্ম কর। গুরু না থাকেন, তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, তিনি কেমন—তিনিই জানিয়ে দেবেন।"

"শুধু বিচার করে কি হবে'!—একথা বলার পরেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব আবার বলেছেন :

(১) "আগে তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা কর",

(২) "গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে কিছু কর্ম কর"।

'আগে তাঁকে লাভ' করার অর্থ শাস্ত্র পাঠ করতে তিনি নিষেধ করেন নি, কিন্তু কেবল শাস্ত্র পড়তেই যেন সকল সময় ও সকল পরিশ্রম আমাদের শেষ না হয়ে যায়। শাস্ত্র থেকে সত্যবস্তুর কথা ও মর্ম জেনে নিয়ে সংসারের সকল কর্ম ও কর্তব্য করার পূর্বে প্রথমে প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে, সত্য তত্ত্বকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি ক'রে আমার জন্ম-মৃত্যু-শৃঙ্খলের সঙ্গে সঙ্গে মায়ার বা অবিদ্যার শৃঙ্খলও চিরদিনের জন্য ছিন্ন করবো, অমৃত বা শাশ্বত তত্ত্ব—যাকে শাস্ত্র বলছে আত্মজ্ঞান—তাকে লাভ বা উপলব্ধি ও জীবন্মুক্তির আশীর্বাদ বরণ ক'রে জীবনকে ও সংসারে জন্মগ্রহণ করাকে সার্থক করবো এ'রকম দৃঢ় সংকল্প চাই।

কিন্তু সাধনপথের চালকের জন্য গুরুর কথা বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। এ গুরু কে? এ'গুরু তিনি—যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন বা ঈশ্বর দর্শন করেছেন। উপলব্ধিবান ঈশ্বরজ্ঞানী মহাপুরুষই গুরু। প্রত্যক্ষজ্ঞানবান গুরু নিজে ঈশ্বর দর্শন করেছেন বলে ঈশ্বরদর্শনের প্রকৃষ্ট পথের বা উপায়ের সন্ধান দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে কিছু 'কর্ম' কর। এই কর্ম ঈশ্বরলাভের বা তত্ত্ব-উপলব্ধির জন্য সাধন-ভজন ও 'নেতি নেতি' বিচার। এ'কর্মই নিষ্কাম-কর্ম—যে কর্মের বা অকর্মের অর্থাৎ নিষ্কাম-কর্মের

দ্বারা সংসারের সকল কর্মের (কর্মবন্ধনের) পারে যাওয়া যায়। শাস্ত্রপাঠও কর্ম, সাধন-ভজনও কর্ম, তবে সাধন-ভজন না ক'রে কেবলই বুদ্ধির খোরাক জোগাবার জন্য শাস্ত্রপাঠ ও বিচার 'বৃথা কর্ম'। সাধন-ভজন কর্ম হলেও হিংচে যেমন শাকের মধ্যে নয়, কেননা হিংচে কফ-পিত্ত নষ্ট করে, তেমনি অধ্যাত্ম-সাধনভজনরূপ কর্ম কর্মবন্ধন অবিদ্যা দূর ক'রে চিত্তকে নির্মল করে ও সেই নির্মল চিত্তে ব্রহ্মচৈতন্য জ্ঞানরূপে প্রতিভাত হয়—'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিন্দন্তে সর্বসংশয়াঃ',—সকল সংস্কাররূপ গ্রন্থি এবং ঈশ্বরে ও জীবে—ব্রহ্মে ও জীবের মধ্যে যে ভেদ তা দূর ক'রে শান্তিরূপ মুক্তি দান করে।

শাস্ত্রে ঈশ্বরদর্শনের জন্য তর্ক করার কথা বলা আছে, আবার তর্ক বা বিচারের অতীত হবার কথাও বলা আছে। অদ্বৈতবেদান্তে মহাবাক্যের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের কথা আছে। বিচার কিনা 'তৎ ত্বম্ অসি'—তুমিই পরমপরিশুদ্ধ ব্রহ্মের স্বরূপ, মায়াবদ্ধ জীব নও। একথা বেদান্ত বারবার বলেছে। এই বিচারসহ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে, অথবা বিবরণকারদের মতে, একমাত্র বিচারযুক্ত শ্রবণকর্মের দ্বারাই ব্রহ্মবস্তুর অনুভূতি হয়। আবার ব্রহ্মবস্তু যে অবাঙ্ মনসোগোচরম্—বাক্য ও মনের অতীত, বুদ্ধির অতীত—একথাও বলা হয়েছে। সুতরাং শাস্ত্র একবার বিধিমুখে, আবার নিষেধমুখে বিচারে ব্রহ্মবস্তুর উপলব্ধি হয় বলেছে, সুতরাং কোন্‌টি সত্য ও অনুসরণীয় তা বিচারের বিষয়।

ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে পাই—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'। আচার্য শঙ্কর এর অর্থ করেছেন: "আত্মৈবেদং সর্বং ইতীশ্বরভাবনয়া সর্বং ত্যক্তম্, অত আত্মন এবেদং সর্বমাত্মৈব চ সর্বমিত্যো মিথ্যাবিষয়াং গৃধি মা কার্ষীরিত্যর্থঃ।" একমাত্র নিষ্কাম-কর্মেই সন্ন্যাসীর অধিকার। সংসার পরিবর্তনশীল, সুতরাং নিত্য নয়, সর্বপরিবর্তনবিহীন নির্বিকার ব্রহ্মই নিত্য। এখানেও বিচারসহ ত্যাগের নির্দেশ আছে। বিচারসহ ত্যাগের প্রয়োজন ব্রহ্মবস্তুকে উপলব্ধি করার জন্য। 'বিচারসহ' বলতে সত্যনির্ধারণের অনুকূল তর্ক—কূটতর্ক নয়, সুতরাং অনুকূল তর্কের সার্থকতা আছে।

কঠ-উপনিষদের ১।২।৯ মন্ত্রে বলা হয়েছে: 'নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া', তর্কে ('স্ববুদ্ধিপরিকল্পিতেন বিচারেণ') ব্রহ্মবস্তু নির্ণয় করা যায় না।

আচার্য শঙ্কর তার্কিকদের তাই নিন্দা করেছেন এই ব'লে—'তর্কিকো হ্যনাগমজ্ঞঃ স্ববুদ্ধিপরিকল্পিতং যৎকিঞ্চিদের কল্পয়তি', অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানরহিত তার্কিক ব্যক্তি নিজ বুদ্ধিবৃত্তি অনুসারে যে-কোন একটাকে আত্মতত্ত্ব ব'লে নির্ধারণ করে। এখানে তর্ক কূটতর্ক, সুতরাং নিন্দনীয়।

শাস্ত্রে তর্কের দু'রকম রূপের কথা বলা হয়েছে (১) একটি, স্ববুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত তর্ক ও (২) অপরটি, শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা পরিচালিত তর্ক। স্ববুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হলে সত্যনির্ধারণের পথে ভুল হওয়া স্বাভাবিক, আর শাস্ত্র-যুক্তিদ্বারা তর্ক সত্য নির্ণয় করার পথে সাহায্য করে। ন্যায়শাস্ত্রে তর্ক, বাদ, বিতণ্ডা ও জল্প এ চার রকম তর্কের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে 'তর্ক' সত্যকে নির্ধারণ করার পথে সাহায্য করে, সুতরাং এ তর্ক দোষের নয়। এ তর্ককে অধ্যাত্মবিচারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ বিচার 'তং দুর্দর্শং গূঢ়ং অনুপ্রবিষ্টং, গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্'। সনাতন ব্রহ্মবস্তুকে নির্ণয় করতে সাহায্য করে অনুকূল তর্ক। সুতরাং তর্ক ততদূর প্রশংসনীয়, যতদূর সত্য-নির্ণয়ে সহয়তা করে। তাই সত্য-নির্ণয়ের পর তর্কের-বা বিচারের আর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

কিন্তু যাঁরা কেবল শাস্ত্র পড়তেই আনন্দ পান তাঁদের শাস্ত্রপাঠের উদ্দেশ্য সত্য-নির্ধারণ হলেও সে নির্ধারণ কেবল কথার কথা হয়, সেই শাস্ত্রপাঠ বুদ্ধিতেই কেবল আনন্দ জোগায়, বোধি বা জ্ঞানানুভূতিতে কোন প্রেরণা দেয় না। গতানুগতিকভাবে শাস্ত্রপাঠের যাঁরা পথিক তাঁরা সাধারণত ত্যাগ বা বৈরাগ্যের পথচারী হন না।[১] আবার ত্যাগ-বৈরাগ্যের যাঁরা পথচারী হয়ে ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী হন, অথচ শাস্ত্রপাঠেই কেবল আনন্দ পান, তাঁরাও প্রশংসনীয় নন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টিতে, কেননা শ্রীরামকৃষ্ণদেব শাস্ত্রকে উপায় বলেছেন, লক্ষ্য বলেন নি। তাই বৌদ্ধিক আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাঁরা কেবলই শাস্ত্র পাঠ করেন তাঁরা নেশার মতো পর পর শাস্ত্রারণ্যেই বিচরণ করেন, ব্রহ্মবস্তুরূপ পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করার আকুলতা ও চেষ্টা তাঁদের হৃদয়ে থাকে না। ফলে তাঁরা সমাজে খ্যাতিমান পণ্ডিত বলে পরিচিত হন বটে, কিন্তু জ্ঞান লাভ ক'রে অবিদ্যাবন্ধনের পারে যেতে পারেন না।

১। এখানে 'বৈরাগ্য' বলতে সংসার ত্যাগ নয়, অন্তরে স্বার্থভাব ত্যাগ। সাধারণত মানুষ স্বার্থান্বেষী হয়, কিন্তু জীবনসিদ্ধির পথে উন্নীত হতে হলে স্বার্থত্যাগ প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সে সকল বিচারবিলাসী মানুষদের ব্যাকুল হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে বলেছেন—যাতে তারা যথার্থ ত্যাগ ও বৈরাগ্যের অধিকারী হয়ে ব্রহ্মবস্তুকে উপলব্ধি করতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করো, তিনি কেমন—তিনিই জানিয়ে দেবেন।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এ বাণী উপনিষদের বাণীরই প্রতিধ্বনি। ঈশ-উপনিষদে বলা হয়েছে,

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।

সূর্যমণ্ডলস্থিত জ্যোতির্ময় পুরুষ নারায়ণের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে যেন তিনি সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধির দ্বার উন্মুক্ত করেন, তাহলেই তাকে দর্শন অর্থাৎ উপলব্ধি করা সম্ভব। সত্যের এ প্রত্যক্ষ-উপলব্ধিতে শাশ্বত সুখের অনুভব হয়, অন্য আর কিছুতেই হয় না—"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্"; অর্থাৎ ধীর, শান্ত ও নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেকবান সাধকই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করার অধিকারী, অপরে নয়। তাই পরমসত্যদ্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণদেব পাণ্ডিত্যাভিমানীদের লক্ষ্য ক'রে বলেছেন: "শাস্ত্র কত পড়বে? আগে তাঁকে (ভগবানকে বা আত্মতত্ত্বকে) লাভ করবার চেষ্টা করো।" শুধুই বুদ্ধির বিচার অসার ও আলুনি, তাই যে অনুকূল বিচারে ভগবানকে জানা যায়, ব্রহ্মবস্তুকে উপলব্ধি করা যায়, সে শাস্ত্রবিচারই প্রয়োজন। ঈশ্বরই সত্য, আত্মজ্ঞানই নিত্য ও শাশ্বত, অপরোক্ষানুভূতিই শাস্ত্রের ও বিচারের লক্ষ্য। মনুষ্যজীবনে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করাই সারকথা, তাছাড়া আর সমস্তই অসার।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

॥ ঈশ্বরলাভের জন্য কর্ম চাই ॥

"শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই কর্ম চাই। ঈশ্বর আছেন ব'লে বসে থাকলে হবে না। যো সো ক'রে তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা করো—দেখা দাও বলে। ব্যাকুল হয়ে কাঁদো। কামিনী-কাঞ্চনের জন্য পাগল হয়ে বেড়াতে পারো, তবে তাঁর জন্য একটু পাগল হও। লোকে বলুক যে, ঈশ্বরের জন্য অমুক পাগল হয়ে গেছে। **দিন কতক না হয় সব ত্যাগ ক'রে তাঁকে একলা ডাকো।**

শুধু 'তিনি আছেন' বলে বসে থাকলে কি হবে? হালদার-পুকুরে বড় মাছ আছে, (কিন্তু) পুকুরের পাড়ে শুধু বসে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায়? *

দুধকে দই পেতে মন্থন করলে তবে তো মাখন পাবে। * *

[ঈশ্বরলাভের উপায়—ব্যাকুলতা]

মহিমাচরণ। কি কর্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যেতে পারে?'

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই কর্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যাবে, আর এই কর্মের দ্বারা পাওয়া যাবে না—তা নয়। তাঁর কৃপার উপর নির্ভর। তবে ব্যাকুল হয়ে কিছু কর্ম ক'রে যেতে হয়। ব্যাকুলতা থাকলে তাঁর কৃপা হয়। * * *।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ (১৩৬৬), পৃ: ২১৪—২১৫

পূর্বের আলোচনায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "শাস্ত্র কত পড়বে? শুধু বিচার করলে কি হবে? * * * *।" তবে কর্মের সংসারে কর্মকে ফাঁকি

দিতে কেউ পারে না। শাস্ত্রপাঠ—সেও কর্ম, বিচার—সেও কর্ম, সাধন-ভজন—তাও কর্ম। কর্ম সংসারে তিন রকম—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। বাচিক-কর্ম কায়িক-কর্মের অন্তর্গত। মানসিক-কর্ম শাস্ত্রপাঠ, শাস্ত্রবিচার ইত্যাদি। ভগবদ্‌প্রসঙ্গের অনুশীলন ও বিচার-রূপ মানসিক-কর্মের সঙ্গে বাচিক-কর্মের সম্পর্ক আছে। তথাকথিত পণ্ডিত—যাঁরা কেবল শাস্ত্র পড়েন, বুদ্ধি-বিচারের অনুশীলনই করেন, অথচ ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেন বুদ্ধির অনুশীলনের জন্য, তাদের ঈশ্বর দর্শন হয় নি। যাঁরা সন্ন্যাসী ও ত্যাগমার্গী তাঁরা অনেক সময়ে অনেককে কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকতে বলেন। বলেন, বাড়ী-ঘর যখন ছেড়ে ত্যাগব্রত গ্রহণ করলে তখন কর্মে লিপ্ত না হওয়াই ভাল; আর সবার পক্ষে শাস্ত্র-আলোচনা ও ধ্যান-ধারণাই ঈশ্বর লাভের পক্ষে শ্রেয়। তথাকথিত সাধকের এ আপাতমধুর কথা শুধুই সাধারণ মানুষের কাছে নয়, অনেক বুদ্ধিমান মানুষের কাছেও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসার বিষয়, কর্মত্যাগ বলতে তাঁরা বোঝেন কি? পড়াশোনা, শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্রীয় বিষয়ের অনুশীলন ও আলোচনা কি কর্ম নয়? সংসারী-পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী-পণ্ডিত এ দু'রকম পণ্ডিতদের মধ্যে যথার্থ কর্মত্যাগী কে? কর্তব্যকর্মে অবহেলা কি অন্য দিক দিয়ে কর্মত্যাগ নয়? গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এ' বিষয় নিয়েও বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতা।
তৎ তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ৪।১৬

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'কোন্‌টি কর্ম (কর্তব্য) ও কোনটি অকর্ম (অকতর্ব্য) সে বিষয়ে (তথাকথিত) পণ্ডিতগণও মোহ প্রাপ্ত হন। হে অর্জুন, সেজন্য (আত্মস্থ) আমি তোমার কর্মবিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, পালন করলে তুমি অশুভ (মায়ার সংসার) থেকে মুক্তি লাভ করবে।'

আচার্য শঙ্কর কবয়োঃ' শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন 'মেধাবিনোঽপি'। টীকাকার আনন্দগিরি এর ব্যাখ্যা করেছেন—'বিজ্ঞাবতামপি'। মোটকথা পণ্ডিত এবং বিচারীরাও সংসারে মোহ প্রাপ্ত হন। আনন্দগিরি বলেছেন: 'বিজ্ঞানবতামপি কর্মাদিবিষয়ে ব্যামোহোপপত্তেঃ সুতরামেব * *'। সুতরাং পণ্ডিতম্মন্য শাস্ত্রপাঠী যাঁরা তাঁদেরও যে কর্মবিষয়ে ভ্রম হয় একথা ঠিক।

অর্জ্জুনের সে ভ্রম হয়েছিল তা—'তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব' গীতার এই (৩।১) শ্লোকাংশ থেকে বোঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণ পরিষ্কার ক'রে তাই বলেছেন, সংসারধর্ম পালন বা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করলেই যে জীবনসিদ্ধি হয় এমন কথা নয়, কেননা কায়িক-কর্ম না করলেও মানুষ মানসিক-কর্ম লাভ স্বভাবতই করে। সুতরাং যাঁরা বলেন, মনের চিন্তা কর্ম, বা মনের পাপ নয়—তাদের কথা ঠিক নয়। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানীরা (সাইকোলজিষ্টরা) 'মন'-বস্তুটির বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে বলেছেন, সকল কর্মের পিছনে থাকে ইচ্ছারূপ মনের কর্ম। মন ইঙ্গিত দেয় (instigates) প্রথমে, আর বাইরের জগতে কর্ম হয় পরে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যাঁরা মনে চিন্তা করেন ও বাইরে কর্ম করি না বলেন, তাঁরা মিথ্যাচারী, অর্থাৎ ঠিক কথা বলেন না—কপট। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,

কর্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ গীতা ৩।৬

কেবলই বিচারী ও শাস্ত্রপাঠী পণ্ডিতদের মধ্যেও ভ্রান্ত ধারণা লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ তাই কর্মযোগের প্রসঙ্গে 'মুক্তসঙ্গঃ সমাচারঃ' (৩।৯), 'ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্য' (৩।৩০), 'গহনা কর্মনো গতিঃ' (৪।১৭), 'ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং' (৪।২০) প্রভৃতি কর্মাদর্শের কথা শুনিয়াছেন কর্মশীল ও কর্মবিমুখ এ উভয় মানুষকেই। পরিশেষে প্রকৃত তত্ত্বের আভাস দিয়ে বলেছেন,

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ৪।১৮

'কর্ম ক'রেও যিনি অচঞ্চল ও আসক্তিহীন থাকেন এবং কর্তা-কর্ম-করণ-বিহীন হলেও আত্মাকে যিনি সকল কর্মের প্রেরণাস্থল (উৎস) ব'লে মনে করেন, তিনি জ্ঞানী ও সকল কর্ম করার অধিকারী।' কোন কোন পণ্ডিত শ্লোকটির ব্যাখ্যা করেন এ' ভাবে যে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সম্পন্ন সকল কর্মই 'অকর্ম', কেননা ঐ সকল কর্মের দ্বারা সংসার বন্ধন হয় না। মোটকথা ফলাসক্তি ত্যাগ ক'রে আত্মদৃষ্টিতে কর্ম করলে সে কর্ম মানুষকে সংসারে আবদ্ধ করে না। আবার 'অকর্ম' বলতে কর্মচাঞ্চল্যহীন সৎ ও চিৎ-স্বরূপ আত্মাকে বোঝায়। আত্মজ্ঞানীও সংসারে কর্ম করেন, কিন্তু সে কর্ম জীবকল্যাণ বা বিশ্বকল্যাণের জন্য, তাই তা স্বার্থদুষ্ট নয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন,

কর্ম না ক'রে কোন মানুষই সংসারে বেঁচে থাকতে পারে না। কর্ম সে করে নিজের স্বার্থের জন্য, অথবা পরার্থের জন্য। স্বার্থপরতাই মায়া। স্বার্থপরতাই বন্ধন। তাই স্বার্থশূন্য হয়ে জ্ঞানীরা সকল কর্ম করেন। জ্ঞানীদের ফলাকাঙ্ক্ষা-শূন্য কর্মকে তাই 'অকর্ম' বলা যেতে পারে। আবার অকর্মের অর্থ আত্মা কেননা মায়াস্পর্শহীন আত্মার কোন কর্ম বা কর্মের বীজ (সংকল্প) থাকে না—সেকথা বলেছি। শ্রীকৃষ্ণের মতো শ্রীরামকৃষ্ণদেবও সংসারে পাকাল মাছের মতো থেকে সকল কর্ম করতে শিক্ষা দিয়েছেন।

স্বার্থশূন্য হয়ে কর্ম করার নাম ধর্মসাধনা। আবার কর্মসাধনাও। 'ধর্ম' এখানে আত্মা। আত্মজ্ঞানের জন্য কর্ম বা সাধনাকে ধর্ম বলে। ধর্মসাধনাই চিত্তকে নির্মল ক'রে ঈশ্বরের সঙ্গে সাধকের মিলন-সাধন করে। এ সাধনার নাম 'চেষ্টা' বা 'যত্ন'। ঋষি পতঞ্জলি পাতঞ্জলদর্শনে একথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের সাহায্যে চঞ্চল মনকে স্থির ক'রে আত্মার পরিশুদ্ধ রূপকে উপলব্ধি করতে হয়।

অভ্যাস কাকে বলে? 'তত্র যত্নোঽভ্যাসঃ',—বার বার যত্ন বা চেষ্টা করার নাম অভ্যাস। আর ফলাসক্তি বা বিষয়াসক্তি না থাকার নাম বিরাগ বা বৈরাগ্য। বি-রাগ কিনা মন থেকে রাগ বা আসক্তি দূর হলে সে অবস্থাকে বৈরাগ্য বলে। সুতরাং আত্মোপলব্ধি করতে হলে চেষ্টা, আকুলতা ও অধ্যবসায় চাই। চেষ্টা, আকুলতা ও অধ্যবসায়ের নাম তাই কর্ম বা 'কর্মযোগ'। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "তাই কর্ম চাই। ঈশ্বর আছেন বলে বসে থাকলে হবে না। যো সো ক'রে তাঁর কাছে যেতে হবে।" 'কাছে যাওয়ার' নামই চেষ্টা, আকুলতা ও অধ্যবসায়। ঈশ্বর আছেন একথা শাস্ত্রে ও জ্ঞানীদের কাছে শুনি, কিন্তু সেই আছে বা তাঁর সত্তাকে যাচাই করতে হলে চেষ্টা ও সাধনা দরকার। যত্ন ও সাধনার নাম পুরুষকার। সে মানুষ অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে নিজের চেষ্টা অর্থাৎ পুরুষকারকে বাদ দেয়, কর্মবিমুখ হয়, কর্মকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করে, সে মানুষ ঈশ্বর দর্শন থেকে বঞ্চিত হয়। অদৃষ্টের চেয়ে পুরুষকার বা নিজের চেষ্টা মূল্যবান; পুরুষকার বা পুরুষের নিজের চেষ্টা ছাড়া ঈশ্বর দর্শন হয় না। একথা সুনিশ্চিত যে, মোহযুক্ত মানুষই কর্মকে ফাঁকি দেয়, আর অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে পুরুষকার থেকে বিরত হয়। সেখানে তাদের যুক্তি হোল,

শাস্ত্রপাঠ, শাস্ত্রবিচার ও ধ্যান-জপাদি কর্মই কর্ম, আর সব অকর্ম, অর্থাৎ জীবনে করণীয় নয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, পণ্ডিতদেরও এ ধরনের মোহ ও ভ্রান্তি আসে। শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্রবিচার দরকার কেবল ঈশ্বরকে লাভ করার জন্য। সকল কর্মের উদ্দেশ্য ও আদর্শ তাই। 'আহার করি মনে করি, আহুতি দেই শ্যামা মায়ে'—এটাই কর্মের আদর্শ। বিচারী ও ত্যাগীদের সকল কর্মই ঈশ্বরের পূজার ও জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। কিন্তু সাধারণ কর্মত্যাগীদের চিন্তা মিথ্যাবিচারে পরিণত হয়। তাঁরা কর্মকে ফাঁকি দিতে গিয়ে ঈশ্বরদর্শন থেকে বঞ্চিত হন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: 'কর্ম চাই। যো সো করে তাঁর কাছে যেতে হবে।" এই কাছে যাওয়ার নামই সাধনা, যথার্থ বিচার, আর কর্মকে অসার ও অকর্তব্য মনে ক'রে কর্মবিমুখ হওয়ার নাম অবিচার।

সুতরাং ঈশ্বরের কাছে যাওয়া কেমন ক'রে হয়? শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রার্থনার কথা বলেছেন: "নির্জনে তাঁকে (ঈশ্বরকে) ডাকো, প্রার্থনা কর—'দেখা দাও' বলে। ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদো।" ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে ডাকার নাম 'প্রার্থনা'। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ *Path of Realization*-গ্রন্থে Efficacy of Prayer-আলোচনায় ব্যাকুল হওয়া ও সত্যকার প্রার্থনা কাকে বলে তাদের পরিচয় দিয়েছেন। ঈশ্বরকে লাভ করার, বা নিজের প্রকৃত স্বরূপকে জানার জন্য আকুল আবেদনই প্রার্থনা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরের জন্য মানুষকে পাগল হতে বলেছেন। কিন্তু পাগল তো মানুষ হয়েই আছে! শ্রীরামকৃষ্ণদেব সংসারমোহগ্রস্ত মানুষকে পাগল বলেছেন। ভগবানের জন্য যে পাগল হয়, সে পাগলই 'সেয়ান পাগল'। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাই বলি: "কামিনী-কাঞ্চনের জন্য পাগল হয়ে বেড়াতে পারো, তবে তাঁর (ঈশ্বরের) জন্য একটু পাগল হও। লোকে বলুক যে, ঈশ্বরের জন্য অমুক পাগল হয়ে গেছে।" কিন্তু ঈশ্বরের জন্য মানুষ পাগল হয় কোথায়। জীবনের সারবস্তু যে ভগবান তাঁকে ভুলে অসার বস্তু নিয়ে সংসারে খেলা করে মানুষ। তাহলে অসার বস্তু কি? সে বস্তুকে মানুষ অপ্রয়োজনীয় মনে করে, অথবা যে বস্তু নিত্য ও সত্য নয়, সর্বদাই মরণশীল বা ক্ষয়শীল—তাই অসার। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই যথার্থ পাগল বলতে ঈশ্বরের জন্য পাগল হতে বলেছেন। বলেছেন: "দিনকতক না হয় সব ত্যাগ ক'রে তাঁকে (ঈশ্বরকে) একলা ডাকো।" 'সব

ত্যাগ ক'রে সংসারের অনিত্য বিষয়বস্তুতে ডুবে না থেকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ঈশ্বর বা পরমাত্মাকে লাভ (উপলব্ধি) করার জন্য ডাকো, প্রার্থনা করো।'

তবে একলা বা নির্জনে তাঁকে ডাকতে হবে। একলা বা নির্জনের অপর নাম ঈশ্বরলাভের ইচ্ছা (বৃত্তি) ছাড়া অন্য সকল বাসনাকে দূর করা নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখাবৎ অচঞ্চল মন নিয়ে ঈশ্বরের চিন্তা করা ও সে অচঞ্চল মনকে ঈশ্বরে স্থির রাখা। এটাই 'একলা' বা 'নির্জন' কথার তত্ত্বকথা ও ঠিক অর্থ। মনের সঙ্কল্প ও বিকল্প (হাঁ-না) বৃত্তিদুটি দূর হলেই মন পরিশুদ্ধ বা নিরুদ্ধ হয়। এ নিরুদ্ধ অবস্থার নাম সমাধি। পরিশুদ্ধ নির্মল মনে আত্মার স্বরূপ প্রতিফলিত হয় ও ঈশ্বরদর্শন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, ব্রহ্ম মন-বুদ্ধির অগোচর, কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধির (বা শুদ্ধমনের) গোচর। আসলে শুদ্ধবুদ্ধি ও শুদ্ধজ্ঞান এক। এই একত্ববুদ্ধি অনুভবের বিষয়, বৌদ্ধিক বিচারের তা গোচরীভূত নয়। তবে শুদ্ধমন যে শুদ্ধজ্ঞানের স্বরূপ তা সাধারণের পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন। অদ্বৈতবেদান্ত যেখানে একটিমাত্র জ্ঞানের (ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান) সত্তা স্বীকার করেছে সেখানে মন বা বুদ্ধি পরিশুদ্ধ হলে তার সত্তা থাকে কোথায়? কারণ শুদ্ধবুদ্ধি ও জ্ঞানের থাকার জন্য পৃথক স্থানের কোন ব্যবস্থা নাই।[১] পরিশুদ্ধ চরম-জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে অদ্বৈতবেদান্ত বলেছে—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বলেছেন, ব্রহ্ম শুদ্ধবুদ্ধি বা শুদ্ধমনের গোচর, শুদ্ধবুদ্ধি বা মন সেখানে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে রূপান্তরিত (transformed) হয়। ঋষি পতঞ্জলিও বলেছেন—'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্'। দ্রষ্টা অর্থে শুদ্ধ আত্মা বা পরমাত্মা। মন শুদ্ধ বা সমাধিস্থ মন আত্মারূপে প্রকাশ পায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরপ্রসঙ্গ শোনার ও তাঁকে প্রত্যক্ষ করার প্রসঙ্গে কামারপুকুরে হালদারপুকুরের উল্লেখ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাড়ীর পাশেই হালদারপুকুর, সুতরাং তার উদাহরণ দিয়েছেন তিনি নানা জায়গায়। হালদারপুকুরে মাছ আছে ও সেই মাছ ধরতে হলে চার ফেলতে হয়। মাছ হলো ঈশ্বর, আর চার ফেলার নাম সাধনা ও পুরুষকার। মন স্থির ক'রে মাছ

১। অশুদ্ধ মন বা বুদ্ধি যখন বিচার ও সাধন-ভজনের দ্বারা পবিশুদ্ধ হয় বলতে চৈতন্যে রূপান্তরিত হয় তখন অশুদ্ধ মনের পৃথক সত্তা আর থাকে না, তখন অশুদ্ধ মন শুদ্ধ মনে রূপান্তরিত হয়।

ধরার মতো ঈশ্বরের দর্শন বা অনুভূতি লাভ করতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: 'দুধকে দই পেতে মন্থন করলে মাখন পাবে'। মন্থন করার নাম যত্ন ও ধৈর্য সহকারে সাধনা। অদ্বৈতবেদান্তে মন্থনকে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বলে। অথবা মন্থন বিচার ও ধ্যানের চরমফল মাখন বা উপলব্ধি। সেজন্য কর্ম চাই, চেষ্টা চাই, সাধন চাই। নিশ্চেষ্ট সাধনহীন মানুষের পক্ষে ঈশ্বর-দর্শন বা আত্মোপলব্ধি সুদূরপরাহত।

ঈশ্বরলাভের উপায় যে ব্যাকুলতা সে সম্পর্কে ভক্ত মহিমাচরণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জিজ্ঞাসা করেছেন: "কি কর্মের দ্বারা তাঁকে (ঈশ্বরকে) পাওয়া যেতে পারে?" শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "এই কর্মের দ্বারা তাঁকে (ঈশ্বরকে) পাওয়া যাবে, আর এই কর্মের দ্বারা পাওয়া যাবে না—তা নয়। তাঁর কৃপার উপর নির্ভর।" মোটকথা সংসারের ও জীবনের সকল কর্মই যদি নিঃস্বার্থ ভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করা যায় তাহলে সে কর্মে সংসারবন্ধন দূর হয়। ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'কৃপার' কথাও বলেছেন। বলেছেন: "তবে ব্যাকুল হয়ে কিছু কর্ম ক'রে যেতে হয়। ব্যাকুলতা থাকলে তাঁর কৃপা হয়।" ব্যাকুলতা এখানে precondition বা means—উপায়, কেননা ব্যাকুলতা থাকলে ঈশ্বরের কৃপা হয়, না থাকলে হয় না। এই নিদর্শন ঠিক এ রকম যে, দর্পণ বা আর্শী যদি পরিষ্কার (ধূলিমলিনতাবিহীন) হয়, তাহলে সূর্যের প্রতিবিম্ব দর্পণে বা আর্শীতে স্পষ্টভাবে পড়ে। ব্যাকুলতা মনের স্বচ্ছতা ও একতানতা (concentrated attention) এনে দেয়। তাই নির্মল অধিকারীতে ঈশ্বরের কৃপা হয়। কৃপালাভের অধিকারী না হলে ঈশ্বরের কৃপা হয় না। চিত্তের নির্মলতা, একান্ত ব্যাকুলতা ও ঐকান্তিকতা ঈশ্বরানুগ্রহলাভের অনুকূল। বিভিন্ন ভক্তিশাস্ত্রে, গীতায় ও অন্যান্য ধর্মেও কৃপা বা grace-এর কথা আছে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর ইংরাজী *Bhagavad Gita, the Divine Message*-গ্রন্থে কৃপাপ্রসঙ্গে (vide Conclusion, pt. II, p. 1009) বলেছেন: "The *Gita* admits grace which comes from God as a reward for pure and dedicated mind. The grace is universal, and does not mean predestination, as Christianity thinks. Grace is a state of relaxation, and it comes under certain conditions. Anything that is spiritually

uplifting and ennobling—anything that brings right knowledge to the soul, comes from the all-powerful infinite source, and that is grace. We are the children of God, and by our birth-right we possess grace of God"। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সুন্দর-ভাবে কৃপার অর্থ এখানে দিয়েছেন। জ্ঞান ও ভক্তির বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির দিক থেকে এ অর্থ দিয়েছেন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, ঈশ্বরের কৃপা পেতে গেলে ব্যাকুলতা দরকার। ব্যাকুলতা কিনা মনের একমুখী আকর্ষণ এবং সে আকর্ষণে ঈশ্বরের কৃপা লাভই একমাত্র লক্ষ্য হয়। তখন আর অন্য কোন-কিছুর দিকে দৃষ্টি থাকে না। তাহলেও তিনি বলেছেন: "একটা সুযোগ হওয়া চাই।" সুযোগ কিনা সাধুসঙ্গ, বিবেক, সদ্‌গুরুলাভ। 'সাধুসঙ্গ' বলতে যাঁরা সৎপ্রসঙ্গ করেন তাঁদের সঙ্গ বা সাহচর্য। সৎ অর্থে শাশ্বত ও নিত্যস্বরূপ ঈশ্বর বা আত্মা। যে সকল নির্মলচিত্তসম্পন্ন মানুষ বা সাধক ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেন, আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য একনিষ্ঠভাবে যাঁরা সাধন-ভজন করেন এবং আত্মজ্ঞান-লাভকেই জীবনের সারবস্তু বলে মনে করেন, তাঁদের সংস্পর্শে আসার নাম 'সাধুসঙ্গ'। এ 'সাধু' বলতে শুধুই সন্ন্যাসী কেন, সাধুবৃত্তি বা সদ্‌বৃত্তি-সম্পন্ন মানুষমাত্রেই সাধু। যাঁরা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ও সাধনা ছাড়া অপর প্রসঙ্গ ও সাধনা করেন না তাঁরাই সাধু। সে সকল সাধুবৃত্তিসম্পন্ন মানুষেরই সংস্পর্শে আসতে হয়।

'বিবেক' অর্থে সদসৎ বা নিত্যানিত্য বস্তুবিচার। ঈশ্বরই সৎ, আর সব অসৎ কিনা ক্ষয়শীল—এ চিন্তা ও বিচার সর্বদা করার নাম বিবেক। 'সদ্‌-গুরুলাভ' বলতে যে আচার্য আত্মার উপলব্ধি ক'রে সংসারবন্ধনের পারে গেছেন—তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, সচ্চিদানন্দই একমাত্র গুরু, আর মনুষ্যগুরু সেই সচ্চিদানন্দের দিকদর্শক বোলে তিনিও (মন্ত্রদাতা গুরুও) সদ্‌গুরুপদবাচ্য।

অনেকে বলেন, একমাত্র গুরুসেবার দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়। কথাটি খুবই সত্য। কিন্তু এখানে ভুল বোঝারও অবসর আছে। গুরুসেবা বলতে যাঁরা কেবল দীক্ষাদাতা গুরুর সেবাকেই গুরুসেবা বলে মনে করেন, তাঁদের পক্ষে অনেক সময়ে এ রকম হয় যে, তাঁরা মানুষ-গুরুকেই একমাত্র মুক্তিদাতা

মনে ক'রে ইষ্টদেবতাকে ভুলে যায়। এ বুদ্ধি থেকে ক্রমে ফ্যানাটিক বা ভাবপ্রবণ ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। আবার সৃষ্টি হতে পারে সাম্প্রদায়িক ভাব যে, 'আমার গুরুই' উৎকৃষ্ট ও পূজনীয়, আর সকল গুরু বা ঈশ্বরসাধকরা নিকৃষ্ট। এই ধারণা ধর্মসঙ্ঘের পক্ষে সাংঘাতিক ও অনিষ্টকরী। আসল কথা এই যে, গুরু ও ইষ্ট এক, তাঁদের মধ্যে কোন ভেদ নাই। কিন্তু সেই গুরু কে? তিনি শুদ্ধজ্ঞান ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তাঁর ধ্যান—'ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং, দ্বন্দ্বাতীতং ত্রিগুণরহিতম্'। তাঁর স্থান ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্রের নীচে দ্বাদশদলপদ্মে বা শ্রীগুরুপদ্মে। গুরুপদ্মই জ্ঞানপদ্ম বা মুক্তিপদ্ম, সুতরাং এই গুরু মনুষ্যগুরু বা দীক্ষাদাতা গুরু নন। তিনি শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ ও মুক্তিস্বরূপ গুরু। গুরু-শব্দের গু—অর্থে অজ্ঞান, অন্ধকার, রু—যিনি উন্মীলন বা দূর করেন, তিনি গুরু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। এই ইষ্টদেবতারূপ জ্ঞানস্বরূপ গুরুর সেবা করলে শিষ্য সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়। দীক্ষাদাতা মনুষ্যগুরু ঐ জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্যময় গুরু ও ইষ্ট-দেবতাকে লাভের উপায় দেখিয়ে দেন বলে তিনিও পূজনীয় ও শ্রদ্ধেয়। গুরু ও ইষ্টের সমন্বিত মূর্তিই গুরুমূর্তি ও ইষ্টমূর্তি। এটিই গুরুসেবা ও গুরুকৃপার তাত্ত্বিক অর্থ। অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে শিষ্যের পক্ষে এই তাত্ত্বিক ধারণা অনুসরণ করা কর্তব্য। অন্যথা দলগত বুদ্ধি ও স্বার্থবুদ্ধি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দপ্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গপার্ষদদের উপদেশই তাই।

মুমুক্ষু মানুষের পক্ষে ঈশ্বরলাভের জন্য একান্ত ব্যাকুলতার সঙ্গে সঙ্গে সাধুসঙ্গ, বিবেক ও সদ্‌গুরুলাভ—এ তিনটির সমাবেশ থাকা চাই। বিদ্বৎ-সন্ন্যাসীদের কথা স্বতন্ত্র। বিবিদিষা সন্ন্যাসীরা সাধনার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিলাভের ব্রতই গ্রহণ করেন। যথার্থ ভক্ত যাঁরা, ঈশ্বরের নিকট তাঁরা আত্মনিবেদন করেন ও সকল কর্মের মধ্যে 'সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি' এ মহামন্ত্র জপ করেন। তাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সাধারণ মুক্তিকামী ও সাধনশীল ভক্তদের জীবনে যত্ন, অধ্যবসায় ও ব্যাকুলতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। আর প্রয়োজন—সদসদ্‌বিচার, ভগবদ্‌জ্ঞানপিপাসু সাধক ও সাধুর সঙ্গলাভ ও সর্বোপরি সদ্‌গুরুলাভ। এগুলিই মুক্তিলাভের পথে সহায়ক ও পরমসুযোগ। এই পরমসুযোগ লাভ খুব কম মানুষের জীবনেই দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "এই সব যোগাযোগ হলে হয়ে যায়।" 'এই সব' বলতে সংসারীদের পক্ষে অপরে যদি কেউ সংসারের ভার নেয়, কিংবা বিবাহিত পক্ষে স্ত্রী যদি বিদ্যাশক্তি ও ধর্মশীল হন, কিংবা বিবাহ-বন্ধনে কেউ যদি আবদ্ধ না হন, সে সকল ভক্তের পক্ষে নির্বিঘ্নে ঈশ্বরের নাম ও আরাধনা করা সহজ হয়। 'স্ত্রী বিদ্যাশক্তিসম্পন্না' অর্থে সহচারিণী অবিদ্যার সংসারে আবদ্ধ রেখে পতির অধ্যাত্মসাধনার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেন না, জীবন-সাধনার পথকে তিনি বরং সচ্ছলই করেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্ত্রীলোকদের বিদ্যাশক্তি ও অবিদ্যাশক্তি এ দু'ভাগে ভাগ ক'রে বলতেন, দ্যাশক্তি-বিরূপিণী স্ত্রীলোকরা ঈশ্বরসাধনার পথে কোনদিনই বাধা সৃষ্টি করেন না। সে সকল স্ত্রীলোকদের দেখে তিনি বুঝতে পারতেন যে, কে বিদ্যাশক্তি ও কে অবিদ্যাশক্তি। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে বিবাহিতা নারীর নাম ছিল সহধর্মিণী। স্বামীর সঙ্গে তিনি ধর্মাচরণ করতেন, আবার স্বামীর ধর্মাচরণে সাহায্যও করতেন।

মোটকথা ঈশ্বরলাভই মানুষের চরমলক্ষ্য—একথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব বারবার বলেছেন। ঈশ্বরের দর্শন লাভ করা ও আত্মোপলব্ধি করা—এক কথা। 'প্রায়' শব্দ ব্যবহার করার অর্থ অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বর তুরীয় বা মায়াবিরহী ব্রহ্মচৈতন্য থেকে একটু পৃথক, কেননা ঈশ্বর মায়াধীশ হলেও কারণ-অজ্ঞান মায়া তাঁর সঙ্গে থাকে, আর তুরীয় বা শুদ্ধব্রহ্মে মায়ার লেশমাত্র থাকে না। অধ্যাত্ম-জ্ঞানকামীদের জীবনে ঈশ্বরলাভের বা আত্মোপলব্ধির জন্য ব্যাকুলতা, একান্ত নিষ্ঠা, বিবেক-বিচার ও পুরুষাকার থাকা প্রয়োজন। কর্মের সংসারে কর্মকে সাধনার অঙ্গরূপে গ্রহণ করা উচিত। নিঃস্বার্থবুদ্ধি নিয়ে কর্ম করলে কর্ম বন্ধনের কারণ হয় না, বরং চিত্তশুদ্ধিরই কারণ হয়। চরম-উপলব্ধির পথে পরিশুদ্ধ মন ও নিষ্কাম-কর্মই জ্ঞানের আকারে মুক্তির বা আত্মোপলব্ধির আশীর্বাদ দান করে। তত্ত্বাভিমুখী মনই চরমতত্ত্বের রহস্য ভেদ করতে সমর্থ হয়, কিন্তু সংসারে আবদ্ধ ভোগমুখী মন মানুষকে মায়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। তাই জ্ঞানবিচার থাকলেও জীবনে শরণাগতির প্রয়োজন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

॥ কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ ॥

"শ্রীরামকৃষ্ণ। মন থেকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ হলে ঈশ্বরে মন যায়, মন গিয়ে লিপ্ত হয়। যিনিই বদ্ধ, তিনিই মুক্ত হতে পারেন। ঈশ্বর থেকে বিমুখ হলেই বদ্ধ। নিকৃতির নীচের কাঁটা থেকে তফাৎ হয় কখন—যখন নিকৃতির বাটিতে কামিনী-কাঞ্চনের ভার পড়ে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ (১৩৬৬), পৃঃ ২১৭

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীতে সহজ সরলভাবে সকল সিদ্ধান্তের আভাস পাওয়া যায়—যেমন পাওয়া যায় উপনিষদের সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের বাণীতে। উপনিষদের নাম বেদান্ত। উপনিষদের সত্য আত্মদ্রষ্টা ঋষিরা উপলব্ধি ক'রে শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে তাঁদের জ্ঞানদীপ্ত বাণী দান ক'রে গেছেন। কানে শুনে শুনে বাণীগুলিকে আবৃত্তি ও তাদের অনুশীলন ক'রে উপলব্ধি করা হোত, আর তার জন্য উপনিষদের বাণীকে 'শ্রুতি' বলে। কানে শুনে মুখে মুখে প্রচলিত সত্যবাণীই 'শ্রুতি'। যে বাণী, যে গ্রন্থ, যে প্রাণদীপ্ত উপদেশগুলির সংস্পর্শে এসে (কাছে উপবেশন করলে) অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীভূত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে পরমজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্যের উপলব্ধি হয় তাকেই উপনিষৎ বলে।

উপনিষদের ঋষিরা পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের অবতারণা ক'রে উপনিষাদের বাণীগুলিকে যুক্তি-তর্কজালের কুয়াসা সৃষ্টি করেন নি, বরং নিরাবরণ তত্ত্বরূপের উদ্‌ঘাটন করেছেন একান্তভাবে। তেমনি গভীর তত্ত্বপূর্ণ উপদেশগুলিকে তর্কজালে আচ্ছন্ন না ক'রে সহজ সরল ভাষায় বলে গেছেন

শ্রীরামকৃষ্ণদেব। তত্ত্বসমৃদ্ধ সিদ্ধান্তের আভাস ও প্রকাশই তাঁর বাণীতে ও উপদেশে স্পষ্ট এবং প্রধান।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "মন থেকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ হলে ঈশ্বরে মন যায়।"[১] শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এ বাণীর মধ্যে 'মন', 'কামিনী' ও 'কাঞ্চন,' 'ত্যাগ হলে' কথা বা শব্দগুলি গভীর তত্ত্ব ও অর্থের প্রকাশক। মনের স্বভাব চিন্তা করা। মন চিন্তা করে দু'রকমভাবে: 'সংকল্প' করে, ভাবে বা চিন্তা করে কোন কাজ করার জন্য, আর 'বিকল্প' করে অর্থে কোন কাজ করবো—কি করবো না তা চিন্তা করে। হ্যাঁ ও না—positive ও negative—ইতিমূলক ও নেতিমূলক চিন্তা করা মনের কাজ ও স্বভাব। মনই জীবন ও সংসারের চালক, কারণ মনের সাহায্যেই মানুষ ও সকল প্রাণী চিন্তা করে ও চিন্তার প্রেরণায় কাজ করে। মন 'কাজ করে' কিনা চিন্তারূপ কাজ করে। চিন্তা করাটাই মনের স্বভাব। ইংরেজীতে মনকে তাই thinking principle বলে। যোগবাশিষ্ট-রামায়ণে বশিষ্ঠদেব মনকে বিশ্বসংসারের কর্তা বলেছেন—'মনো হি জগতাং কর্তৃ',—মনই জগতের কর্তা। বিশ্ব সৃষ্টি করা, পালন করা ও ধ্বংস করাও মনের কাজ। আচার্য শঙ্কর বলেছেন—'চরাচরং ভাতি মনো বিলাসম্',—বিশ্বচরাচর মনেরই বিলাস বা কল্পনা। কল্পনা মনেরই কাজ। মন সৃষ্টিকর্তা—যদিও সকল শাস্ত্র ঈশ্বরকেই বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টিকর্তা বলেছে। মন সৃষ্টিকর্তা বলতে মন সংসার সৃষ্টি করে, আর ঈশ্বর অনন্ত ও বিশাল সংসার ও প্রজা সৃষ্টি করেন। এখন প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে ঈশ্বরই কি মন? মন তো যন্ত্র ও অন্তঃকরণের একটি বৃত্তি বা বিকাশ, আর মনকে ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং মন আবার ঈশ্বর কি করে হবে?

প্রশ্ন ও সমস্যাটি বেশ গভীর। ঈশ্বর বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, আর মন ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। অদ্বৈতবেদান্তে মনকে দু'রকমভাবে চিন্তা ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (সমষ্টি) মন ও প্রাণ একদিক থেকে হিরণ্যগর্ভ-ঈশ্বর—যাঁর মধ্যে সৃষ্টির বীজ ব্যক্ত বা প্রকাশিত। প্রাণকেও হিরণ্যগর্ভ-ঈশ্বর বলা হয়েছে। মনের কাজ যেমন ইচ্ছা বা সংকল্প করা, প্রজাপতি ব্রহ্মাও তেমনি ইচ্ছা করেন বিশ্বসৃষ্টি

১। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ' অর্থে ঈশ্বরকে ভুলে গিয়ে কেবলই কামিনী ও কাঞ্চনের আসক্তিতে ডুবে থাকলে জীবনসিদ্ধিরূপ মুক্তির পথ রুদ্ধ হয়।

করতে। তাঁর ইচ্ছা বা সংকল্পমাত্রেই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি হয়, কেননা মনেই বাসনা-কামনার সৃষ্টি হয়। প্রবৃত্তিকামী মানুষ বাসনা-কামনার সংসারে স্বার্থের আকর্ষণ সৃষ্টি করে। এ স্বার্থের আকর্ষণই সংসার—বিশ্বমায়া। এর জন্য মনের বৃত্তিরূপ বাসনা-কামনাকে বেদান্তে অজ্ঞান, অনর্থ ও বন্ধন বলেছে। আচার্য শঙ্কর চরাচর বা বিশ্বপ্রপঞ্চকে যে মনের বিলাস ও কল্পনা বলেছেন, তা মিথ্যা নয়, কেননা ইচ্ছা বা কল্পনা করি বলেই আমরা কর্ম করি, আর তার জন্য কর্মের সংসারে আমরা আবদ্ধ হই। মনঃসমুদ্রেই সকল বাসনা-কামনা বা ইচ্ছার তরঙ্গ ওঠে, আর সে তরঙ্গের মধ্যে পড়ে তাতেই গা ভাসিয়ে চলি আমরা অনন্তের দিকে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, সংসার-বন্ধনের বড় দুটি সামগ্রী কামিনী ও কাঞ্চন। আবার সংসার তখনই সার্থক হয় যখন সহায়ক বা সহচারিণী থাকেন সংসারীর সংকল্পে ও কর্ম-কর্তব্যে সাহায্য করার জন্য। সংসারে সহচারিণীরা মায়ায় আবদ্ধ করেন, বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেন, সংসারকে দুঃখপূর্ণ করেন, কিন্তু আবার সংসারকে মধুময়ও করেন। তাছাড়া মায়াজালে আবদ্ধ করেন শুধু কামিনীরা নন, আবদ্ধ করে পার্থিব সকল বস্তুই। উপনিষদে দেখি, সৃষ্টির প্রভাতে 'স ঐচ্ছৎ',—তিনি ঈশ্বর বা সগুণব্রহ্ম ইচ্ছা করলেন 'একোঽহং বহু স্যাম,—'আমি একা আছি, বহু হব'। এ বহু হবার কামনাই বিশ্বসংসার-সৃষ্টির বীজ। সুতরাং সংসারীদের পক্ষে দ্বিতীয় বা সহচারিণী থাকায় বাধা নেই, বাধা কেবল মায়া ও মায়ার আত্মকেন্দ্রিক আসক্তি। কামিনী অর্থে মাতৃস্বরূপিণী আদ্যাশক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন, কামিনী বা নারীমাত্রেই আদ্যাশক্তিস্বরূপিণী। তিনি আপনার সহধর্মিণী শ্রীসারদাদেবীকে আদ্যাশক্তি-রূপে পূজা করেছিলেন এবং শক্তিস্বরূপিণী শ্রীসারদাদেবীর প্রতিচ্ছবিরূপেই বিশ্বের সকল নারীমূর্তিকে দর্শন করতেন। কামিনীত্যাগের নূতন, অভিনব ও অপরূপ ব্যাখ্যার সন্ধান শ্রীরামকৃষ্ণদেবই প্রথম দিয়েছেন বর্তমান এই যুক্তি ও বিজ্ঞানের যুগে। ত্যাগ করার অর্থ তাই আকর্ষণ, আসক্তি ও দুষ্টদৃষ্টিকে পরিত্যাগ করা। নারী বা কামিনী যে বিলাসের বস্তু নয়, বরং বিশ্বসৃষ্টির পরমপবিত্র উপকরণ ও বিশ্বশক্তির উৎসরূপিণী—এ' দৃষ্টি করতে বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। ভোগের ও ঐশ্বর্যসম্ভারের মধ্যে থেকেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব পরমত্যাগী ছিলেন। ত্যাগ করার অর্থ সুতরাং দাঁড়ায় দৃষ্টির পরিবর্তন।

দৃষ্টির পরিবর্তন করার অর্থ মনের ও তার কর্মরূপ চিন্তার পরিবর্তন করা। যে দৃষ্টি স্বার্থ সৃষ্টি করে, তা ত্যাগ করা দরকার। তাই নিঃস্বার্থভাবের নাম ত্যাগ। তাই যে দৃষ্টি দিয়ে বিশ্বসামগ্রীকে আমরা ক্ষয়শীল বলে দেখি, সে দৃষ্টির পরিবর্তন করা দরকার। পরিবর্তনশীল জগৎকে জগৎ বলে না দেখে ঈশ্বরের পবিত্র লীলাভূমি বলে দেখায় উপকারিতা আছে। 'ঈশা বাস্যম্ ইদম্ সর্বম্'—ঈশোপনিষদের এ মন্ত্রের শুচি-শুভ্র আলোকে আমাদের বুদ্ধি ও বোধিকে পরিশুদ্ধ ও প্রদীপ্ত করা দরকার। নারী বা কামিনীকে ভোগের সামগ্রী জ্ঞান না ক'রে পূজার সামগ্রী ও জীবনদীপ্তির সহায়রূপে গ্রহণ করা উচিত। অনাদর ও ঘৃণার পরিবর্তে দিব্যদৃষ্টি প্রসারিত ক'রে হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করা প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশ্বের সমগ্র নারীমূর্তিতে দেবীবুদ্ধি করতে উপদেশ দিয়েছেন। ভীতিপূর্ণ মন নিয়ে নারীমাত্রকে বিভীষিকা ও অন্তরায় মনে করা অধ্যাত্মসাধনার অনুকূল নয়। পলায়নবৃত্তি কখনো মনের রূপান্তর সৃষ্টি করতে পারে না, বরং অভ্যাস করতে হয়—মনে যাতে পবিত্র ভাব ও পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তাই সমগ্র চিন্তায় ও জ্ঞানে রূপান্তর আনা প্রয়োজন। 'মোড় ফিরিয়ে দে'—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এ বাণীকে আমাদের চিন্তায় ও কর্মে পরিণত করা উচিত। সচ্চিন্তা ও অধ্যাত্মসাধনার দ্বারা জীবন-চিন্তা ও জীবনদৃষ্টিকে পরিশুদ্ধ করার সার্থকতা অনেক বেশী। বাধা ও অন্তরায় ভাবতে ভাবতে বাধা ও অন্তরায়ের সংস্কার মানুষের মনে দৃঢ় হয়ে বসে, পরিবর্তন ও পরিষ্কার করার চিন্তা তখন আর মনে আসে না। তাই দৃষ্টিই আসল। মায়াবদ্ধ দৃষ্টি সংসারকে বিষাক্ত করে ও সংসারকে বন্ধনে পরিণত করে, আর মায়ামুক্ত জ্ঞানদীপ্ত দৃষ্টি সংসারকে চৈতন্যে রূপান্তরিত ক'রে মুক্তি-আস্বাদনের ক্ষেত্র রচনা করে। সকল কথার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ বিচিত্রভাবেই হতে পারে, কিন্তু তত্ত্বগত ও কেন্দ্রগত সংস্কারমুক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সার্থকতাই গ্রহণীয় ও আদরণীয়। মন থেকে 'কামিনী বন্ধন' এ ভাব দূর হলেই মন পরিশুদ্ধ হয় এবং সেই পরিশুদ্ধ মনে ঈশ্বরের মাতৃভাব প্রতিফলিত হয়। 'কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ হলে ঈশ্বরে মন যায়, মন গিয়ে লিপ্ত হয়' শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এ বাণীর মর্মকথাই তাই। ঈশ্বরে মন যাওয়া ও ঈশ্বরে মন লিপ্ত হওয়া দুটি কথা আসলে এক। মন বস্তুর আকারে আকারিত (তদাকারকারিত) না হলে মনের রূপান্তর হয় না। ব্রহ্মাকারে

আকারিত মন, আর মায়িক মন এক নয়। তবে মনবস্তু এক, কিন্তু নানা রঙে ও ভাবে রঞ্জিত হয়—এই মাত্র। জ্ঞানচিন্তায় মন জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়।

'কাঞ্চন'-সম্পর্কেও ঐ এক কথা। টাকাকড়ি, মান-মর্যাদা, সুখ-সাচ্ছন্দ্য সকল-কিছুই কাঞ্চনের শ্রেণীভুক্ত। স্বার্থকেন্দ্রিক মন পার্থিব অর্থকে পরমার্থ ভাবে, কিন্তু নিঃস্বার্থ ঈশ্বরপ্রেমিক মন ঈশ্বরকেই পরমার্থ বস্তু বলে চিন্তা ও গ্রহণ করে। চিন্তা করাতেই পার্থক্য। দৃষ্টির মধ্যেই ভেদ। কর্মের সংসারে অর্থের প্রয়োজন আছে সত্য, কিন্তু তাই বলে ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয়ে টাকাকেই জীবনের ইহসর্বস্ব চিন্তা করায় ভুল-ত্রুটি আছে। পার্থিব সম্পদ ও সামগ্রী অনিত্য, কেননা তারা আজ আছে, কাল থাকে না, কিন্তু ভ্রমে যদি তাদের নিত্য বলে মনে করি, তবে তার নাম হয় মিথ্যাজ্ঞান। আসক্তি ও নিরাসক্তি দুটি কথা। 'আমার আমার' এ বুদ্ধিযুক্ত আসক্তি ও স্বার্থের কামনাই মানুষকে সংসারে আবদ্ধ করে, আর ঈশ্বরপ্রেমলোলুপ কামনা ও নিরাসক্তি মানুষকে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত করে। বন্ধন ও মুক্তি তাই মনের সৃষ্টি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: 'যিনিই বদ্ধ, তিনিই মুক্ত হতে পারেন।' মুক্তির ইচ্ছাই মুক্তির আশীর্বাদ নিয়ে আসে, আর 'আমি বদ্ধ' এ চিন্তা দিনরাত করলে মানুষ বদ্ধ হয়, ভ্রান্ত হয়। বদ্ধ কিনা বন্ধন—মায়ায় বন্ধন। বিচারী মন যখন অহরহঃ বিচার ক'রে নিশ্চয় করে যে, আমি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব, আমি বদ্ধ নই, তখন যথার্থবুদ্ধি বা জ্ঞান মনের মালিন্য ও ভ্রম দূর ক'রে মনকে পরিশুদ্ধ করে। মন তখন ঈশ্বরে লিপ্ত হয় অর্থে মন তখন ঈশ্বরময় হয়।

প্রকৃত কথা তাই যে, সংসারের সকল সামগ্রী ও সম্পদকেই আমরা 'আমার' বোলে জ্ঞান করি ও মায়ায় আবদ্ধ হই। প্রাণপ্রতিম পুত্রকে 'আমার' বলে মনে ক'রে ভালবাসি, কিন্তু কালের কবলে সেই পুত্র যখন জগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ করে তখন দুঃখে ও বিষাদে আমরা অবসন্ন হই। মহাকাল মৃত্যুরূপী, আবার অমৃতরূপীও। মহাকাল বা কালের শরণাপন্ন হলে, তিনি অব্যাহতি দেন বন্ধন থেকেও। মনে করার উপরে তাই সব-কিছুই নির্ভর করে। মনে করার নামই আসক্তি, আর মনে না করার নাম অনাসক্তি। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাই বলতেন: 'আশা হি পরমং দুঃখং, নৈরাশ্যং পরমং সুখম্'। আশা করলে আশা যদি প্রতিহত হয়

তাহলেই দুঃখ আসে, আর আশা যদি না করি তাহলে কোন কাজ করা বা না করার, কোন কিছুর থাকা বা না থাকার জন্য মনে আর দুঃখ হয় না। সুতরাং মন ও আসক্তিই সংসারে বন্ধন ও সব-কিছু।

আবার মনেই পাপ ও মনেই পুণ্য। মন যদি ঈশ্বরাভিমুখী হয়, মন যদি 'আমার আমার' আসক্তি থেকে নির্মুক্ত হয়, তাহলে দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে মানুষ মুক্তি পায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: 'ঈশ্বর থেকে বিমুখ হলেই বদ্ধ।' জ্ঞান ও অজ্ঞান—ঈশ্বর ও জগৎ সাধারণভাবে পরস্পর-বিরুদ্ধ। আচার্য শঙ্কর অধ্যাসভাষ্যে বলেছেন: 'তমঃপ্রকাশবদ্‌ বিরুদ্ধঃ'। আলোক ও অন্ধকার যেমন বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন, তেমনি জ্ঞান ও অজ্ঞান—ঈশ্বর ও জগৎ পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধ। উপনিষৎ ও বেদান্ত বারবার বলেছে, ঈশ্বরই সব হয়েছেন; ঈশ্বরই বিশ্বের সকল-কিছুকে আবৃত ক'রে রেখেছেন নিজের প্রকাশরূপ চৈতন্যের দ্বারা। ঈশ্বর জীবে ও জগতে পরিব্যপ্ত অর্থে ঈশ্বরই জীব ও জগতের রূপ ধারণ করেছেন। উপনিষৎ বলেছে: "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশাৎ,"—বিশ্বচরাচর সৃষ্টি ক'রে প্রতিটি প্রাণীতে ও পদার্থে ঈশ্বর নিজেই প্রবেশ করেছিলেন। প্রবেশ অর্থে তদনুরূপ হওয়া। অনুপ্রবেশ শব্দটির অর্থ—আগে সৃষ্টি করলেন ও পরে সৃষ্টিরূপ হলেন। প্রবেশ করার অর্থ সগুণ-ব্রহ্ম স্বরূপে এক অদ্বিতীয় মায়াহীন ও পরিশুদ্ধ হলেও মায়ার জন্য বিকাশে বহু বা বৈচিত্র্য হন। মায়া স্বীকার করলেই ব্রহ্মের বহু ও খণ্ড রূপ স্বীকার করতে হয়, আর মায়া স্বীকার না করলে এক ও অখণ্ড। মায়াই dividing category—কিনা বিভাগকারী গুণ বা পদার্থ। আচার্য শঙ্কর বৈচিত্র্যকে তাই মিথ্যা ও অসৎ বলেছেন। যথার্থজ্ঞানের উদয়ে অযথার্থ (মিথ্যা) জ্ঞানের রূপান্তর ঘটে। সুতরাং এক সময়ে থাকে, আর এক সময়ে থাকে না যে বস্তু তা নিত্য ও চিরস্থায়ী নয়, তা অনিত্য বা মিথ্যা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সিদ্ধান্ত এখানে একটু অভিনব। তিনি বলেছেন, তিনি (ঈশ্বর বা ব্রহ্ম) সব-কিছুই হতে পারেন, আবার কিছুই হন না। সুতরাং এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের রূপ বহু, আবার এক। তিনি সগুণ ও নির্গুণ, সাকার ও নিরাকার, আবার সগুণ-নির্গুণের অতীত। তিনি সাংখ্যের চতুর্বিংশতি (পঞ্চবিংশতি) তত্ত্ব হ'তে পারেন, তাছাড়া আরও কত-কিছু হতে পারেন। মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি। আবার অদ্বৈতবেদান্ত

নিঃশক্তিক ব্রহ্মও স্বীকার করে। শক্তি সেখানে ব্রহ্মে একাকার। শক্তি ও শক্তিমান তখন এক ও অভেদ। ভ্রমের জন্য ব্রহ্মকে মায়া ও জগৎ বলি, কিন্তু ভ্রম দূর হলে ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলেই উপলব্ধি হয়। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: 'ঈশ্বর থেকে বিমুখ হলেই বদ্ধ।' এ 'বিমুখ'-শব্দের অর্থ wrong বা false knowledge, অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান। ভুল বা মিথ্যাজ্ঞান দূর হলে বস্তুর স্বরূপের উপলব্ধি হয়। তাই বিমুখ হওয়ার নাম 'ভুলে যাওয়া' বা ভ্রান্তিজ্ঞান। ভ্রান্তিজ্ঞানই যত অনর্থের মূল। সুতরাং ঈশ্বর বা আত্মার স্বরূপকে মনে রাখলে, তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে মনে আর দুঃখ ও বিভেদ সৃষ্টি হয় না। 'বিমুখ'-শব্দকে বিস্মৃতিও বলে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এখানে নিকৃতি বা দাঁড়িপাল্লার উদাহরণ দিয়েছেন। নিকৃতির একদিকে জীব-জগৎ ও অন্য দিকে ঈশ্বর বা আত্মা; একদিকে যথার্থ বা সত্যজ্ঞান ও অপরদিকে অযথার্থ বা মিথ্যাজ্ঞান। কামিনী-কাঞ্চনকে স্বার্থের ও ভোগের বস্তু বলে মনে করলেই ভ্রান্তি ও বিভেদ জ্ঞান সৃষ্টি হয়, আর নিরাসক্তভাবে তাদের পবিত্র মনে করলে মনে আর ভ্রান্তি সৃষ্টি হয় না।

পূর্বেই বলেছি যে, 'আমার আমার' মমত্ববোধ বা অহং-আসক্তি বন্ধন, আর নিরাসক্তিই মুক্তি। বাসনাই বন্ধন, আর নির্বাসনা বা ফলকামনাহীন বাসনা মুক্তি। অধ্যাত্মসাধনার প্রয়োজনীয়তা সত্য ও পবিত্র দৃষ্টিকে অক্ষুণ্ণ রাখা। তাই সত্যকে মিথ্যা বলে যেন আমরা গ্রহণ না করি। ভ্রান্তির জন্যই সকল মানুষকে, সকল প্রাণীকে ও বিশ্বসংসারকে আমরা ঈশ্বর থেকে ভিন্ন বলে মনে করি। সুতরাং ভ্রান্তিই ভেদজ্ঞানের কারণ। তাই কারণ দূর হলে কার্য-সম্বন্ধে ভ্রমও দূর হয়। কামিনী-কাঞ্চন, জীব-জগৎ, মন-বুদ্ধি এ সকলকে যদি ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত বলে জ্ঞান করি, তাহলে আর বন্ধন সৃষ্টি হয় না। তখন মনে হয়, আমরা চিরমুক্ত আত্মারই স্বরূপ, কেবল অবিবেক ও ভুলের জন্য নিজেদের জন্ম-মরণশীল বলে মনে করি। তাই উপনিষৎ, বেদান্ত ও সকল শাস্ত্র মনের ভ্রান্তিকে দূর করতে ও আত্মাকে আপন স্বরূপ বলে জ্ঞান করতে বলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীর তাৎপর্য তাই। তিনি কামিনী-কাঞ্চনকে 'নরকস্য দ্বারম্' বোলে ঘৃণা ও পরিত্যাগ করতে বলেন নি, বলেছেন আসক্তি, স্বার্থপরতা ও ভ্রান্তিজ্ঞানকে দূর করার জন্য। চিরকুমার সন্ন্যাসীদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা সংসারেই আসক্ত নন, সুতরাং

'নারী সহচারিণী' একথার কোন অর্থ তাঁদের পক্ষে খাটে না। নারীমাত্রেই তাঁদের কাছে পূজ্যা ও শ্রদ্ধার সামগ্রী। আসলে সত্যজ্ঞান এলে মুক্তি, আর মিথ্যাজ্ঞানে ভ্রান্তি ও বন্ধন। তাছাড়া গৃহবাসী ও বনবাসী উভয়ের মধ্যে নারী বা কামিনী যে আদ্যাশক্তিরূপিণী এ জ্ঞান এলে তবেই বন্ধনমুক্তি আসে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিক্তির উদাহরণটি তাৎপর্যপূর্ণ। সাম্য বা সমতায় চাঞ্চল্যের লেশ নাই, দুঃখ নাই, অনর্থ নাই। সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতির সাম্যাবস্থাকে কপিল মুনি সৃষ্টির অতীত অবস্থা বলেছেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা যখন নষ্ট (গুণক্ষোভ) হয় তখনই সৃষ্টি ও লীলার সূচনা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই মনকে সাম্যাবস্থায় রাখতে বলেছেন। অর্থাৎ ঈশ্বরেও মন থাকবে, আবার সংসারের দিকেও থাকবে—তা নয়, সংসারে মন থাকবে সংসারকে ঈশ্বরের লীলাভূমি জ্ঞান ক'রে। তবে সাধারণভাবে আমরা জানি, ঈশ্বর ও সংসার, কাম (আসক্তি) ও প্রেম (নিরাসক্তি), ভোগ ও ত্যাগ পরস্পর পরস্পরে পৃথক। এ ভেদবুদ্ধি আসে অজ্ঞানে, জ্ঞানে ভেদবুদ্ধি আসে না। ঈশ্বরদর্শন বা আত্মোপলব্ধি হলে শত্রু-মিত্রে, কাম-প্রেমে, অন্ধকার-আলোকে সংসারে-স্বর্গে ও বন্ধনে-মুক্তিতে সমজ্ঞান হয়। ব্রহ্মানুভূতির পর ব্রহ্মজ্ঞানী জ্ঞানদৃষ্টিতে দর্শন করেন যে, এক চৈতন্যই বিশ্বের সব-কিছু হয়েছেন; বিশ্বচরাচরের উচ্চ-নীচ সকল প্রাণীতে ও পদার্থে চৈতন্যেরই স্থিতি, প্রকাশ বা স্ফুরণ—সর্বব্রহ্মময়ং জগৎ। তখন ঈশ্বর বা ব্রহ্মবস্তু থেকে আর কাউকে ও কোন বস্তুকে পৃথক বলে জ্ঞান হয় না। নিক্তির কাঁটা তখন কোনদিকে না হেলে সমান থাকে। ভোগ ও ত্যাগকে—সংসার ও ভগবানকে তখন আর আলাদা বলে মনে হয় না। তখন অনুভব হয়, বিশ্বচরাচর ব্রহ্মসমুদ্রেই জারিত বা নিমজ্জিত; এক ঈশ্বরই সকল মূর্তিতে প্রকাশমান। এ অনুভূতি ব্রহ্মানুভূতি না হলে আসে না। এ একাত্মানুভূতি ও সমদর্শনের নামই ব্রহ্মজ্ঞান। এ সমদর্শনে কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি সকল পশু, পক্ষী ও এমন কি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গও চৈতন্যের পরমপ্রকাশ ব'লে উপলব্ধি হয়। ভেদবুদ্ধিও থাকবে, আবার সমদর্শন-রূপ অভেদবুদ্ধিও হবে—তা হয় না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

॥ আত্মসমর্পণ ও রামের ইচ্ছা ॥

[সংসার ত্যাগ কি দরকার ?]

"মহিমা। তাঁর উপর মন গেলে আর কি সংসার থাকে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি ? সংসারে থাকবে না তো কোথায় যাবে ? আমি দেখছি—যেমন থাকি, রামের অযোধ্যায় আছি। এই জগৎ-সংসার রামের অযোধ্যা।

আর সংসারে থাকো ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে।

[সংসারে আত্মসমর্পণ—**রামের ইচ্ছা**]

সংসারে রেখেছেন—তা কি করবে ? সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করো—তাঁকে আত্মসমর্পণ করো, তাহলে আর কোন গোল থাকবে না। তখন দেখবে—তিনিই সব করছেন ! সবই রামের ইচ্ছা।"

—শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ (১৩৬৬), পৃঃ ২১৭—২১৮

প্রশ্ন হোল—'সংসার ত্যাগ কি দরকার ?' কিন্তু এ প্রশ্নই বা ওঠে কেন মনে ? ত্যাগ আমরা সে বস্তু করি—যা অপ্রীতিকর, অকল্যাণকর ও বেদনাদায়ক। সংসারকে শাস্ত্র মায়িক পদার্থ বলে। বাসনায় আসক্ত ও আবদ্ধ ক'রে মায়া। মায়াই ঈশ্বর থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। এ দূরই বন্ধন ও বিস্মৃতি। ঈশ্বর থেকে মানুষকে পৃথক করে, অথবা উভয়ের মধ্যে ভেদজ্ঞান সৃষ্টি করে মায়া। মোটকথা সংসারের ভোগাসক্তিই আমাদের বিমুখ করে ব্রহ্মানুভূতি থেকে। কিন্তু সংসার আমরা বলি কাকে ? যা সর্বদাই চলমান তাই সংসার। চলমানতাকেই বলি সংসার। বস্তুমাত্রেরই

স্থিতি-বৃদ্ধি-ক্ষয় প্রভৃতি ছ'টি বিকার আছে, আর যা বিকারী, তাই পরিবর্তনশীল ও জ্ঞানদৃষ্টিতে অনিত্য ও অসত্য। অসত্যের নামই মিথ্যা। মিথ্যা কিনা একরূপে যা বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ তিন কালে থাকে না। এ 'থাকে না'-কেই 'থাকে' বা চিরস্থায়ী মনে করে ও তদনুযায়ী ব্যবহার করে মায়াসক্ত মানুষ। জ্ঞানীর কাছে 'থাকে না'-র অর্থ ভিন্ন। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে 'থাকে না'-তত্ত্বটি এভাবে প্রকাশ পায় যে, নিত্য ব্রহ্মসত্তাব্যতীত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন বস্তুরই সত্তা ও প্রকাশ থাকে না। জ্ঞানী মনে করেন, ব্রহ্মের সত্তায় ও প্রকাশেই বিশ্বের সকল বস্তুর সত্তা (থাকা) ও প্রকাশ (প্রতীতি)। অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে এক সন্মাত্র ব্রহ্মসত্তাই সত্য ও নিত্য, আর সকল-কিছু তাঁর প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও নামে। এটি অনুভূতির বিষয়। বৌদ্ধিক দৃষ্টিতে ও শুধু শাস্ত্রজ্ঞানে এ মহানুভূতি আসে না।

'সংসার ত্যাগ'-শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি? ত্যাগ আমরা তাকে করি যা আমাদের থেকে ভিন্ন ও যা অকল্যাণকর। কিন্তু সংসার আমাদের কি অনিষ্ট করে? বেদান্তে সংসার মায়ার নামান্তর। মায়া মানুষকে ভুলিয়ে রাখে, মানুষের স্বরূপকে জানতে দেয় না, সংসারও তেমনি। সুতরাং সংসার ত্যাগ করার অর্থ মায়াকে ত্যাগ করা। আত্মজ্ঞানীর কাছে সংসার ঈশ্বরের লীলাভূমি। তাই তার পক্ষে সংসার ত্যাগ করার কোন প্রশ্নই উঠে না। সাধারণ মানুষ ভ্রমে ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয়, সংসারে আবদ্ধ হয়, আর ঈশ্বরই যে বিশ্বসংসারের কারণ একথা ভুলে যায়। ভুলে যাওয়ার নাম ভ্রম। ভ্রম ও ভেদজ্ঞান একই। ভেদজ্ঞান চলে যাওয়ার নাম সত্যজ্ঞানের প্রকাশ। সত্যজ্ঞান হলে সংসারকে আর মিথ্যা বলে মনে হয় না। তখন জনক রাজার মতো এদিক ওদিক দু'দিক (সংসার ও ঈশ্বর) রেখে দুধের বাটি (পরমানন্দ) খাওয়া (উপভোগ করা) যায়।

সাধারণ বুদ্ধি নিয়েই ভক্ত মহিমাচরণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : 'তাঁর (ঈশ্বরের) উপর মন গেলে (ঈশ্বরে মন তদ্‌গত হলে) সংসার কি থাকে?' এটি মহিমাচরণের সংশয়। শুধু মহিমাচরণের নয়, অঘটনঘটনপটিয়সী মায়ার সংসারে যারাই থাকে তাদের সকলের মধ্যে এ সংশয় আসে মুক্তি ও বন্ধন দুটি সীমারেখাকে স্মরণ ক'রে। ঈশ্বরে মন তদ্‌গত হলে 'সংসার থাকে না' বলতে সংসারই সব, ঈশ্বর কিছু নয়—এরকম ভুলজ্ঞান

দূর হয়। এসব কথা শুনে বিস্মিত হয়ে মহিমাচরণ বললেন: 'সে কী? সংসার থাকবে না তো যাবে কোথায়?' আশঙ্কাটি ঠিক এ রকম যে, অবিদ্যার নাশ ও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশ হলে সংসার মিথ্যা হয়, সুতরাং সংসার থাকে না—এটাই সাধারণ ও তথাকথিত পণ্ডিতদের অভিমত। তাঁরা বলেন, ব্রহ্মজ্ঞানের পর সংসার—ঘর, দ্বার, জানালা, চেয়ার, টেবিল সমস্ত পার্থিব বস্তু শূন্যে উড়ে যায়, থাকে মাত্র ব্রহ্ম। এ কথা কিন্তু মোটেই ঠিক নয়। ব্রহ্মজ্ঞানের অনুভূতি হলে অজ্ঞান থাকে না—যেমন আলোকের প্রকাশে অন্ধকার থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞানকে প্রকাশরূপ আলোকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এজন্য যে, অজ্ঞান মানুষকে ভ্রমে ফেলে, সংসারবন্ধনে আবদ্ধ করে, তার সত্যকার স্বরূপ জানতে বা বুঝতে দেয় না, কিন্তু জ্ঞানের প্রকাশ হলে সেই ভ্রম দূর হয়। তখন শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যে আত্মার প্রকাশে প্রকাশশীল—এ তত্ত্বের উপলব্ধি হয়। অবিদ্যার অন্ধকারে আত্মার সত্তা ও স্বরূপ আবৃত থাকে—যেমন আকাশে সূর্য কিরণ দেয়, কিন্তু মেঘে সূর্য ঢেকে থাকে বলে মনে করি সূর্য নাই, কিন্তু মেঘ সরে গেলে পূর্বের মতো আবার সূর্যের প্রকাশ হয়। বেদান্ত এ উদাহরণই দিয়েছে। বেদান্ত বলে, চিরপ্রকাশশীল আত্মাকে কেউ প্রকাশ করতে পারে না, বরং 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'—তার প্রকাশেই বিশ্বচরাচরের সকল-কিছুর প্রকাশ ও জ্ঞান হয়। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশ ও উপলব্ধির অর্থ স্বয়ং-প্রকাশ ব্রহ্ম নিজের অবিনশ্বর ও মহিমাময় সত্তায় সর্বদা প্রকাশমান থাকেন। অজ্ঞানের আবরণ বিবেক-বিচারের আলোকে দূর হয়। যদিও অজ্ঞানের আবরণ কাল্পনিক, কিন্তু কাল্পনিক হলেও তা একেবারে যে কিছু নয়, তা নয়। অজ্ঞান আছে—কি নাই এ সম্পর্কে বেদান্ত বলেছে, অজ্ঞান সৎ নয়, কেননা তাহলে সর্বদাই অজ্ঞানের অনুভব হোত, অথচ ব্রহ্মজ্ঞানের অনুভবের পর অজ্ঞান থাকে না, তখন অজ্ঞান জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। তারপর অজ্ঞান একেবারে অসৎ নয়। অজ্ঞান অসৎ নয় অর্থে বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের পুত্র ও আকাশ-কুসুমের (খ-পুষ্পবৎ) মতো একেবারে কাল্পনিক নয়, কারণ তাহলে অজ্ঞানের অনুভব কোনদিনই হোত না, অথচ অজ্ঞানের অনুভব হয়, যেমন বলি—আমরা বুঝি না, জানি না। আবার অজ্ঞান সদসৎ (সৎ ও অসৎ উভয়ই) নয়, কেননা তাহলে এক সময়ে অজ্ঞানের অনুভব হোত, আর

এক সময়ে তার অনুভব হোত না। আসলে অজ্ঞান হ্যাঁ-না এ রকমটি নয়। তাই অদ্বৈতবেদান্তে অজ্ঞানকে সৎ, অসৎ ও সদসতের অতীত অনির্বচনীয় বলা হয়েছে। অনির্বাচনীয় বলতে বাক্য দিয়ে বা বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু তাহলেও 'যদ্‌কিঞ্চিৎ ইতি বদন্তি'—অজ্ঞান কিছু যে একটা আছে পদার্থ তা স্বীকার করতে হবে, নইলে ভ্রম কোনদিন কারো হোত না, আর আত্মজ্ঞানের প্রকাশে অজ্ঞানেরও নাশ বা রূপান্তর হোত না।

এই যে অজ্ঞানের নাশ, এ নাশের অর্থ—যা অজ্ঞানে না-বোঝা ছিল, তা জ্ঞানের প্রকাশে বোঝা হয়। বেদান্তে তাই অজ্ঞানকে মিথ্যাপ্রত্যয় বা ভ্রমজ্ঞান বলা হয়েছে। ভ্রমে দড়িকেঁ দেখে সাপের যে প্রতীতি ও ভয়, তা দূর হয় সত্যকার দড়ির জ্ঞান হলে। যখন দড়িকে দড়ি বলে যথার্থজ্ঞান হয় (জ্ঞান ফিরে আসে) তখন সাপ যায় কোথায়? তখন দড়িতে সাপ বলে যে ভুলজ্ঞান তা দূর হয় মাত্র। তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধি হলে সংসারকে যে নিত্য বলে জ্ঞান ছিল সে ভ্রমজ্ঞান দূর হয়। সংসার তখন ব্রহ্মসত্তায় পর্যবসিত হয়। অজ্ঞান তখন জ্ঞানে—অবিদ্যা বিদ্যায় রূপান্তরিত হয়। সুতরাং জ্ঞানের (আত্মজ্ঞানের) পর সংসার থাকে না অর্থে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন প্রতীত যে সংসার সেই ভেদজ্ঞান ভ্রমের নাশ হয়, সংসার তখন থাকে 'রামরাজ্য'-রূপে, অর্থাৎ ব্রহ্মেরই অভিন্ন প্রকাশরূপে। এ প্রতীতি কল্পনার বস্তু নয়। এ জ্ঞান যুক্তি-তর্ক ও শাস্ত্রজ্ঞান দিয়ে বোঝা যায় না। শাস্ত্র জ্ঞানের জ্ঞাপক বা নির্দেশক মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞান নিজে নিজেই প্রকাশিত হয়। সুতরাং জ্ঞানের পর সংসার থাকে অর্থে সংসার থাকে ঈশ্বর বা ভগবানের সত্তা ও লীলাভূমিরূপে। থাকে ব্রহ্মচৈতন্য থেকে অভিন্নরূপে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "সংসার থাকবে না তো যাবে কোথায়?" আত্মার সত্তা যখন উপলব্ধি হয় তখন সংসারের মিথ্যাসত্তা পৃথকভাবে থাকবে কোথায়? শ্রীরামকৃষ্ণদেব রামের (আত্মারামের) অযোধ্যার (জ্ঞানরাজ্যের) উদাহরণ দিয়েছেন। শোনা যায়, ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের সময়ে সকলেই স্বর্গরাজ্যে বাস করতো। তখন প্রজার সুখেই ছিল রাজার সুখ। প্রজাদের উপর তখন অন্যায় অত্যাচার হোত না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব উদাহরণটিকে আরও পরিষ্কার করার জন্য যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ থেকে একটি গল্পের অবতারণা ক'রে বলেছেন, 'এই জগৎ-সংসার রামের অযোধ্যা (স্বর্গরাজ্য)। রামচন্দ্র জ্ঞান লাভ করার পর গুরুকে

(বশিষ্ঠদেবকে) বললেন—'আমি সংসার ত্যাগ করবো।' দশরথ তাঁকে বুঝানোর জন্য বশিষ্টদেবকে পাঠালেন। বশিষ্টদেব দেখলেন রামের তীব্র বৈরাগ্য, সুতরাং বললেন, 'রাম, আমার সঙ্গে বিচার করো, তারপর সংসার ত্যাগ করো'। বশিষ্টদেব বললেন: 'জিজ্ঞাসা করি—সংসার কি ঈশ্বর ছাড়া? তা যদি হয়, তুমি সংসার ত্যাগ করতে পারো।' রাম দেখলেন, ঈশ্বরই জীব-জগৎ সব-কিছু হয়েছেন, তাঁর (ঈশ্বরের) সত্তাতেই সমস্ত-কিছু সত্য বলে বোধ হচ্ছে। তখন রামচন্দ্র চুপ ক'রে থাকলেন।

যথার্থতত্ত্বের সন্ধান পেলে বিশ্বের বিবেক-বিচারবান সকল মানুষই চুপ ক'রে থাকেন। সত্যতত্ত্ব-উপলব্ধির রাজ্য চুপ করারই রাজ্য। উপনিষৎ বলেছে, সেখান থেকে বাক্য ও মন ফিরে আসে—'যতো বাচাঃ নিবর্ত্তন্তে'। ব্রহ্মবস্তু বাক্য-মনের অতীত—'অবাঙ্‌মনসোঽগোচরম্'। এরই নাম Silence বা Absolute Silence,—নীরবতা বা একান্ত নীরবতা। জার্মান দার্শনিক একৃহার্ট ও প্লটিনাশ দু'জনেই বলেছেন, ঈশ্বরের বাণী নিঃশব্দতার মধ্যেই শোনা যায় (God whisphers in the ears in silence)। মরমী ফ্লাকাশও এ silence-এর কথা বলেছেন। সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ ক'রে মুনি ও তপস্বীরা তাই নীরবে ধ্যানমগ্ন হন ও আত্মার মহিমা উপলব্ধি করেন। সাধনার পথ ভিন্ন ভিন্ন। কেউ প্রত্যক্ষভাবে আত্মাকে উপলব্ধির মধ্যে ধরতে চান, কেউ বা ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ না ক'রে সত্য-শিব-সুন্দরের স্পর্শ পাওয়ার লুকোচুরি খেলা খেলতে চান, কিন্তু না-পাওয়ার অনির্বাচ্য আনন্দেই সকলে ভরপুর থাকেন।[১]

ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্র 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ' ধ্যান করা উচিত। ঈশ্বর বিশ্বচরাচরের অণু-পরমাণুতে অনুস্যূত। আমাদের সত্তা (থাকা) ও প্রকাশ (জ্ঞান) সর্বব্যাপক ঈশ্বর বা আত্মার সত্তা ও প্রকাশের উপরই নির্ভরশীল। ভ্রমের জন্য আমরা বিশ্ব-সংসারের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ও সকল পার্থিব বস্তুকে ঈশ্বর বা আত্মা থেকে পৃথক মনে করি; কেবল পৃথক ভাবি না চৈতন্যদৃষ্টিতে। কিন্তু জড়দেহকে চৈতন্য

১। রবীন্দ্রনাথের অভিমত যে, ইন্দ্রিয়ের রুদ্ধ ক'রে বৈরাগ্যের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করা যায় না। তিনি বলেছেন, বর্জন ক'রে নয়, সকল-কিছুকে বরণ ক'রে মুক্তি লাভ করা উচিত।

মনে ক'রে দেহের সেবাতেই আবার জীবন উৎসর্গ করি। তখন দেহাত্মবাদী হই ও বলি—knowledge or consciousness is the product of matter; অর্থাৎ মনে করি, প্রাণহীন জড়পদার্থ থেকে প্রাণ বা চৈতন্যের সৃষ্টি। অদ্বৈতবেদান্ত এই মনে করাকে ভ্রম, মিথ্যাপ্রত্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান (false knowledge) বলে। সুতরাং মিথ্যাজ্ঞান যখন সত্যজ্ঞানের আলোকে দূর হয় তখন সত্যজ্ঞানরূপ ব্রহ্মচৈতন্য পূর্বেও যেমন ছিলেন, পরেও তেমনি প্রকাশিত থাকেন, অনন্ত ভবিষ্যতের বুকেও তেমনি আবরণহীন ভাবেই স্বতঃপ্রকাশিত থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আরও একটি উপদেশ দিয়েছেন: "সংসারে থাকো ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে।" তিনি বলেছেন: "ঝড়ে এঁটো পাতাকে কখনও ঘরের ভিতর লয়ে যায়, কখনও আস্তাকুড়ে। হাওয়া যেদিকে যায়, পাতাও সেদিকে যায়। কখনও ভাল জায়গায়, কখনও মন্দ জায়গায়।" ঝড়ের এঁটো পাতা প্রাণহীন, সুতরাং শুকনো পাতার নিজের কোন কর্তৃত্ব থাকে না। পাতা তখন ঝড়ের বা বাতাসের কাছে আত্মসমর্পণ করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বক্তব্য এই যে, সর্বকর্তৃত্বহীন আত্মার উপলব্ধি হলে জ্ঞানদীপ্ত মানুষ আত্মগত, আত্মরতি ও আত্মক্রীড়ভাবে সংসারে থাকেন। তিনি সংসারেই থাকেন, কিন্তু সংসারের মোহে কোনদিন আবদ্ধ হন না। তিনি পাঁকাল মাছের মতো সংসারে থাকেন। পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু পাঁক তার গায়ে লাগে না। জ্ঞানীর শরীর থাকে, কিন্তু শরীরের মোহে কোনদিন তিনি মোহিত হন না। এ অবস্থার বর্ণনা ক'রে আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের (চতুর্থ সূত্র) ভাষ্যে বলেছেন, শরীর তখন অশরীর বলে জ্ঞান হয়, আর চিরমুক্ত শরীরী বা আত্মার দিকেই তাঁর দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ থাকে। এটি জীবন্মুক্তের অবস্থা। আচার্য শঙ্করের মতো শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁর অন্তরঙ্গপার্ষদগণও জীবন্মুক্তি স্বীকার করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "সংসারী যদি জীবন্মুক্ত হয়, সে মনে করলে অনায়াসে সংসারে থাকতে পারে। যার জ্ঞান লাভ হয়, তার এখান সেখান নেই, তার সব সমান। যার সেখানে আছে, তার এখানেও আছে" (শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১ম ভাগ, ১৩৬৬, পৃ ২১৯)। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ জীবন্মুক্তি, বিদেহমুক্তি ও ক্রমমুক্তি এ তিন রকম মুক্তির কথা স্বীকার করেছেন। অনেকে সর্বমুক্তি স্বীকার

করেন। বিদেহমুক্তির অর্থ শরীরের নাশ হলে তবেই আত্মানুভূতি হয়। সুতরাং মুক্তি অনেক রকমের। মণ্ডনমিশ্র, সর্বজ্ঞাত্মমুনি প্রভৃতি বেদান্তীদের অনেকে বিদেহমুক্তি স্বীকার করেছেন। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগ এ সকল পথেই মুক্তি লাভ করা যায়। তাই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র মুক্তির বর্ণনা করলেও চরমমুক্তির রূপ এক ও অভিন্ন। সেই চরমাবস্থায় ভেদজ্ঞান থাকে না, ছোট-বড়-জ্ঞান থাকে না, তখন ভেদবুদ্ধি দূর হয়ে সমজ্ঞান হয়। সেই মুক্তি (জ্ঞানের) অবস্থায়ও সংসার থাকে, সংসারের যাবতীয় বস্তু থাকে, সাধারণ মানুষের মতো আহার, বিহার, সকল ব্যবহার থাকে, থাকে না কেবল মোহ ও স্বার্থের আসক্তি, আর থাকে না আপন ও পর—বন্ধন ও মুক্তির ভেদবুদ্ধি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ অবস্থা বর্ণনা ক'রে একটু ভিন্নভাবে বলেছেন: "(মহিমাচরণের প্রতি) তোমাকে সংসারে ফেলেছেন—ভাল। এখন সেই স্থানেই থাকো। আবার যখন সেখান থেকে তুলে ওর চেয়ে ভাল জায়গায় লয়ে ফেলবেন, তখন যা হয় হবে" (কথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ১২৮)। 'তোমাকে সংসারে ফেলেছেন' বলতে ঈশ্বর আছেন ও সকলকে তিনি পরিচালনা করছেন। তিনিই কর্তা ও যন্ত্রী, আর আমরা যন্ত্র—এটি জীবনে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস থাকলে তবেই 'তিনি ফেলেছেন' এ জ্ঞান বা বুদ্ধি হয়। তখন ঈশ্বরের উপর মানুষ (সাধক) আত্মসমর্পণ করেন। আত্মসমর্পণ করার ফলে নিজের অহংভাব ও অহং-কর্তৃত্বের অভিমান তখন আর থাকে না। তখন 'নাহং নাহং, তুহুঁ তুহুঁ'—এ ভাব হয়। এটিও আসলে জীবমুক্তের বা সিদ্ধের অবস্থা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আবার বলেছেন: "[সংসারে আত্মসমর্পণ—রামের ইচ্ছা] সংসারে রেখেছেন, তা কি করবে? সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করো, তাঁকে আত্মসমর্পণ করো, তাহলে আর কোন গোল থাকবে না। তখন দেখবে, তিনিই সব করছেন; সবই রামের ইচ্ছা।" তারপর 'রামের ইচ্ছা'-গল্পটি ব'লে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সিদ্ধান্ত করেছেন: "সংসার করা, সন্ন্যাস করা—সবই রামের ইচ্ছা। তাই তাঁর উপর সব ফেলে দিয়ে সংসারে কাজ করো" (কথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ২১৯)।

'সংসারে কাজ করো' বলতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সংসারীদের সংসার ছাড়তে

বলেন নি, বলেছেন 'সংসার রামের অযোধ্যা—রামরাজ্য, ভগবানের লীলা-ভূমি'—এই চিন্তা করতে। রাম ঈশ্বর ও অযোধ্যা সর্ববন্ধনহীন মুক্তির অবস্থা। মোটকথা সংসার 'ঈশ্বরেরই সংসার, আমার নয়' এ জ্ঞান ক'রে 'পাকা-আমি' নিয়ে সংসারে সংসারী সাজতে উপদেশ দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব। 'আমার' ইচ্ছা ত্যাগ ক'রে 'তাঁর' ইচ্ছা বলতে হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা বললে মন ঈশ্বরাভিমুখী হয়। তখন আর স্বার্থবুদ্ধি থাকে না। পরার্থবুদ্ধি বা ঈশ্বরবুদ্ধিই তখন হৃদয়কে অধিকার করে। তখন চিত্ত (মন) শুদ্ধ হয় ও শুদ্ধচিত্তে আত্মচৈতন্য নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন। এ ভাব রাখাই সংসারে কর্তব্য। নৌকা জলের উপর ভাসে, কিন্তু নৌকার মধ্যে জল প্রবেশ করলেই মুশকিল,—নৌকা ডুবে যায়। সংসাররূপ স্বার্থবুদ্ধি যাতে আমাদের মধ্যে প্রবেশ না করে তার জন্য বিচারবুদ্ধি নিয়ে সংসার করতে হয়। সংসার করার অর্থ সংসারের সকল কর্ম করা—'সংসারে সংসারী সাজ, কর নিত্য নিজ কাজ, ভবের উন্নতি যাতে হয়'। এখানে ভবের বা সর্বজনের উন্নতি, শুধুই 'আমার' উন্নতি নয়। বনে-জঙ্গলে গিয়ে ভগবানকে ডাকা মন্দ নয়, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব জিজ্ঞাসা করেছেন, বন-জঙ্গল কি সংসার ছাড়া, আর সংসারও কি ঈশ্বর ছাড়া? স্বামী অভেদানন্দ মহারাজও বলতেন, তপস্যা করবে হরিদ্বারে বা হৃষিকেশে গিয়ে, কিন্তু এ (চঞ্চল) মন নিয়েই তো যাবে? যদি একান্ত যাও তবে এ চঞ্চল মনটাকে এখানে রেখে আর একটা মন (শুদ্ধ মন) নিয়ে তপস্যা করতে যাবে। মন একটাই। মন দোকানে বা বাজারে কেনা যায় না। যেই মন চঞ্চল, তাকে স্থির ও প্রসন্ন করতে হয়। মন যদি স্থির ও ভগবান্মুখী হয়, তবেই সে মন নিয়ে যেখানে হোক থাকা যায়, তখন স্থান ছাড়ার আর কোন প্রশ্ন ওঠে না। এটা স্বামীজী মহারাজদের সকলেরই অভিমত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অনুরূপ কথাই বলেছেন। মনকে স্থির ও ধ্যানমুখী ক'রে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করলে সেই মন নিয়ে সংসারে অরণ্যে যে-কোন স্থানে থাকা চলে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "যার সেখানে আছে, তার এখানেও আছে।" আত্মার মধ্যে কোন স্থান কাল নেই। আত্মজ্ঞান-লাভেরও স্থান কাল নেই। স্থান ও কাল—time and space-ই মায়া। কিন্তু চৈতন্য বা আত্মা মায়ার অতীত। চিত্ত যাঁর শুদ্ধ, চিত্ত যাঁর চঞ্চল নয়, চিত্ত যাঁর ঈশ্বরেই নিবদ্ধ, মুক্তির আকুলতা যাঁকে প্রবুদ্ধ ও ব্যাকুল

করে, তাঁর এখানে বা সেখানে কোনখানেই ভেদজ্ঞান থাকে না। ভেদজ্ঞানই অজ্ঞান। ভেদজ্ঞানই সংসার। সুতরাং ভেদজ্ঞান দূর করার অর্থ অজ্ঞান, ভেদবুদ্ধি বা সংসারজ্ঞানকে দূর করা। ভেদজ্ঞান যতক্ষণ পর্যন্ত থাকে, ততক্ষণ আত্মজ্ঞান হয় না। আত্মার স্বতঃপ্রকাশ রূপ যখন উপলব্ধি হয় তখন সংসার আর অবিদ্যার সংসার বলে মনে হয় না। তখন সংসার থাকে বিদ্যার সংসার-রূপে। আচার্য শঙ্কর বেদান্তসূত্রের ভাষ্যেও বলেছেন, অজ্ঞান ও অজ্ঞানের সংসার ততক্ষণ—যতক্ষণ না আত্মজ্ঞানের প্রকাশ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গেও জীবন্মুক্তির অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। কেশবচন্দ্রকে দেখে তিনি বলেছিলেন: "* * মানুষের যতদিন অবিদ্যার ল্যাজ না খসে ততদিন সংসার-জলে পড়ে থাকে। অবিদ্যার ল্যাজে খস্‌লে অর্থাৎ জ্ঞান হলে, তবে মুক্ত হয়ে বেড়াতে পারে, আবার ইচ্ছা হলে সংসারেও থাকতে পারে" (শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ২১৯—২২০)। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আবার বলেছেন: "যখন কেশব সেনকে বাগানে প্রথম দেখলুম, বলেছিলাম—'এরই ল্যাজ খসেছে'। সভাশুদ্ধ লোক হেসে উঠলো। হাসবারই কথা। অজ্ঞানীরা মর্মকথা না জেনে হাসে, কিন্তু জ্ঞানীরা হাসেন না, তাঁরা ভাবমুগ্ধ হন। জ্ঞানীরা সকল কথার মর্মোলব্ধি ক'রে জীবনকে আনন্দময় করেন। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই গল্প: 'একজন জীবন্মুক্ত পুরুষ বেহুঁস হয়ে পড়ে ছিল। ডাকাতেরা তাঁকে দেখে বড় ডাকাত বোলে মনে করলে, মাতালরা তাঁকে মাতাল বোলে মনে করলে, কিন্তু একজন জীবন্মুক্ত জ্ঞানী তাঁকে পরমজ্ঞানী ও সমাধিমগ্ন পুরুষ মনে ক'রে যথাস্থানে নিয়ে গেল। জ্ঞানী না হলে জ্ঞানীকে চেনা যায় না; অজ্ঞানী জীবন্মুক্তকে চেনে না। তাই সাধন চাই আত্মজ্ঞানরূপ মুক্তির আশীর্বাদ লাভ করার জন্য। মুক্তির আশীর্বাদ লাভ করলে মায়ার সংসার তখন ঈশ্বরের লীলাভূমি ও আনন্দের সংসার বলে মনে হয়।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

॥ ওঙ্কার ও নিত্যলীলাযোগ ॥

"(মহিমার প্রতি) শ্রীরামকৃষ্ণ। ওঁকারের ব্যাখ্যা তোমরা কেবল বল— অকার উকার মকার। মহিমাচরণ—অকার, উকার, মকার—কিনা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়।

আমি উপমা দিই ঘণ্টার টং শব্দ। ট-অ-অ-ম-ম্। লীলা থেকে নিত্যে লয়; স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ থেকে মহাকারণে লয়; জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয়। আবার ঘণ্টা বাজলো—যেন মহাসমুদ্রে একটা গুরু জিনিস পড়লো, আর ঢেউ আরম্ভ হলো। নিত্য থেকে লীলা আরম্ভ হোলো। মহাকারণ থেকে স্থূল, সূক্ষ্ম। কারণশরীর দেখা দিল; সেই তুরীয় থেকেই জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সব অবস্থা এসে পড়লো। আবার মহাসমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রেই লয় হলো। নিত্য ধরে ধরে লীলা। আবার লীলা ধরে ধরে নিত্য। আমি টং শব্দ উপমা দিই। আমি ঠিক এই সব দেখেছি। আমায় দেখিয়ে দিয়েছে—চিৎ-সমুদ্র, অন্ত নাই। তাই থেকে এই সব লীলা উঠলো, আর ঐতেই লয় হয়ে গেল। চিদাকাশে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আবার ঐতেই লয়। তোমাদের বইয়ে কি আছে অত আমি জানি না।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, (১৩৬৬,) পৃঃ ২২৭

প্রণবের ব্যাখ্যা মহামুনি পতঞ্জলি পাতঞ্জলদর্শনে বিশেষ ক'রে দিয়েছেন— 'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ'। 'তস্য' কিনা ব্রহ্মের। নির্গুণ ব্রহ্ম বাক্য-মনের অতীত, কোন ভাষা দিয়ে ব্রহ্মের সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। শব্দময় ভাষা তো দেশ-কালে সীমাবদ্ধ, সুতরাং অজ্ঞান দিয়ে জ্ঞানকে ক্যামন ক'রে জানা যাবে, বা

প্রকাশ করা যাবে! তাই ওঁকার শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপের একটা সাধারণ অর্থ দেওয়া সম্ভব। প্রণব বা ওঁকারকে তাই সগুণ-ব্রহ্ম বলে। সগুণ দিয়ে নির্গুণের ধারণা করা যায়। ওঁকারকে সগুণ-ব্রহ্ম বলে, নির্গুণ তার কারণ। কারণ-উপলক্ষিত ব্রহ্মে মায়ার লেশ নাই, সুতরাং তুরীয় ব্রহ্মে গুণ নাই। তাই ব্রহ্ম নির্গুণ ও মায়াবিহীন। মায়া থাকলেই বিকার ও পরিবর্তন, আর গুণ থাকলে গুণ সীমিত করে অখণ্ড চৈতন্যকে। তাই ব্রহ্মের যথার্থস্বরূপে এ সবের কোনটা নাই। ওঁকারকে কল্পনা করি প্রথমে অ-উ-ম দিয়ে। অ-উ ম তিনটি আদি-অক্ষর। যে-কোন শব্দ উচ্চারণ করতে গেলে অ-উ-ম শব্দ-তিনটির প্রয়োজন হয়। শব্দ উচ্চারণ করতে গেলে প্রথমে অ-অক্ষর দিয়ে শব্দের আরম্ভ, উ-কার শব্দে স্থিতি ও শব্দ পরিপুষ্ট হয় এবং ম-অক্ষরে বা মকারে শব্দের সমাপ্তি। সকল শব্দের ও বর্ণের গতি ঠিক করা হয় অ-উ-ম অক্ষর দিয়ে, তাই অ-উ-ম বা ওঁকার আদিশব্দ বা সকল শব্দের উৎস (source)।

মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য-উপনিষদে ওঁকারের স্বরূপ ও ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। বিশেষভাবে মুণ্ডক-উপনিষদে অ-উ-ম শব্দ-তিনটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি, স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ প্রভৃতি অবস্থার অতীত তুরীয় বা চতুর্থ পরমচৈতন্যকে মহাকারণ বলা হয়েছে। পুরাণে এবং উপনিষদেও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের উপমা দেওয়া হয়েছে অ-উ-ম অক্ষর-তিনটির পরিচয় দেওয়ার সময়ে। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা—'প্রজাপতি' (প্রজা—জীব-জগৎ ও তাদের পতি বা অধিপতি বা কর্তা—প্রজাপতি)। বিষ্ণু পালন ও রক্ষা করেন, সুতরাং বিষ্ণু (ব্যাপক-চৈতন্য—'ব্যাপকত্বাদ্ বিষ্ণুঃ') এবং মহেশ্বর শিব ধ্বংসের অধিকর্তা। মোটকথা সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশ সকল প্রাণী ও সকল পার্থিব পদার্থের পরিণতি। সকল পুরাণেই ব্রহ্মাকে প্রজাপতি ও স্রষ্টা বলা হয়েছে। অদ্বৈতবেদান্তেও তাই। তবে বর্ণনা ও ব্যাখ্যার মধ্যে তারতম্য আছে। বেদান্তের মতে, ঈশ্বরের (সবার উপর ঈশিতৃত্ব বা কর্তৃত্ব আছে বলেই ঈশ্বর) রূপ দুটি: একটি অব্যক্ত বা অব্যাকৃত ও অপরটি ব্যক্ত বা ব্যাকৃত—ইংরেজীতে যাকে বলে unmanifested and manifested। অব্যক্ত-ঈশ্বরে সকল প্রাণী ও পদার্থের সূক্ষ্ম সংস্কার সুপ্ত থাকে—যাকে সৃষ্টিবীজ বলে। সৃষ্টির বীজ ঈশ্বরে অব্যক্ত ও কারণাকারে থাকে, আর ঈশ্বরে সংস্কার বা সৃষ্টির বীজ ব্যক্ত

ব্যক্তভাবে বা কার্যাকারে থাকে। তাই অব্যক্ত-ঈশ্বরও ঈশ্বর এবং ব্যক্ত-ঈশ্বরও ঈশ্বর নামে পরিচিত। ব্যক্ত-ঈশ্বরকে ব্রহ্মা বা প্রজাপতি বলে। আবার বেদান্তে ঈশ্বর ও প্রজাপতি-ব্রহ্মাকে কারণ-ব্রহ্ম ও কার্য-ব্রহ্ম বলা হয়েছে। প্রজাপতি ব্রহ্মার চারটি মুখ চারদিকে অর্থাৎ সকল দিকে প্রসারিত। এটি সৃষ্টিচাঞ্চল্যের অভিব্যক্তি। রজোগুণের আধিক্য ব'লে ব্রহ্মার বর্ণ লাল।

পুরাণে ঈশ্বর ও ব্রহ্মার অপরূপ বর্ণনা আছে। পুরাণে ঈশ্বর নারায়ণ। নারায়ণ বেদান্তের দ্বিতীয় চিৎপ্রকাশ। নার্ + অয়ণ = নারায়ণ, অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বাবস্থাকে সাংখ্যদর্শনে সাম্যাবস্থার সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে সর্বদিক স্থির, ধীর, তরঙ্গহীন কারণসলিলে আবৃত ও সেই কারণসলিলে (মহাসমুদ্রে) সচ্চিদানন্দপুরুষ নারায়ণ শয়ণ ক'রে আছেন। 'শয়ণ'-শব্দটি সৃষ্টির চাঞ্চল্যহীন সম-অবস্থাকে (সাম্যাবস্থা) বুঝায়। মোটকথা নারায়ণে সৃষ্টির চেষ্টা নাই, তাঁতে সকল-কিছু বীজাকারে নিহিত থাকে। মহাপ্রকৃতি লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের পদসেবা করছেন। বেদান্তে এ তত্ত্বই বোঝানো হয়েছে এরূপে : ঈশ্বরে কারণরূপে মায়া আছে, কিন্তু ঈশ্বর মায়ার অধীন নন—মায়াধীশ। লক্ষ্মীদেবীর প্রণতি ও পদসেবা ঈশ্বরের নিকট মহাপ্রকৃতির অধীনতা ও আত্মনিবেদন ছাড়া অন্য-কিছু নয়। সুতরাং পুরাণের ব্যাখ্যা ও ধারণা অদ্বৈতবেদান্তের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে একেবারে ভিন্ন নয়। ব্যক্ত-ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মা ও প্রজাপতিরূপে বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেন এবং তিনি মায়ার অধীন।

সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি জড়া অর্থে প্রকৃতির নিজের কোন চৈতন্য ও কর্তৃত্ব নাই। সাংখ্যের প্রকৃতি স্বতন্ত্রা, অর্থাৎ পরমেশ্বর বা পুরুষের তা শক্তি নয়। তবে বিশ্ব সৃষ্টি করতে গেলে প্রকৃতিকে সাহায্য নিতে হয় চৈতন্যময় পুরুষের কাছ থেকে। সাংখ্যদর্শনে কপিল তাই পঙ্গু-অন্ধ-ন্যায়ের মাধ্যমে জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আনলেন চৈতন্যময় পুরুষকে, তাই বিশ্বসৃষ্টি হওয়াতে কোন বাধা থাকলো না। অদ্বৈতবেদান্তে প্রকৃতি বা মহাপ্রকৃতি (সাংখ্যের) বা লক্ষ্মীদেবী (পুরাণের) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ তিনগুণের সমষ্টি। সাংখ্যে কপিল বলেছেন, তিন গুণও যা, আর প্রকৃতিও তাই। তবে তিনটি গুণের সমতা বা সাম্য-অবস্থার নাম প্রকৃতি। রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে স্থিতি ও পালন এবং তমোগুণে লয় বা বিনাশ। রজোগুণে প্রজাপতি ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণে বিষ্ণু ও

তমোগুণে শিব বা মহেশ্বর। এই মহেশ্বর পরমতত্ত্ব, কেননা এ তত্ত্বে লয় হওয়ার নাম ব্রহ্মনির্বাণ। ব্রহ্মনির্বাণ-রূপ মুক্তি সকলের কাম্য। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অবস্থা বা পরিণামগত ভাব স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। স্থূল বা জাগ্রত-অবস্থা প্রকৃতির ব্যক্ত বা প্রকাশ অবস্থা। স্বপ্ন সূক্ষ্ম, কেননা স্থূল-বিষয়ের সংস্কার সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম-সংস্কার কারণে লয় হয়। এই লয়ের অবস্থা শূন্যতা বা 'নাথিঙ্‌নেস' নয়, এটি কারণসত্তার অবস্থা বা 'সাচ্‌নেস'। কপিল একথা আরও পরিষ্কার ক'রে বলেছেন : নাশ বা লয়ের অর্থ কারণে ফিরে যাওয়া। অর্থাৎ যে অব্যক্ত অবস্থা থেকে প্রকাশিত বা ব্যক্ত হয়েছিল সেই ব্যক্ত অবস্থা আবার অব্যক্ত-অবস্থায় ফিরে যায়। গীতায় এ অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে এভাবে,

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।

গীতায় 'বাসাংসি জীর্ণানি' প্রভৃতি শ্লোকে জীবন-ক্ষণিকত্বের মর্মার্থ স্পষ্ট। এবার এ তত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীর আলোকে করি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ওঁকারকে ঘণ্টার টং-শব্দের সঙ্গে তুলনা করেছেন : "আমি উপমা দিই টং শব্দ। ট অ-অ-ম-ম্।" এটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত উদাহরণ বা উপমা। ট-অক্ষরে সকল-কিছু শব্দের বা শব্দময় বিশ্বের সৃষ্টি ও ম-অক্ষরে লয়। মধ্যে অ-অ স্বরবর্ণদুটি পরিপুষ্টির পরিচায়ক—যাকে উ বা উকার স্বরবর্ণ বলে। সঙ্গীতশাস্ত্রেও রাগের বাণী বা সাহিত্যে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সমাবেশ আছে। এ সমাবেশ শুধু সঙ্গীতে ও সাঙ্গীতিক শব্দে নয়, সকল প্রকার শব্দের, বর্ণের বা কথার মধ্যে দেখি। স্বরবর্ণ রসসঞ্চারী ও পুষ্টিসাধক বর্ণ স্বরবর্ণই ব্যঞ্জনবর্ণে ব্যঞ্জনাশক্তি ও প্রেরণা জোগায়। ট-অ-অ-ম-ম্ অক্ষরগুলির মধ্যে প্রথম 'ট' ও শেষ 'ম' অক্ষর-দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ এবং মধ্যের অ-অ স্বরবর্ণ ট ও ম-শব্দের বা অক্ষরের মধ্যসত্তার পরিপোষক। সে'দিক থেকেই অ-উ-ম অক্ষর বা শব্দ-তিনটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ ওঁকারের ব্যাখ্যাকালে এই মর্মার্থের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন, স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে ওঁকারের পরিচয় দিয়েছেন বিজ্ঞানসম্মতভাবে। Yoga Psychology-গ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায়ে ওঁকার-সম্বন্ধে তিনি বলেছেন :

"'And the basic word came to the ancient seers of truth as a revelation, and they discovered this syllable OM. It consists of three sounds, A sound, U sound, and M sound. There are three letters. When coalesced, they sound like two letters. * * The gutteral is sound A. That is the first sound. The last sound is produced by the lip, and the A sound by the throat. The larynx and the palate must be kept all wide open. Then between those two sounds we get the whole gamut of sound; Therefore all sounds that can be produced by mouth are included between the first A sound and the last M sound."[১]

"All sounds that can be produced by the mouth, are included between the first A sound and the last M sound"; অর্থাৎ সকল-কিছুর উচ্চারণকালে শব্দের আরম্ভ হয় অ (A)-শব্দে ও শেষ হয় ম(M)-শব্দে। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব ট (ট-অ) ও ম-শব্দ বা অক্ষর-দুটিরই মাত্র পরিচয় দিয়েছেন উকারকে বাদ দিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, ট-অ-অ-ম-ম্। তিনি ছাত্র-মনোবৃত্তি নিয়ে যোগদর্শন বা বিজ্ঞান পড়েন নি, কিন্তু অধ্যাত্ম-অনুভূতির আলোকে যোগদর্শন ও বিজ্ঞানের চরমসিদ্ধান্তের বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, লীলা থেকে নিত্যে লয়, অথবা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ থেকে মহাকারণে লয়; জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয়। এই ক্রমবিকাশ ও লয় ধীরে ধীরে পার্থিব থেকে অপার্থিবের দিকে আরোহণ-অবরোহণ গতিতে হয়—লীলা থেকে নিত্যে, সৃষ্টি থেকে মহালয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "আবার ঘণ্টা বাজলো—যেন মহাসমুদ্রে একটা গুরু জিনিস পড়লো, আর ঢেউ আরম্ভ হ'ল। নিত্য থেকে লীলা আরম্ভ হ'ল; মহাকারণ থেকে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ-শরীর যেথা সেই তুরীয় থেকেই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—সব অবস্থা এসে পড়লো। আবার মহাসমুদ্রেই লয় হ'ল। নিত্য ধরে ধরে লীলা। আবার লীলা ধরে ধরে নিত্য। আমি টং-শব্দ নিই। **আমি ঠিক এই সব দেখেছি। আমায় দেখিয়ে দিয়েছে—চিৎসমুদ্র, অন্ত নাই।**" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এ অনুভব বই পড়ার তত্ত্ব নয়, প্রত্যক্ষদৃষ্টির

১। Vide *Complete Works of S. Abhedananda*. Vol. III, p. 305.

তত্ত্ব, প্রত্যক্ষ-অনুভূতির সারতত্ত্ব। তিনি বলতেন : "মা আমায় এই সব তত্ত্ব দেখিয়েছেন।" জ্ঞানদৃষ্টিতে এ দর্শন নিত্য থেকে লীলা ও লীলা থেকে নিত্য। অনুলোম ও বিলোম।

স্বামী বিবেকানন্দ এ ভাবের চাক্ষুষ অনুভূতি লাভ ক'রেই সৃষ্টি ও প্রলয়ের দুটি গান রচনা করেছিলেন—যে গানদুটি সকলের নিকট পরিচিত। সৃষ্টি-তত্ত্বের গান—

(বড়হংসসারঙ্গ—চৌতাল)

একরূপ অরূপ নাম বরণ অতীত আগামী কালহীন
দেশহীন, সর্বহীন, নেতি নেতি বিরাম যথায়।
সেথা হ'তে বহে কারণধারা ধরিয়ে বাসনা বেশ উজালা
গরজি গরজি ওঠে তার বারি, 'অহমহমিতি' সর্বক্ষণ।

* * * *

লয়তত্ত্ব বা প্রলয়ের গান—

(বাগেশ্রী—আড়াঠেকা বা ঝাঁপতাল)

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক-সুন্দর
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর।

* * * *

ধীরে ধীরে ছায়াদল মহালয়ে প্রবেশিল, প্রভৃতি ;

এ মহালয়ই মহাকরণ, তুরীয় বা চতুর্থ বিশুদ্ধচৈতন্য। তুরীয় থেকে ক্রমে চৈতন্যের বিকাশ ঈশ্বরে, হিরণ্যগর্ভে ও বিরাটে। মহাকারণ থেকে সত্তার বিকাশ কারণে (সুষুপ্তি), সূক্ষ্মে (স্বপ্ন) ও স্থূলে (জাগ্রৎ)। ছিল এক ও অদ্বিতীয় চিৎসত্তা, হোল বহু বা বৈচিত্র্য। আবার পরে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-তারা, বিশ্বচরাচর সকল-কিছুই ধীরে ধীরে ছায়াদলের মতো মহালয়ে বা মহাকারণে মিশে যায়। সত্তা (existence) থেকে সত্তা (existence), সুতরাং মহালয় বা মহাকারণে মহাসত্তা অসত্তা বা শূন্য হয় না। বৃহদারণ্যক-উপনিষদে আছে, সৎ (পরমসত্তা) থেকে সৎ-এর সৃষ্টি বা বিকাশ ; কিংবা 'অসতঃ সৎ জায়তে'—অসৎ, অব্যক্ত বা অব্যাকৃত মহাপ্রকৃতি থেকে সত্তারূপ বিশ্বচরাচর সৃষ্টি। উপনিষদের সৎ বা ব্রহ্ম এবং অসৎ বা অব্যাকৃত। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের উপমায় গিন্নির ন্যাতাকাতার হাঁড়ি—যার মধ্যে লাউ-বীচি, শশা-

বীচি-রূপ অসংখ্য জীব-জন্তু ও প্রাণীর সূক্ষ্ম-সংস্কার সুপ্ত থাকে। এর নাম নিত্য থেকে লীলায় আসা। লীলায় আসার নাম সৃষ্টি, আর লীলা থেকে নিত্যে ফিরে আসার নাম লয়, নাশ বা প্রলয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "চিদাকাশে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আবার ঐতেই লয়।" চিদাকাশ ঈশ্বরের 'সমষ্টি-মন'—যাকে ইংরেজীতে cosmic mind বলে। এ কস্‌মিক মাইণ্ডই প্রকৃতি, মহাপ্রকৃতি বা বিশ্বপ্রকৃতি। এ কসমিক্ মাইণ্ডিই গিন্নির ন্যাতাকাতার হাঁড়ি। সৃষ্টির বীজ প্রকৃতির গর্ভে সুপ্ত থাকে। প্রকৃতিই অব্যাকৃত। এই অব্যাকৃত বা অব্যক্তই ঈশ্বর। অব্যক্তই ব্যক্ত হয় হিরণ্যগর্ভে। সৃষ্টির ইচ্ছা সংস্কাররূপী বীজ। অব্যক্ত অবস্থায় ঈশ্বরের সঙ্গে সংস্কাররূপ (সৃষ্টির) বীজ থাকে। এ অবস্থাকে তন্ত্রে শিব-শক্তির অবিনাভাব-সম্পর্ক ও স্থিতি (nondifferent existence) বলে। শিব শক্তিরূপে যখন লীলা করেন তখন সচঞ্চল শিব বা বিশ্বরূপিণী শক্তি। শক্তির বিশ্বরূপিণী অবস্থায় লীলা, আর নিষ্ক্রিয় ও অচঞ্চল শিবের নাম নিত্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, নিত্যে এক ও অদ্বৈত এবং লীলায় বৈচিত্র্য ও সৃষ্টি। পুনরায় বলেছেন, নিত্যে যিনি থাকেন, লীলায় তিনিই থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতে চেয়েছেন, নিত্যে থাকেন যে বৈচিত্র্যহীন ও নাম-রূপের অতীত পরমচৈতন্য, লীলায় বা সৃষ্টিতে তিনিই বিচিত্র রূপে প্রকাশ পেলেও স্বরূপে এক। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "তিনিই সব হয়েছেন। যিনি নিত্যে, তিনিই লীলায়।" মায়ার স্পর্শে ব্রহ্মের স্বরূপচ্যুতিকে আচার্য শঙ্কর বিকার ও মিথ্যা বলেছেন। স্বরূপচ্যুতিই তাঁর লীলা ও খেলা। তবে তাঁর ইচ্ছায় সব-কিছুই হ'তে পারে। দ্বৈত ও অদ্বৈত এক তিনিই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এগুলি অনুভূতির বিষয়। তিনি বলেছেন: "আমায় দেখিয়ে দিয়েছে—চিৎসমুদ্র, অন্ত নাই।" তবে অসীম ও অনন্তের আবার অন্ত কি! গ্রন্থজ্ঞানের প্রমাণ ও নিদর্শন এক ধরনের, কিন্তু ঈশ্বরানুভূতি প্রমাণ তা থেকে ভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিত্য ও লীলার প্রসঙ্গে বলেছেন: "আমি টং-শব্দ উপমা দিই ওঁকারের।" ঘণ্টার টং-শব্দ ধ্বনিত হলে শব্দতরঙ্গ ধীরে কেন্দ্র ত্যাগ ক'রে অনন্তে মিশে যায়। ম-শব্দে স্থিতির পর নাশ—যদিও এ নাশ ইতি বা অস্তিবাচক। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধ্যানদৃষ্টিতে এগুলি স্বতঃপ্রকাশিত, শাস্ত্র বা গ্রন্থপাঠের ফলশ্রুতি নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটু রহস্য ক'রে তাই

বলেছেন : "তোমাদের বইয়ে কি আছে এতো আমি জানি না।" শাস্ত্রজ্ঞান বা গ্রন্থজ্ঞান প্রত্যক্ষানুভূতির কাছে ক্ষীণপ্রভ। উপনিষৎ তাই বারবার বলেছে—'যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি', অর্থাৎ যে জ্ঞান লাভ করলে বিশ্বের সকল-কিছুর জ্ঞান লাভ হয়। এই জ্ঞান আত্মজ্ঞান। সুতরাং সকল ব্যষ্টিজ্ঞান সমষ্টিজ্ঞানের অন্তর্গত। অগ্নিকুণ্ডের কণিকা যেমন অগ্নিরূপ থেকে পৃথক নয়, তেমনি ব্যষ্টিজ্ঞান সমষ্টিজ্ঞান থেকে ভিন্ন নয়। পরিমাণগত ভিন্নতা আপেক্ষিক ও জাগতিক, কিন্তু পারমার্থিকতার জগতে আপেক্ষিক (relative) বলে কিছু থাকে না। তখন সমস্তই একাকারে লয় হয়। বুদ্ধি ও বিচারের ক্ষেত্রেই ভেদ, বোধি ও অনুভূতি ক্ষেত্রে অভেদ। গ্রন্থ বা শাস্ত্র ইহবাহ্যের সংবাদ নেয়, বোধির অনুভূতি অন্তরের স্পর্শ দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই শাস্ত্রের কথা বলেছেন এবং তা থেকে এটাই বুঝা যায় যে, গ্রন্থজ্ঞান থেকে ব্রহ্মোপলব্ধির জ্ঞান শ্রেষ্ঠ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ সমাধি হ'লে কর্মত্যাগ হয় ॥

"শ্রীরামকৃষ্ণ। সমাধি হ'লে সব কর্ম ত্যাগ হ'য়ে যায়। পূজা-জপাদি কর্ম, বিষয়কর্ম সব ত্যাগ হয়। প্রথমে কর্মের হৈ চৈ থাকে। যত ঈশ্বরের দিকে এগুবে ততই কর্মের আড়ম্বর কমে। এমন কি তাঁর নামগুণগান পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, ৩৬৬, পৃঃ ৭৮

শ্রীরামকৃষ্ণদেব পূর্বে ঈশ্বর-লাভের লক্ষণ, সপ্তভূমি ও ব্রহ্মজ্ঞান-সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন: "এই সম্বন্ধে বেদে সপ্তভূমির কথা আছে। এই সাত ভূমি মনের স্থান।" প্রকৃতপক্ষে ভূমি, চক্র, পদ্ম প্রভৃতি মনের ভিন্ন ভিন্ন স্তর বা levels of consciousness। মনের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানের পরিচয় পরে তিনি বলেছেন: "মনের চতুর্থ ভূমি—হৃদয়। তখন প্রথম চৈতন্য হয়েছে।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'বেদে সপ্তভূমি' বলায় যোগদর্শনের কথাই বলেছেন। যোগদর্শনে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার—এ সাতটি চক্র, পদ্ম বা ভূমির কথা আছে। তিনি বলেছেন: "এই সাত ভূমি মনের স্থান।" মন বলতে মনোবৃত্তি, অনুভূতি বা অনুভূতির ক্রিয়া। ইংরেজীতে একে জ্ঞান বা সংবেদনের প্রতিশব্দ কন্‌সাসনেস্ (consciousness) বলে। মনের সংবেদন-ভূমি level of consciousness। ভূমি বা স্থান হিসাবে সংবেদনের তারতম্য আছে। 'মনের চতুর্থ ভূমি—হৃদয়।'

'হৃদয় মনের স্থান' এ কল্পনাটি বেশ প্রাচীন। যোগদর্শনে ও তন্ত্রে

অনাহতপদ্মের স্থান হৃদয়ে কল্পনা করা হয়েছে। পদ্ম চক্রেরই ভিন্ন নাম। মেরুদণ্ডের মধ্যে কতকগুলি মাংসপিণ্ড বা প্লেক্সাস্ (plexus) আছে, যোগীরা সেগুলিকে চক্র বা পদ্ম বলে কল্পনা করেছেন। এটা প্রথমে কল্পনা, তারপর কল্পনাই বাস্তবে পরিণত হয়। ইচ্ছা প্রথমে ও পরে ইচ্ছা সৃষ্টি করে বাস্তব রূপ। উপনিষৎ হৃদয়কে হৃদয়পদ্মরূপে কল্পনা করেছে—'হৃদয়-পুণ্ডরীকে'। পুণ্ডরীক কিনা পদ্ম। বিষ্ণু বা নারায়ণের আর এক নাম পুণ্ডরীকাক্ষ। পদ্মের মতো অক্ষ বা চক্ষু ব'লে পুণ্ডরীকাক্ষ। পদ্ম সূর্যের প্রতীক। ঐতিহাসিক ও শিল্পীদের ধারণাও তাই। পদ্মের পাপড়িগুলি চতুর্দিকে ছড়ানো, সূর্যের রশ্মিও চারদিকে বিস্তৃত। সূর্যের বা অগ্নির প্রতিরূপ ব'লে শিব, বিষ্ণু, বাসুদেব, কৃষ্ণ-বাসুদেব, নারায়ণ, আত্মা প্রভৃতি দেবতারা কল্পিত হয়েছেন। শিব, বিষ্ণু, বাসুদেব, আত্মা প্রভৃতি ব্যাপক চৈতন্য—'ব্যাপকত্বাদ্ বিষ্ণুঃ'। ঈশোপনিষদে আত্মার অভিন্ন ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলা হয়েছে: 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্'। এর অর্থ বিশ্বচরাচরের সকল কিছুই ঈশ্বরের বা আত্মার দ্বারা ব্যাপ্ত। আবার আত্মার প্রতিশব্দ ব্রহ্ম। এ দুটির মধ্যে পার্থক্য হ'ল: একটি ব্যষ্টিচৈতন্য ও অপরটি সমষ্টিচৈতন্য—সামান্য ও বিশেষ। ব্রহ্মও ব্যাপকচৈতন্য—'বৃহত্বাদ্ ব্রহ্ম'। বৃহৎ অর্থে সর্বত্র পরিব্যপ্ত বা ব্যাপক। বৃহৎ বলতে বিশ্বের অণু-পরমাণু থেকে আরম্ভ ক'রে সকল প্রাণী ও পদার্থই ব্রহ্মচৈতন্যের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। ঈশোপনিষৎ একথাই বলেছে। এ বৃহৎ ব্রহ্মই 'দিবীব চক্ষুরাততম্',—আকাশ বা বায়ুমণ্ডল যেমন সর্বত্র বিস্তৃত (আততম্), তেমনি আত্মা, বিষ্ণু, বাসুদেব প্রভৃতি চৈতন্য বা দেবতারাও সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এটি বেদের কল্পনা। প্রজ্ঞাচক্ষুষ্মান ঋষিরা এটি দর্শন ও অনুভব করেছিলেন। সাধনকালে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজও আকাশে সর্বতবিস্তারী এই চক্ষু প্রত্যক্ষ ক'রে তাঁর আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবকে বলেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। এই সর্বত্রবিস্তারী চক্ষুই সর্বব্যাপকচৈতন্য আত্মা।

উপনিষদে পদ্মকে আত্মার পীঠস্থান ব'লে কল্পনা করা হয়েছে। যোগশাস্ত্রে ও অন্যান্য শাস্ত্রেও তাই। যোগশাস্ত্রে ও তন্ত্রে মূলাধরাদি চক্র পদ্মরূপে কল্পিত। ঐ সকল চক্রে বা পদ্মে ভিন্ন ভিন্ন নামে ও রূপে চৈতন্যরূপী আত্মার প্রকাশ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "এই সাত ভূমি মনের স্থান।" মন

চৈতন্যরূপে মূলাধারাদি চক্রে অধিষ্ঠিত। ভিন্ন ভিন্ন চক্রে বিজ্ঞান বা জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। যোগশাস্ত্রে আছে, যোগীরা ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান অনুভব করেন বিভিন্ন চক্রে। হৃদ্‌পিণ্ডে, হৃদয়ে বা অনাহতচক্রে আত্মার (আত্ম-চৈতন্যের) কল্পনা করেছেন যোগীরা। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানীদের ধারণা এ থেকে একটু ভিন্ন। তাঁদের মতে—মন, বুদ্ধি ও সকল-কিছু জ্ঞানের স্থান বা কেন্দ্র মস্তিষ্ক। যোগশাস্ত্র আত্মার স্থানকে ভিন্নভাবেও কল্পনা করেছে। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে আজ্ঞাচক্রে এবং মস্তিষ্কে সহস্রারচক্রেও আত্মার স্থান কল্পনা করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "মনের পঞ্চম ভূমি—কণ্ঠ, মনের ষষ্ঠ ভূমি—কপাল, আর শিরোদেশ—সপ্তম ভূমি।" ষষ্ঠভূমি আজ্ঞাচক্র। সে চক্রকে দুটি দলবিশিষ্ট পদ্ম বলা হয়েছে। আজ্ঞাচক্রে মনের কল্পনা দু'রকম ভাবে করা হয়। সেখানে দ্বন্দ্ব বা সংশয় থাকে পরমসত্তা দ্বৈত— কি অদ্বৈত, বিশেষিত—কি অবিশেষিত এই নিয়ে। মস্তকে সহস্রদলপদ্মের কল্পনা—সপ্তম ভূমি। যোগশাস্ত্রাদি অধ্যয়ণ না করলেও অনুভূতির আলোকে প্রজ্ঞাচক্ষু লাভ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব, তাই সকল শাস্ত্রের সকল তত্ত্ব তাঁর জ্ঞানচক্রে প্রতিভাত হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমাধিপ্রসঙ্গে বলেছেন: "সেখানে (শিরোদেশে সহস্রার চক্রে বা পদ্মে) মন গেলে সমাধি হয় ও ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়।" লক্ষ্য করার বিষয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "* * সমাধি হয় ও ব্রহ্ম জ্ঞানীর ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়,"—যদিও 'সমাধি'-শব্দটি যোগদর্শনের ও 'ব্রহ্মজ্ঞান' অদ্বৈত-বেদান্তদর্শনের। তবে উভয়ের চরম-অনুভূতি এক ও অভিন্ন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "সমাধি হ'লে সব কর্ম ত্যাগ হ'য়ে যায়।" এখানে দুটি জিনিস মনে রাখা দরকার: একটি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "(সমাধির অবস্থায়) সর্বদা বেহুশ, কিছু খেতে পারে না, মুখে দুধ দিলে গড়িয়ে যায়" প্রভৃতি। এ অবস্থা তাঁর নিজেরই হয়েছিল। সাধনার কালে সমাধিতে বহুদিন তিনি ব্রহ্মানন্দসাগরে ডুবে ছিলেন।[১] তখন বাহ্যজ্ঞান কিছু

১। যোগসাধনায় সমাধিতে আত্মা ও পরমাত্মার মিলনস্বরূপ সমাধি; তন্ত্রসাধনায় শক্তি ও শিবের মিলনরূপ সামরস্য বা সামরস্যানুভূতি, অদ্বৈতবেদান্তে জীব ও ব্রহ্ম এই দ্বৈতজ্ঞানের বিলোপে এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তার অনুভূতি।

থাকত না ; কোন জিনিস তিনি খেতেও পারতেন না। হৃদয়নাথ (হৃদয় মুখোপাধ্যায়) তখন কখনও কখনও জোর ক'রে কিছু কিছু খাইয়ে দিতেন। দিবা ও রাত্র কোথা দিয়ে চলে যেত তা তিনি জানতে বা বুঝতে পারতেন না। সমাধির কথা বল্‌তে গিয়ে এখানে নিজের সমাধির অবস্থার কথাই তিনি বর্ণনা করেছেন বলা যেতে পারে।

অপরটি, বেদান্তের চরম-অনুভূতির কথা। অদ্বৈতবেদান্তে আছে, ব্রহ্মবস্তু যে কী তা মুখে বলা যায় না—"অবাঙ্‌মনসোগোচরম্"। আসলে মন ও বাক্যের অতীত ব্রহ্মবস্তু। মন ও বাক্য অজ্ঞানরাজ্যের উপাদান, সুতরাং অজ্ঞানের সাহায্যে জ্ঞানরাজ্যের ব্রহ্মবস্তুকে উপলব্ধি করা যায় না : মায়া বা অজ্ঞানকে তাই অনির্বাচ্য বলা হয়েছে। কিন্তু বাক্য ও মনের অতীত বলে ব্রহ্ম জ্ঞানের অতীত নন, বরং জ্ঞান বা অনুভূতির স্বরূপই ব্রহ্মবস্তু। জার্মান দার্শনিক কাণ্ট ব্রহ্মকে (এ্যাবসোলিউটকে) আন্‌নোন্ এ্যাণ্ড আন্‌নোএবল্ (unknown and unknowable) বা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। বহু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষী এবং অদ্বৈতবেদান্তও ইমানুয়েল কাণ্টের এই মতকে খণ্ডন ক'রে বলেছেন, ব্রহ্মবস্তু একেবারে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বস্তু নন, তিনি জ্ঞানের বিষয় বল্‌তে চরম-অনুভূতিতে ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ কি তা জানা যায়। এই জানার নাম অপরোক্ষানুভূতি। এ সম্বন্ধে বিচার সুদীর্ঘ, তবে ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। তাই সর্বজ্ঞানের কারণ ও অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মকে আত্মার আত্মা বলে উপলব্ধি করা যায়।

কিন্তু তাই বলে সাধারণ পার্থিব জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে বাক্য-মনের অতীত ব্রহ্মজ্ঞান অনুভব করা যায় না। শাস্ত্রাদি পাঠের জ্ঞান ও বৌদ্ধিক জ্ঞান দিয়েও দেশ-কাল-কারণের অতীত ব্রহ্মচৈতন্যকে অনুভব করা যায় না। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন, প্রদীপের আলো দিয়ে যেমন সূর্যকে প্রকাশ করতে যাওয়া বৃথা, তেমনি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সীমিত জ্ঞান দিয়ে অসীম ব্রহ্মজ্ঞানের ইতি করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অনুভূতির উচ্চস্তরে আসীন থেকেই বলেছেন, তখন 'সব কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়'। ইন্দ্রিয়ের কর্ম, মনের কর্ম, বুদ্ধির কর্ম—সকল কর্মই সমাধিতে লয় হ'য়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান একটাই, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা নানা ব'লে প্রতীত হয় মাত্র। শুধু অদ্বৈতবেদান্তে নয়, সকল সাধকের চরম-অনুভূতিতে এটিই ধরা পড়ে যে, এক

ব্রহ্মজ্ঞানই জ্ঞান, আর সকল-কিছু তার প্রতিভাস বা প্রতিবিম্ব। প্রতিভাস বা প্রতিবিম্ব দর্পণে প্রতিফলিত কোন জিনিসের প্রতিফলন। দর্পণে প্রতিফলিত (মানুষের) মুখই যেমন সত্য, আর মুখের প্রতিবিম্ব ঠিক নয়—অসত্য। কারণ মুখ থাকলে তবেই মুখের প্রতিবিম্ব সম্ভব, তেমনি সমাধি হ'লে কর্ম ত্যাগ হয় অর্থে সাধক সমাধিতে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করলে সাধনরূপ কর্মের আর কোন কোন সার্থকতা থাকে না। তাছাড়া কর্মমাত্রেই বৃত্তি। 'বৃত্তি' বলতে মন একটা বিষয় বা বস্তুর রূপ ধারণ করে, সুতরাং মন তখন বস্তু-রূপে প্রকাশ পায়। কর্মও তাই। মনের ইচ্ছারূপ বৃত্তির প্রেরণায় ইন্দ্রিয় কাজ করে, তাই কাজকেও বৃত্তি বলতে পারি। ব্রহ্মচৈতন্য স্থির ধীর অচঞ্চল কূটস্থ, সুতরাং কোন বৃত্তিচাঞ্চল্য ব্রহ্মচৈতন্যে নাই। ব্যাপক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্যের প্রমাণ ব্রহ্মচৈতন্যই। চরমবোধিই সে পরমবোধির সাক্ষ্য ও স্বরূপ। সুতরাং কর্মরূপ চাঞ্চল্যের স্থান চিরপ্রশান্ত ব্রহ্মে থাকে না, বা কল্পনাও করা যায় না। আর যদিও ব্রহ্মজ্ঞানীর জীবনে কোন কর্মরূপ ইন্দ্রিয়প্রচেষ্টা থাকে, তবে সে প্রচেষ্টা বা কর্ম ব্রহ্মজ্ঞানীর নিজের জন্য নয়, তা নিবেদিত সকলের কল্যাণসাধনের জন্য। গীতায় কর্মযোগের ব্যাখ্যাকালে এ সকল কথার ও বিচারের অবতারণা করা হয়েছে। জীবন্মুক্তের সকল কর্ম তাই অকর্মস্বরূপ, অথবা সকল কর্মের অতীত আত্মাই অকর্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "পূজা-জপাদি কর্ম, বিষয়-কর্ম সব (তখন) ত্যাগ হয়।" কথাও তাই যে, যাকে লাভ করার জন্য পূজা-জপাদি কর্ম, তাঁকে পাওয়া গেলে কর্মের আর প্রয়োজন কি। কোন মানুষের নাম ধরে ডাকার পর সে মানুষটি যখন সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন তাকে ডাকার আর কোন সার্থকতা থাকে না। লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হ'লে চলার আর কোন সার্থকতা থাকে কি? তাই সমাধিতে চরমজ্ঞান লাভ হ'লে সকল কর্ম স্বার্থের পরিবর্তে নিঃস্বার্থের পাদপীঠে সমর্পিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "এমন কি তাঁর (ভগবানের) নামগুণগান পর্যন্ত বন্ধ হ'য়ে যায়।" আহ্বানের জন্য নাম ধরে ডাকা হয় নামী বা কোন ব্যক্তিকে। নামী ভগবানের পুণ্যস্পর্শ লাভ করার জন্যই নামজপ, কিন্তু ভগবানের পবিত্র স্পর্শে যখন জীবন কৃতকৃতার্থ হয়, তখন আর নামগুণগানের কোন প্রয়োজন থাকে না। নামীর দর্শন, স্পর্শন ও উপলব্ধিতেই তখন পরম-আনন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব উদারণরূপে কতকগুলি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রীকে উদ্দেশ ক'রে তিনি বলেছেন: "যতক্ষণ তুমি সভায় আসনি, (ততক্ষণ) তোমার নাম, গুণ, কথা অনেক হয়েছে। যাই তুমি এসে পড়েছ, অমনি সে সব কথা বন্ধ হ'য়ে গেল। তখন তোমার দর্শনেতেই আনন্দ।" তারপর নিজের কথা। সংকীর্তনে 'নিতাই আমার মাতা হাতী'—এই পদ গান করতে করতে মন যখন লক্ষ্যে স্থির হয় তখন মুখে কেবল 'হাতী', আর মন আরো গভীরতায় নিমগ্ন হলে 'হা' বলতে বলতে সমাধি হয়—এ সকল কথার অবতারণা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

তাছাড়া ব্রাহ্মণভোজনে প্রথমে খুব হৈ চৈ ও পরে লুচি-তরকারী খাবার সময় সমস্ত চুপ—এ প্রসঙ্গের ও গৃহস্থের বৌ অন্তঃসত্ত্বা হলে শাশুড়ী বৌকে সকল কর্ম থেকে অব্যাহতি দেন—এ প্রসঙ্গেরও উদাহরণ দিয়েছেন তিনি। সহজ সরল এই উদাহরণ এবং এ উদাহরণগুলিতে শাস্ত্রের তর্কজাল নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নারদাদি লোকশিক্ষক ও চৈতন্যদেব-প্রমুখ অবতারদেরও উদাহরণ দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বক্তব্য এই যে, কর্মশীল মানুষ কর্ম করুক সংসারে তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু পরমবস্তু ভগবানকে সে যেন ভুলে না যায়। 'সমাধি' যোগসাধনার শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি। এটি চরম ও পরম সিদ্ধি। যোগসাধনায় সমাধিলাভ কঠিন হলেও একনিষ্ঠ মন, আত্মনিবেদন, বিবেক-বৈরাগ্যের দিব্যস্পর্শে সমাধি লাভ সহজ সরল হয়। কর্ম ও প্রবৃত্তির পারে যাবার জন্যই সমাধির সাধনা ও আনন্দ। সমাধির সমতলে উচ্চ-নীচ সকল বৈষম্যের অবসান হয়। সাধক তখন অনাবিল আনন্দের অধিকারী হন। কর্মের বন্ধন তখন মুক্তির আশীর্বাদ নিয়ে নির্বাসনার আলোকে উদ্ভাসিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কর্মত্যাগের আদর্শরূপে নিষ্কামকর্মের অনুষ্ঠানের কথাই বলেছেন। কর্মের সংসারে কর্ম ত্যাগ ক'রে আলস্যের প্রশ্রয় দেন যিনি তিনি কপট ও মিথ্যাচারী—বলেছেন গীতায় শ্রীকৃষ্ণ। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ ও এই যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রতিটি মানুষকে কর্মবীরের মতো কর্মসংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন ঈশ্বরকে লাভ ও প্রাণে প্রাণে অনুভব ক'রে প্রতিটি সংসারী ও সংসারবিরাগীর পক্ষে আত্মমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় কর্ম করা উচিত। কর্মে অক র্ম-রূপ আত্মাকে দর্শন ক'রে জীবনকে চির-সার্থকতায় পূর্ণ করাই মানব-জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
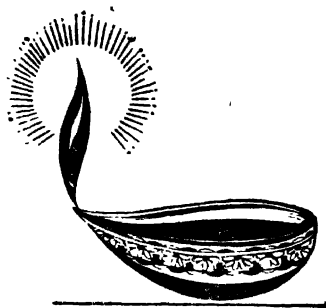
বিংশ পরিচ্ছেদ

॥ পিঁপড়ের মতো সংসারে থাকো ॥

"শ্রীরামকৃষ্ণদেব। (ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে) পিঁপড়ের মতো সংসারে থাকো। এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে! বালিতে চিনিতে মিশানো; পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে!

জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ-রস আর বিষয়-রস। হংসের মতো দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে।

আর পানকৌটির মতো। গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মতো। (পাঁকাল-মাছ) পাঁকে থাকে, কিন্তু গা দেখ—পরিষ্কার, উজ্জ্বল।

গোলমালে মাল আছে, গোল ছেড়ে মালটি নেবে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ (১৪৬৬), পৃঃ ১৮৩।

কোন্‌টি সৎ ও কোন্‌টি অসৎ, কোন্‌টি নিত্য ও কোন্‌টি অনিত্য—এ তত্ত্ব উপলব্ধি করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রথমে পিঁপড়ের, তারপর হংসের ও পরে পানকৌটি ও পাঁকালমাছের উদাহরণ দিয়েছেন। বিচারী ও বিবেক-বৈরাগ্যবান জীবন গঠন করার জন্য প্রতিটি মানুষকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন। তিনি বলেছেন, সংসার মিশ্র-কর্মক্ষেত্র। এতে মিশানো আছে দুটি বস্তু বা ধর্ম: একটি নিত্য ও অপরটি অনিত্য।

আচার্য শঙ্কর বেদান্তসূত্রের অধ্যাসভাষ্যে অধ্যাস কী তার পরিচয় দিয়ে বলেছেন, সংসার ও অবিদ্যা আলোক-অন্ধকারের মতো সতে ও অসতে—দুধে ও জলে মিশানো। তারজন্য সংসার বস্তু, আবার অবস্তুও। তবে

সত্যকারের বস্তু তাকেই বলে যার নিত্যসত্তা আছে। যেমন ব্রহ্মবস্তু। ব্রহ্ম ও আত্মা এক কথা—যদিও বিচারের দৃষ্টিতে দার্শনিকরা ব্রহ্মকে বলেছেন সমষ্টি ও স্বরূপসত্তা, আর আত্মাকে বলেছেন ব্যষ্টি বা ব্যক্তিসত্তা। তবে দু'টিই নিত্য ও শাশ্বত। উদাহরণ যেমন, বিচারী সাধক নিজেকে নিত্যসত্তা ব্রহ্মস্বরূপ ব'লে উপলব্ধি করেন প্রথমে, অর্থাৎ নিজের সত্তাই শাশ্বত ব্রহ্মসত্তা এটি নিজে প্রথমে উপলব্ধি করেন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ব'লে ও পরে উপলব্ধি করেন বিশ্বের চেতন ও অচেতন—চৈতন্য ও জড় সকলকেই সমষ্টিসত্তারূপ ব্রহ্মসত্তা থেকে অভিন্ন ব'লে—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। বিচারের দৃষ্টিতে প্রতিটি প্রাণী ও বস্তুতে প্রকাশমান যে চৈতন্যসত্তা তাকে বলা হয় 'আত্মা', আর সকল প্রাণীতে প্রকাশমান যে চৈতন্যসত্তা তাকে বলা হয় 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ ব্যাপক-চৈতন্য।—the Individual and the Universal। নচেৎ 'আত্মৈব ব্রহ্ম', প্রতিটি প্রাণীতে প্রকাশমান চৈতন্যই আত্মা বা ব্রহ্ম। তাই বিচারের দৃষ্টিতেই কেবল আত্মায় ও ব্রহ্মে সাধারণ ভেদ, কিন্তু স্বরূপদৃষ্টিতে অভেদ, এক ও অদ্বৈত।

স্বরূপদৃষ্টি কাকে বলে? স্বরূপদৃষ্টিতে এক ও দুই—অদ্বৈত ও দ্বৈত ব'লে কোন বস্তু থাকে না। বন্যা এলে পুকুরের জল খাল, বিল, নদী ও সাগরের জল সমস্তই যেমন একাকার হয়, তেমনি স্বরূপদৃষ্টিতে ব্যষ্টিচৈতন্য ও সমষ্টি-চৈতন্য—ক্ষুদ্রবস্তু ও বৃহদ্‌বস্তুর মধ্যে কোন ভেদ থাকে না। গীতায় (২।৪৬) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন: "যাবানর্থ উদপানেঃ সর্বত সংপ্লুতোদকে" প্রভৃতি, কিংবা "আপূর্য-মাণমচলপ্রতিষ্ঠং, সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ" (২।৭০), তেমনি বন্যা বা মহাপ্লাবন এলে নদী বা সমুদ্র জলে পরিপূর্ণ হলে সব একাকার হয়। তখন একাকার প্রশান্ত অবস্থায় সকল-কিছুকেই স্থির, ধীর ও এক এবং অদ্বিতীয় ব'লে উপলব্ধি হয়। সংসার মায়াশক্তির খেলা। স্বরূপদৃষ্টিতে শক্তি ও ব্রহ্মের মধ্যে সকল ভেদ ও সীমারেখাই লুপ্ত হয়। তখন কেবল এক ও অখণ্ড চৈতন্যেরই বিকাশ। এই স্বরূপদৃষ্টি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের। তাই সাধারণ মানুষের কাছে যা ভেদ, পৃথক বা দ্বৈত ব'লে প্রতীত, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টিতে তা এক ও অভেদ ব'লে প্রতীত। এর উদাহরণ যেমন,

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে একদিন প্রশ্ন করেছিলেন:

"ব্রহ্ম যদি মা, তা হলে তিনি সাকার—না নিরাকার?" শ্রীরামকৃষ্ণদেব তার উত্তরে বলেছিলেন: "যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী (মা আদ্যাশক্তি)। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে মা বলে কই, আর যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলচে দুলচে শক্তি বা কালীর উপমা। কালী কিনা যিনি মহাকালের (ব্রহ্মের) সহিত রমন করেন। কালী 'সাকার আকার নিরাকারা'" (শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ পৃঃ ২০২)। সাধারণ দ্বৈতবুদ্ধি মানুষের দৃষ্টিকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পুনরায় বলেছেন: "মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বুঝা যায়? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে?" তাই ব্রহ্মচৈতন্যই যে সব হয়ে আছেন, আবার সবার তিনি অতীত এক ও অভিন্ন—এই প্রতীতি আসে ঈশ্বরদর্শন বা ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সিদ্ধান্ত তাই। তিনি বলেছেন: "পূর্ণজ্ঞানের পর অভেদ। যেমন, মণির জ্যোতিঃ, আর মণি অভেদ। মণির জ্যোতিঃ ভাবলেই মণি ভাবতে হয়। দুধ আর দুধের ধবলত্ব যেমন অভেদ। একটা ভাবলেই আর একটা ভাবতে হয়। কিন্তু এই অভেদ-জ্ঞান পূর্ণজ্ঞানে সমাধি হয়। চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ছেড়ে চলে যায়, তখন তাই অহংতত্ত্ব থাকে না।* * সেখানে 'আমি' 'তুমি' নাই। যতক্ষণ 'আমি' 'তুমি' আছে, যতক্ষণ 'আমি প্রার্থনা—কি ধ্যান করছি—এ জ্ঞান আছে ততক্ষণ 'তুমি' (ঈশ্বর) প্রার্থনা শুনছো—এ জ্ঞানও আছে, ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ আছে। (ততক্ষণ) তুমি প্রভু—আমি দাস, তুমি পূর্ণ—আমি অংশ, তুমি মা—আমি ছেলে—এ বোধ থাকবে। এ ভেদবোধ—আমি একটি, তুমি একটি। * * তাই পুরুষ-মেয়ে, আলো-অন্ধকার—এই সব বোধ হচ্ছে। যতক্ষণ ভেদবোধ থাকবে, ততক্ষণ শক্তি মানতে হবে। * * তাই যতক্ষণ 'আমি' আছে, ভেদবুদ্ধি আছে ততক্ষণ 'ব্রহ্ম' নির্গুণ বলবার যো নাই। ততক্ষণ সগুণ-ব্রহ্ম মানতে হবে।"

এরপর সত্য ও অসত্য—নিত্য ও অনিত্য এই বোধ কখন ও কিরূপে হয় সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "যতক্ষণ 'আমি'-জলে সূর্যকে দেখতে হয়, * * আর যতক্ষণ প্রতিবিম্ব-সূর্য এই সত্য-সূর্যকে দেখার উপায় নাই, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব-সূর্য ষোলআনা সত্য। যতক্ষণ 'আমি' সত্য, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব-সূর্যও সত্য—ষোলআনা সত্য। সেই প্রতিবিম্ব সূর্যই

আদ্যাশক্তি। ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও, সেই প্রতিবিম্বকে ধরে সত্য-সূর্যের দিকে যাও। সেই সগুণ-ব্রহ্ম—যিনি প্রার্থনা শুনেন। তাঁকেই বলো, তিনিই সেই ব্রহ্মজ্ঞান দিবেন। কোনা যিনি সগুণ-ব্রহ্ম, তিনিই নির্গুণ-ব্রহ্ম ; যিনি শক্তি, তিনিই ব্রহ্ম" (শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ২০৪-২০৫)।

পূর্ণজ্ঞান ও অভেদজ্ঞান এক। এ পূর্ণজ্ঞান লাভের প্রসঙ্গেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "পিঁপড়ের মতো সংসারে থাকো। এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশেয়ে রয়েছে" প্রভৃতি। নিত্য ও অনিত্য এই ভেদজ্ঞান দ্বৈতজ্ঞান! দ্বৈতজ্ঞানে দুটি সত্তা থাকে—তা নিত্যই হোক, আর অনিত্যই হোক। তবে অদ্বৈতজ্ঞান হ'লে নিত্য ও অনিত্যের মধ্যে কোন ভেদবুদ্ধি থাকে না।

যারা বাসনা-কামনার সংসারে বাস করে, তারা অজ্ঞানী। তারা বৌদ্ধিক জ্ঞানের আনন্দে বিচার করে। তারা বিদ্যা ও অবিদ্যার বিচার ক'রে বিদ্যাকে অবিদ্যা থেকে ভিন্ন মনে করে ও অবিদ্যাকে অধ্যস্ত ও মিথ্যা বলে। কিন্তু বিদ্যা ও অবিদ্যার স্বরূপ কি তা যথাযথভাবে জানতে চেষ্টা করে না, সুতরাং বিচারেই তাদের উপলব্ধি পর্যবসিত হয়। অবশ্য সংসার, মায়া ও সৃষ্টির দিক থেকে মায়াবিলাসী সংসারীর বিচার অসার্থক নয়। তবে নিত্য ও অনিত্যের মধ্যে অনিত্যকে অসৎ ও অসার ব'লে স্থির করেন বিচারী ও তাই অনিত্যকে (অসার বুদ্ধিকে) তিনি ত্যাগ করেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, বিচারী (জ্ঞানী) যখন অনিত্য ত্যাগ ক'রে নিত্যকে গ্রহণ করেন তখন সেই অনিত্য বস্তু থাকে কোথায়। তখন অনিত্য নিত্যে রূপান্তরিত হয়, যেমন রজ্জুতে মিথ্যা সর্পদৃষ্টি যখন দূর হয় তখন সর্পজ্ঞান রজ্জুজ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। তাই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধি হ'লে মিথ্যা-জ্ঞানরূপ অজ্ঞানের নাশ হয় বলতে মিথ্যাজ্ঞান সত্যজ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। ঈশ্বর বা ব্রহ্মচৈতন্য যখন বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে অনুস্যূত, তখন ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ছাড়া সংসারের পৃথক সত্তা নাই, বরং বিশ্বচরাচর ঈশ্বর বা ব্রহ্মেরই অভিন্ন প্রকাশ।

সুতরাং একথা সত্য যে, ভ্রমবুদ্ধিতে অজ্ঞান, অবিদ্যা, সংসার, সৃষ্টি এ সমস্তই ঈশ্বর (ব্রহ্মচৈতন্য) থেকে পৃথক ব'লে মনে হয়, কিন্তু সত্যজ্ঞানে কোন ভেদের ধারণা মনে হয় না। অদ্বৈতজ্ঞানে সত্য ও অসত্য এই রকম ভেদ থাকে না। এ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: 'পূর্ণজ্ঞানের পর অভেদ।

পূর্ণজ্ঞান কিনা সত্যজ্ঞান—যা ভ্রম নয়, বা মিথ্যাজ্ঞান থেকে ভিন্ন। এ প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, সত্যজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞান আপাতত দুটি সত্তা ব'লে মনে হলেও জ্ঞানদৃষ্টিতে একই সত্তা, সত্য ও মিথ্যা দুটি শব্দমাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই তত্ত্বের উপর আলোকপাত ক'রে ভিন্নভাবে বলেছেন, 'যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী'। এ দুটির মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে অজ্ঞানদৃষ্টি, জ্ঞান-দৃষ্টিতে ভেদ নাই—অভেদ। তাই দৃষ্টির হেরফেরে একই সত্য কখনও নিত্য, কখনও অনিত্য ব'লে মনে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: 'পূর্ণজ্ঞান অহং-তত্ত্বের পারে'। অহংতত্ত্ব অজ্ঞান বা অবিদ্যা। একই জল, তাতে অহংতত্ত্বের লাঠি ফেলে দু'ভাগ ক'রে বলি এ দিকের জল ও ওদিকের জল, কিন্তু লাঠি সরিয়ে নিলে কোন সীমারেখাই (দিকই) থাকে না। তখন এদিক নাই, ওদিকও নাই; সত্য নাই, মিথ্যাও নাই; নিত্য নাই, অনিত্যও নাই। তখন সবই একাকার। এই একাকার জ্ঞানের নাম পূর্ণজ্ঞান বা অভেদজ্ঞান। সুতরাং পূর্ণজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হ'লে দ্বৈতবুদ্ধি আর থাকে না। জলে প্রতিবিম্বিত দ্বিচন্দ্র বা অসংখ্য চন্দ্র তখন একই চন্দ্রে পরিণত হয়। সুতরাং দ্বিচন্দ্র বা বহু চন্দ্রের জ্ঞান মিথ্যা, আর এক চন্দ্রের জ্ঞান সত্য। সত্যজ্ঞানের বিকাশ হয় বলতে এক ও অদ্বিতীয় জ্ঞানের প্রতীতি হয়। এ প্রতীতির নাম সত্যের উপলব্ধি।

আচার্য শঙ্কর ব্রহ্ম ও সংসারের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন: 'সত্যানৃতে মিথুনীকৃতে * *', অর্থাৎ সংসার সত্য ও মিথ্যা এই দুটিতে মিশানো। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: 'এই সংসারে নিত্য ও অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে'। 'বালিতে চিনিতে মিশানো', 'জলে দুধে একসঙ্গে মিশে রয়েছে,' 'চিদানন্দ-রস আর বিষয়-রস', 'গোল মালে' মিশানো এই সংসার। সংসার ও ঈশ্বর আপাতত বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন দুটি জিনিস। আলোক ও অন্ধকারের মতো বিরুদ্ধ। আবার সংসার সত্য এজন্য যে, যাকে অসত্য বা মিথ্যা বলি, তার আধার বা স্বরূপ কিন্তু সত্য ব্রহ্মবস্তু, কেবল মিথ্যাজ্ঞানের জন্য বলি অসত্য বা মিথ্যা। আর সংসার অসত্য বা মিথ্যা এজন্য যে, যার ক্রমাগতই পরিবর্তন ও নাশ আছে, তাকে ভুল ক'রে মনে করি সনাতন ও অবিনাশী। নাম-রূপেরই হয় পরিবর্তন। তবে একথাও ঠিক যে, মিথ্যাজ্ঞানের রাজ্যে মিথ্যাবস্তুরও একটি ক্ষণিক সত্তা থাকে। এই ক্ষণিক সত্তার ধারণার দূর হয় সত্যজ্ঞানের উদয় হ'লে। সুতরাং 'সত্যানৃতে মীথুনীকৃতে'—আলো-ছায়ার

সংসারে দ্বৈত জ্ঞান থাকেই—যতদিন না আলোকের প্রকাশ হয়। সে রকম ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধি হ'লে সংসারের আর মিশ্র (সত্য ও মিথ্যা) রূপ থাকে না, তখন এক। তবে অজ্ঞানীর কাছে ভেদ থাকে, আর জ্ঞানীর চোখে 'ব্রহ্মৈবেদং সত্যম্', 'সমস্তমিদং জগৎ বরিষ্ঠম্'।

অনেকের ধারণা যে, ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে বিশ্বসংসারের সকল জিনিস—দরজা জানালা, ঘরবাড়ী, স্বজন-পরিজন সমস্তই শূন্যে উড়ে যায়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যাদের ক্ষণিক সত্তাও অজ্ঞানে থাকে, জ্ঞানে তাদের সত্তাই বা থাকবে না কেন? সুতরাং ক্ষণিক ও আপেক্ষিক যাদের সত্তা, জ্ঞান হ'লে তাদের মিথ্যাজ্ঞানের সংশোধন মাত্র হয়, ভিন্ন বস্তুর মতো তাদের সত্তার নাশ হয় না, সুতরাং তারা অন্য স্থানে ও অন্য রূপে উড়েও যায় না। বেদান্ত বলে, বিশ্বসত্তাই স্বরূপে ব্রহ্মসত্তা। অজ্ঞানসত্তা প্রতীত হয় ভ্রমে, কিন্তু জ্ঞানের উপলব্ধিতে অজ্ঞানসত্তা জ্ঞানসত্তাতেই পর্যবসিত তথা রূপান্তরিত হয়। অচল সাপের গতি হ'লে তাকে বলি চলা-সাপ, কিন্তু সাপ একটা। একই সাপ, না চললে তাকে অচল বা স্থির সাপ বলি, আর চললে তাকে চলা-সাপ বলি।

জগৎ বা সৃষ্টির সত্তা আসলে আরোপিত মিথ্যা (ভুল) সত্তা। ভুল ক'রেই মানুষ সত্যের উপর মিথ্যার আরোপ করে। ভুল করেই লোকে শুক্‌নো কাঠের গুঁড়িকে ভুত (departed spirit) বলে। ভুল করেই দড়িকে মানুষ বলে সাপ। কিন্তু ভুল ভেঙে গেলে সত্য যা—তার জ্ঞান হয়। তবে আচার্য শঙ্কর তাঁর পূর্বসূরীদের চেয়ে একটু প্রগতিশীল দৃষ্টি নিয়ে বলেছেন, যতদিন ভ্রম বা মিথ্যাবুদ্ধি থাকে, ততদিন ভ্রান্তি বা মিথ্যাজ্ঞান ও তার ব্যবহার থাকে। এর নাম ব্যবহারিক সত্তা। ব্যবহারিক সত্তার নাশ হয় পারমার্থিক সত্তার জ্ঞান হ'লে। প্রাতীতিক সত্তাও আছে। প্রাতীতিক সত্তার নাশ হয় অজ্ঞানের অবস্থায়ই। আসলে যিনি সগুণ-নির্গুণের পারে শুদ্ধসত্তামাত্র, তিনি পূর্ণ জ্ঞানস্বরূপই। 'তপঃ' (তপস্যা) বা শুদ্ধ-সংকল্পের সাহায্যে তিনি সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ দুই হ'তে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ তত্ত্বেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন। সিদ্ধান্ত তাঁর তাই। তিনি বলেছেন, তিনি (ব্রহ্ম) সকল-কিছুর অতীত সত্তা, সুতরাং নির্গুণ তো হতেই পারেন, তাছাড়া 'আরও কত কি হতে পারেন। নিত্যেরই লীলা, আর লীলাতত্ত্বের মর্মকথাই তাই।'

ঠিক এই দৃষ্টিতে বিচার করলে ঈশান মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রীরাম-

কৃষ্ণদেবের উপদেশের অর্থ আমরা এ'ভাবে করতে পারি যে, আসক্তির সংসারে নিত্য ও অনিত্য—জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুটি বস্তুসত্তা থাকেই এবং তাদের একটি অসীম ও অবিনশ্বর এবং অপরটি সসীম ও নশ্বর। এটি অবশ্য মায়িক ও ব্যবহারিক দৃষ্টির কথা, পারমার্থিক দৃষ্টির কথা স্বতন্ত্র। মুণ্ডক-উপনিষদে একই সংসার-বৃক্ষে দু'টি সুপর্ণ বা পক্ষীর কথা আছে। তাদের মধ্যে একটি কর্মপাশে আবদ্ধ থেকে কর্মফল ভোগ করে ও অপরটি মায়ানির্মুক্ত হ'য়ে সাক্ষীস্বরূপ। মুণ্ডক-উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে এদের প্রকৃতি ও স্বরূপের কথা বলা হয়েছে—

> দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
> সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
> তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
> নশ্নন্ন্যোঽভিচাকশীতি।

> সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো
> অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
> জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
> মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥

শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদেও অনুরূপ শ্লোক আছে। প্রথম শ্লোকে জীবের কর্মফলাসক্তি ও বন্ধন, আর ঈশ্বরের অনাসক্তি ও মুক্ত স্বভাবের কথা বলা হয়েছে: "একঃ ক্ষেত্রজ্ঞো লিঙ্গোপাধিবৃক্ষামাশ্রিতঃ পিপ্পলং কর্মনিস্পন্নং সুখ-দুঃখলক্ষণং ফলং * * ভক্ষয়তি ** অবিবেকতঃ। অনশ্নন্ অন্য ইতর ঈশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ-মুক্তস্বভাবঃ সর্বজ্ঞঃ * *।" সঙ্গে সঙ্গে দুটি সত্তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে: একটি অনিত্য বা মায়িক সত্তা ও অপরটি নিত্য মায়াতীত স্বরূপসত্তা। দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে, মায়াসক্ত জীব যখন মায়ার আসক্তি ত্যাগ ক'রে সাক্ষীস্বরূপ ঈশ্বরকে দর্শন করে, বা আপন নিরাসক্ত মহিমময় দিব্যস্বরূপ উপলব্ধি করে, তখন তার ভ্রম, সংসারক্লেশ ও দ্বৈতবুদ্ধি থাকে না। আসলে মায়াই জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদসৃষ্টির কারণ। অর্থাৎ মায়া, অবিদ্যা বা অজ্ঞান থাকলে জীব নিত্যজ্ঞান থেকে বঞ্চিত হ'য়ে অনিত্য সত্তার ধারণায় সংস্কারবদ্ধ হয়, আর মায়া, অবিদ্যা বা অজ্ঞান না থাকলে জীব নিত্যজ্ঞানসত্তায় প্রতিষ্ঠিত

থাকে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, সংসারে (মায়ার সংসারে) নিত্যে ও অনিত্যে মিশিয়ে রয়েছে ; বালিতে ও চিনিতে মেশানো। সুতরাং মায়াসক্ত মনুষের পক্ষেই সদসদ্‌বিচারের প্রয়োজন। সদসদ্‌বিচার যিনি করেন তিনি বিবেকী। বুদ্ধির আলোকে বিচার করার পর বিবেকশক্তির বিকাশ হয়। 'বিবেক' বলতে অনিত্য থেকে নিত্যকে পৃথক করা ও সঙ্গে সঙ্গে নিত্যবস্তুতে মনকে নিবিষ্ট করা। বিবেকের দুটি কাজ : (১) এক থেকে অন্যকে, অর্থাৎ অনিত্য থেকে নিত্যকে পৃথক করা ও (২) নিত্য বস্তুতে নিষ্ঠ হওয়া। বিবেক সাহায্য করে বৈরাগ্য বা বিষয়তৃষ্ণা সৃষ্টি করতে। বিবেক যখনই নিত্যকে অনিত্য থেকে পৃথক করে তখনই অনিত্যের প্রতি বিরাগ বা বিতৃষ্ণা আসে ও নিত্যে মন স্থির হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অনিত্য বস্তু থেকে নিত্য বস্তুকে পৃথক করার জন্য বলেছেন : "পিঁপড়ের মতো সংসারে থাকো। * * বালিতে চিনিতে মিশানো, পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।" এর নাম সদসদ্‌বিচার বা বিবেক। "জলে দুধে একসঙ্গে আছে। চিদানন্দ-রস আর বিষয়-রস। হংসের[১] মতো দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে।" অবিদ্যার মধ্যে দ্বৈতজ্ঞান, দুধ আর জল, তাই হংসের মতো জলকে ত্যাগ ক'রে দুধকে গ্রহণ করতে হয়। পরমহংস যাঁরা তাঁরা বিচারী ও জ্ঞানী, তাই হংস বা পরমহংসের মতো মানুষকে সংসারে অনিত্যকে ত্যাগ ক'রে নিত্যকে গ্রহণ করতে বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। অনিত্য বল্‌তে মিথ্যাবুদ্ধি বা মিথ্যাজ্ঞান।

চিদানন্দ-রস ও বিষয়-রসের মধ্যে রসবস্তু একটাই এবং সেই রসে অধ্যস্ত হয় চিদানন্দ ও জাগতিক বিষয়। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এ তত্ত্বটি বুঝানোর জন্য উদাহরণ দিয়েছেন একটি চেয়ার ও ব্রহ্মের। তিনি বলেছেন, আমরা যখন একটি চেয়ারকে বস্তুরূপে জানি তখন চেয়ারটি আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়। তেমনি ব্রহ্মবস্তুকে যখন জানি তখন ব্রহ্মবস্তুও হয় আমাদের জ্ঞানের বিষয়। সুতরাং উভয়েই বিষয় হয় একই জ্ঞানের। জ্ঞান একটা, কিন্তু তার বিষয় দুই বা বহু বস্তু। তেমনি একই চৈতন্যে প্রতিভাত (অধ্যস্ত) হয় বাহ্যিক ও আন্তরিক সকল-কিছু বিষয়, অথচ সকল বিষয়ের আধার বা অধিষ্ঠান এক ও অদ্বিতীয় চৈতন্য। অদ্বিতীয় ব্যাপকচৈতন্য ব্রহ্মই সকল-কিছুর প্রকাশক—'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি',

১। "হংসঃ (হন্তি অবিদ্যা-তৎকার্যানি ইতি হংসঃ) পরমাত্মা।"

'তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্বম্'। সুতরাং সকল বস্তুর প্রকাশক ও ধারক ব্রহ্ম-চৈতন্যই একমাত্র নিত্যসত্তা। এই নিত্যসত্তাই আমাদের বরণীয় ও গ্রহণীয়। মায়ার আবেশে নিত্যসত্তাকে আমরা সর্বদাই অনিত্য ব'লে ভুল করি। এ ভুল করার নাম মিথ্যাজ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মিথ্যা ও সত্য এই বিশেষণ-দুটিকে ত্যাগ ক'রে উভয়ের আধার বা অধিষ্ঠান যে এক ও অদ্বিতীয় জ্ঞান সে জ্ঞানেরই আশ্রয় নিতে বলেছেন। সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ সে আধার-জ্ঞানই অধিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব পুনরায় বলেছেন: "আর পানকৌটির মতো। গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে ফেলবে।" পানকৌটির পাখা অত্যন্ত মসৃণ তাই, তাতে জল লাগলে ঝেড়ে ফেল্লে সমস্ত জল পড়ে যায়। তেমনি ব্রহ্মবিজ্ঞান যিনি লাভ করেছেন, তিনি জ্ঞানী, তিনি চিরমুক্ত, কর্মফল কোনদিন তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি চোর-চোর-খেলায় বুড়ি ছোঁওয়া খেলুড়ের মতো সর্বদাই দ্রষ্টা ও স্বাক্ষী। সংসারের মায়া ও মমতা তাঁকে আর উদ্বেলিত করতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মানুষমাত্রকে তাই জীবন্মুক্তির আশীর্বাদ নিয়ে সংসার করতে বলেছেন,—যেমন সংসার করেছিলেন মিথিলাধিপতি জনক। জনকরাজা জ্ঞানদীপ্ত হয়ে এদিক ওদিক দু'দিক রেখেছিলেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ চিরমুক্ত ছিলেন, আবার নিরাসক্ত হ'য়ে রাজ্যশাসনও করেছিলেন। তেমনি ধর্মব্যাধও ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানী, আবার সংসারী। ব্রহ্মজ্ঞান ও সংসারজ্ঞান এ দু'দিকের সমতা রাখতে হ'লে অবিদ্যার পারে যেতে মুক্তিময় করতে হয় জীবনকে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব পুনরায় বলেছেন: "আর পাঁকাল-মাছের মতো। (পাঁকাল-মাছ) পাঁকে থাকে, কিন্তু গা দেখ—পরিস্কার ও উজ্জ্বল।" পাঁকাল-মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু পাঁক তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্‌লে যেমন হাতে আঠা লাগে না, তেমনি জ্ঞান লাভ ক'রে সংসারে কর্ম করলে কর্ম মানুষকে বিচলিত ও ফললাভের আসক্তিতে বদ্ধ করতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলেছেন, সংসারে বাসনা-কামনারূপ গোলমাল থাকলেও তার মধ্যে একটি সারবস্তু থাকে এবং সেই সারবস্তু আত্মা। সেই আত্মার স্বরূপ ও বিকাশ কি সে সম্বন্ধে মুণ্ডক-উপনিষৎ বলেছে

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম
পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্ধ্বঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং
বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥২।৪৪

'অমৃতস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্ম অগ্রে, পশ্চাদ্‌ভাগে, দক্ষিণে ও উত্তরে, অধোভাগে ও উর্ধ্বভাগে পরিব্যাপ্ত। অধিক কি এ বিশাল বিশ্বও ব্রহ্মস্বরূপই। সুতরাং সংসার বা সৃষ্টি অসার্থক ও অসার একথা একেবারে স্বীকার করা ঠিক নয়। ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন এই বিশ্বচরাচর। সৃষ্টি তাঁর বহির্বিকাশ, লীলা ও মহিমা। আপন মহিমা উপলব্ধি করার জন্য তিনি যেমন সৃষ্টিরূপে নিজেকে বিকাশ করেন, তেমনি আবার সৃষ্টির অণু-পরমাণুতে আসন রচনা ক'রে তিনি বিরাজ করেন—'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ'। সুতরাং সৃষ্টি বা সংসার তাদেরই কাছে বন্ধন মনে হয় যারা সৃষ্টি ও স্রষ্টা এ দুটির সত্যকারের রহস্য জানে না। আসলে সৃষ্টি ঈশ্বরেরই লীলাভূমি। তাঁর লীলা যাঁরা উপভোগ করেন, তাঁরাই ভাগ্যবান। অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে লীলা মিথ্যা ও ঈশ্বর নিত্য ও সত্য, কিন্তু যাঁরা দ্বৈত ও ভেদজ্ঞানের পারে অদ্বৈতজ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করেন তাঁদের চৈতন্যসমাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে নিত্য ও লীলা টাকার এ'পীঠ ও'পীঠ; কেননা যিনি লীলা-রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন, তিনিই আবার নিত্য-রূপে আপন মহিমায় মহিমময় হয়। তাই বিচারপ্রসূত জ্ঞানেই কেবল ভেদ, কিন্তু বিশুদ্ধজ্ঞানে অভেদ। আসলে জ্ঞানদৃষ্টির প্রকাশ হ'লে নিত্য ও লীলার মধ্যে কোন ভেদ বা ব্যবধান দেখা যায় না। তখনই স্বরূপদৃষ্টি। ব্রহ্মজ্ঞানী বা আত্মজ্ঞানী যাঁরা, তাঁদের দৃষ্টি চৈতন্যময় হয়। জড়ের প্রতি দৃষ্টি থাকলেও সে জড় যে চৈতন্যেরই আর এক রূপ এই বুদ্ধির স্ফুরণ হয়। এ ধারণা সাধারণ মানুষের কাছে রহস্যময় বোলে মনে হয়। দুটি বস্তু—আলোক ও অন্ধকারকে নিয়ে যাদের কারবার, তারা এককে ভালোবাসতে পারে না আর এককে না ভালোবাসলে অভেদজ্ঞান লাভ করা যায় না। গীতায় আছে; 'সমদর্শী যিনি-তিনি বিড়াল, কুকুর, মানুষ সকলের মধ্যেই আত্মার দর্শন করেন বলে আর কাকেও উচ্চ-নীচ জ্ঞান করেন না; সকলেই তাঁর চক্ষে সমান—'পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ'।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ সংসার করায় দোষ নাই ॥

"শ্রীরামকৃষ্ণ। সত্য বলছি, তোমরা সংসার করছো—এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে, তা না হ'লে হবে না। এক হাতে কর্ম করো, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো। কর্ম শেষ হ'লে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ (১৩৬১), পৃঃ ৫৫

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সংসার করতে কাউকে নিষেধ করেন নি, নিষেধ করেছেন সংসারকে আমার আমার বলে মনে করতে, আর সংসারের কাজে আসক্ত হওয়াকে। এ স্বার্থের আসক্তির নাম 'মোহ'। সংসার-সমুদ্রে নৌকো ভাসাতে তিনি নিষেধ করেন নি, নিষেধ করেছেন নৌকোর মধ্যে যাতে জল যেন প্রবেশ না করে। নৌকোয় জল ঢুকলেই নৌকো ডুবে যায়। তারপর সংসারকে যদি কেউ ঈশ্বরের সংসার বা মহামায়ার সংসার ব'লে মনে করে ও নিরাসক্তভাবে কর্ম ক'রে জীবনযাপন করে তাহলে সংসার করায় দোষ নাই।

এখন সংসার কি ও কাকে বলে? আমরা স্বজন-পরিজন নিয়ে একসঙ্গে যেখানে বাস করি তাকেই সাধারণভাবে সংসার ব'লে মনে করি। একসঙ্গে থাকা ও থাকার ধারণা বেশ প্রাচীন। সৃষ্টির পর পৃথিবী যখন জীবজন্তু, মানুষ ও সকল প্রাণীর বাস করার উপযোগী হোল তখন বিশেষ ক'রে মানুষ একসঙ্গে বাস ক'রে সমাজ সৃষ্টি করলো। পশুপক্ষী এবং সকল প্রাণীও তাই। এক এক জাতি—পশুজাতি, পক্ষীজাতি, মনুষ্যজাতি সকলে জলে স্থলে,

অরণ্যে-লোকালয়ে, আকাশে ও সর্বত্রই বাস করতে লাগলো, আর তাই থেকে তাদের সমজাতীয় সমশ্রেণীর সমাজ গড়ে উঠলো। অবশ্য সংসারের এই ব্যাখ্যা ও ধারণা সমাজদৃষ্টির দিক থেকে সার্থক।

কিন্তু পরিণত মানবচিন্তার দিক থেকে সংসারের একটি বা কতকগুলি অর্থের সার্থকতা আছে যাকে আমরা দর্শনচিন্তার শ্রেণীভুক্ত করতে পারি। দার্শনিক চিন্তার বিকাশ ও অবকাশ অবশ্য মানুষের পরিণত বুদ্ধি-বিকাশের ক্ষেত্রেই দেখি। সেদিক থেকে অর্থাৎ দর্শনচিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে সংসারকে বলা হয় পরিবর্তনশীল কর্মক্ষেত্র—যা কোনদিন ও কোন সময়েই একভাবে থাকে না, নিত্য-নূতন রূপে ও ভাবে তার পরিবর্তন হয় আর সে পরিবর্তন বিকারী ও অনিত্য। শঙ্করাচার্য প্রভৃতি অদ্বৈতবেদান্তী ও অন্যান্য বাদের বা মতের দার্শনিক সাধকরা সংসারকে পরিবর্তনধর্মী বলেছেন ও সে'দিক থেকে পরিবর্তনশীল বস্তুকে আশ্রয় ক'রে মানুষ কোনদিন শাশ্বত সুখ ও শান্তি লাভ করতে পারে না। সেজন্য তারা সংসারকে ত্যাগ করা বলতে সংসারের চলমানতারূপ অনিত্যতাকে ত্যাগ ও অনিত্য সংসারকে নিত্য বলে মনে করার ভুলজ্ঞান (ভ্রান্তিকে) দূর করতে বলেছেন।

সংসার-সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টিভঙ্গী তাই। সংসার করাকে তিনি দোষ-ত্রুটি বলেন নি, দোষ-ত্রুটি বলেছেন পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীকে এবং সে দোষদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী হোল অনিত্য সংসারকে নিত্য ব'লে মনে করায় এবং পরিবর্তনশীল সংসারকে পরমার্থ ও নিত্য বলে গ্রহণ করায়। মনে করা, অর্থাৎ মনের সম্মতি দিয়ে গ্রহণ করার ব্যাখ্যা ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তার পরেই (শ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ৫৫) আবার বলেছেন: "মন নিয়ে কথা।" এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যোগবাশিষ্ট-রামায়ণের যেন প্রতিধ্বনি করেছেন। যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ বলেছে, মনই বিশ্বদৃষ্টির কর্তা—'মনো হি জাগতাং কর্তৃ'। প্রাচ্য-মনোবিজ্ঞানী পতঞ্জলির 'যোগদর্শন' ও পাশ্চাত্য-মনোবিজ্ঞানী বহু মনীষী মনের কার্য ও কর্তৃত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক'রে বলেছেন, মানুষ সকল-কিছু করে মনের সাহায্য নিয়ে। মন ইচ্ছারূপে (ইচ্ছা মনেরই বিকাশ) প্রেরণা দেয় ইন্দ্রিয়দের, আর ইন্দ্রিয়গুলি সে'ভাবে কার্য করে। অর্থাৎ অব্যক্ত প্রেরণা ব্যক্ত আকারে প্রকাশ পেলে তাকে বলি আমরা কর্ম। একথাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটু ভিন্নভাবে বলেছেন: "মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই

মুক্ত। মন (মনকে) যে রঙ্গে (রঙে) ছোবাবে, সেই রঙ্গেই ছুপবে। যেমন ধোপা-ঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজরঙ্গে ছোপাও সবুজ। যে রঙ্গে ছোপাও সেই রঙ্গেই ছুপবে।" তাই তাঁর কথা: "মন নিয়েই সব" সত্য। সংসারের ধর্ম চলমানতা। চলমানতা বল্‌তে যা একরকম ভাবে বা একরূপে কোন সময়ে থাকে না। সুতরাং সেই চলমানতাকে অচঞ্চল স্থির ব'লে মনে ক'রে আমরা বিষম ভুল করি, আর এ ভুলের নামই ভ্রম বা ভ্রান্তি। তারপর আমরা যে ভ্রম করি ও ভ্রম করি না— এ'দুটিও মনের কর্ম ঐ কর্ম মনের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে হয়। যেমন, (১) 'ভ্রম করি' তখনই যখন সংসারে আমরা মমত্ব বা 'আমার'-বুদ্ধি আরোপ করি ও ঈশ্বরকে ভুলে গিয়ে অনিত্য সংসারকে নিত্য বলে মনে করি। (২) আর 'ভ্রম করি না' তখনই যখন সংসারের ধর্ম যাই হোক না কেন, ঈশ্বর সংসার সৃষ্টি করেছেন ও সংসার ঈশ্বরেরই লীলাভূমি, এবং আমরা তাঁর লীলার অংশগ্রহণকারী—এ'কথা মনে করি। এই মনোভাব ঈশ্বরদৃষ্টিকে সজাগ রাখার অনুকূল এবং এ দৃষ্টিতে (মনোভাবে) ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ ও আত্মনিবেদনের ভাব পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। ঈশ্বরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ সংসারে আর 'আমার'-রূপ মমত্ববুদ্ধি আনে না, সে মনে করে ঈশ্বরেরই সংসার, ভাবে—ঈশ্বর যন্ত্রী ও মানুষ যন্ত্রমাত্র, যেমন তিনি চালান, তেমনি মানুষ চলে। এ দৃষ্টিতে (মনোভাবে) বন্ধন হয় না, বরং মুক্তির আশীর্বাদই বর্ষিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "* * তোমরা সংসার করছো এতে দোষ নাই। তবে **ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে**। * * এক হাতে কর্ম করো, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ডাকো। কর্ম শেষ হলে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।"

ঈশ্বরকে ধরে থাকাই আসল কাজ। যিনি ঈশ্বরকে ধরে থাকেন তিনি 'অহং'-ভাবে জলাঞ্জলি দিয়েছেন। পূর্বে আলোচনা করেছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'অহংকারই অজ্ঞান। অহং-আবরণ জ্ঞানসূর্যকে সর্বদা আবৃত ক'রে রাখে।' সুতরাং 'আমি' বা 'অহং'-অভিমান মন থেকে চলে গেলেই হোল। **"আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল"**। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলেছেন: "মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত।"

এখানে 'মনেতে' বন্ধন বলতে মনে করাতে বন্ধন, আর মনে করাতেই

মুক্তির সার্থকতা। বেদান্ত তাই সকলকে সে বাণীই শুনিয়েছে—'মনে করো যে, তুমি বদ্ধ নও, জীব নও, মুক্ত ও ব্রহ্মস্বরূপ।' শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্রাহ্মদিগকে উপদেশ দেবার সময়ে (শ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ৫৬) ঠিক এ'কথাই বলেছেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণদেব (ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি) বলেছেন: "মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। আমি মুক্ত পুরুষ, সংসারেই থাকি, বা অরণ্যেই থাকি, আমার বন্ধন কি! আমি ঈশ্বরের সন্তান, রাজাধিরাজের ছেলে, আমায় আবার বাঁধে কে? যদি সাপে কামড়ায়, 'বিষ নাই' জোর ক'রে বললে বিষ ছেড়ে যায়! তেমনি 'আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত' এ কথাটি রোক ক'রে বলতে বলতে তাই হয়ে যায়। মুক্তই হয়ে যায়।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব পুনরায় বলছেন: "যে ব্যক্তি 'আমি বদ্ধ', 'আমি বদ্ধ' বারবার বলে, সে শালা বদ্ধই হ'য়ে যায়! 'যে রাতদিন আমি পাপী', 'আমি পাপী' এই (মনে) করে, সে তাই হ'য়ে যায়। ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই: 'কি! আমি তাঁর (ঈশ্বরের) নাম করেছি, আমার এখনও পাপ থাকবে! আমার আবার পাপ কি। আমার আবার বন্ধন কি'!" নিজেকে শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ মনে করলে মনে শুদ্ধ-সংস্কার সৃষ্টি হ'য়ে অশুদ্ধ-সংস্কার নাশ (অশুদ্ধ-সংস্কারকে রূপান্তরিত) করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ সব শুদ্ধ হয়ে যায়।" নাম করার পূর্বে ভগবানকে মনে করতে হয় এবং এ'মনে করাতে চিত্তশুদ্ধিরূপ রূপান্তর সৃষ্টি হয়।

বেদান্তে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের চরমসার্থকতা নির্ভর করে মনন-শীলতার উপর। এই মননশীলতা সার্থক হয় মনকে নিরুদ্ধ বা মনের রূপ-পরিবর্তনে—যাকে ইংরেজীতে বলে transformation। Transformation বা রূপান্তর করার অর্থ সংকল্প ও বিকল্প-বৃত্তিযুক্ত চঞ্চল মনকে স্থির ক'রে সমাধিস্থ করা। তাই পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তিনিরোধের নাম 'সমাধি' বলেছেন। মন যখন স্থির ও প্রশান্ত হয়, তখন মন সংকল্প ও বিকল্প-রূপ বৃত্তি থেকে বিরত হয়। তখন মন স্বরূপে প্রকাশিত হয়। তখনই হয় সমাধি। মনের স্বরূপ বা নিজ রূপ চৈতন্য। সংকল্পবিকল্প-রূপ বৃত্তি অহং বা অহংকারের আবরণ। আবরণই চৈতন্যের প্রকাশকে আবৃত ক'রে রাখে,

পারে। আবৃত করার জন্য আমরা স্বচ্ছ প্রকাশ দেখতে পাই না। এ দেখার নাম উপলব্ধি। বেদান্ত এ আবরণকে অজ্ঞান বা অবিদ্যা বলেছে। সুতরাং সেদিক থেকে অর্থাৎ বেদান্তের দৃষ্টিতে সংকল্প-বিকল্পযুক্ত সচঞ্চল মন অজ্ঞানের সামিল। এই মনরূপ অজ্ঞান মনকে ও বিশ্বের সকল জিনিসকে ব্রহ্মচৈতন্য ব'লে জানতে দেয় না। মনকে তাই পরিশুদ্ধ অর্থে সংকল্প-বিকল্পরূপ বৃত্তিদুটিকে (অসংখ্য বাসনা-কামনারূপ তরঙ্গমালাকে) দূর বা শান্ত ক'রে মনের সকল বস্তুকে ব্রহ্মচৈতন্য রূপে উপলব্ধি করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই আলোচনা ও তত্ত্বকে একটু ভিন্ন অথচ অপরূপভাবে সহজ সরল ভাষায় বলেছেন : "মন নিয়েই সব। একপাশে পরিবার একপাশে সন্তান। একজনকে (স্ত্রীকে) একভাবে, সন্তানকে আর একভাবে, কিন্তু একই মন।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব (বেদান্তসাধনার ভাব নিয়ে) বলেছেন : "মনে যেমন ভাববে বা চিন্তা করবে, তার ফলও তেমনি হবে।" তিনি বলেছেন : "মনকে যদি কুসঙ্গে রাখো তো সেই রকম কথাবার্তা, চিন্তা হয়ে যাবে। যদি ভক্তসঙ্গে রাখো, তা হলে ঈশ্বরচিন্তা, হরিকথা—এই সব হবে।" সুতরাং 'মন নিয়েই সব'। মন সংস্কারের সমষ্টি। পাশ্চাত্য দার্শনিক ডেভিড হিউমও মনকে সংস্কারের সমষ্টি বলেছেন : 'The mind is the bundle of sensations'। তাঁর মতে সংস্কারগুলি সর্বদা চলমান মেঘের মতো—'life is the flying clowds'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন, মন যেন সরষের পুঁটুলি। বাঁধা থাকলে সব সরষে একসঙ্গে থাকে, কিন্তু পুঁটুলি ছিঁড়ে গেলেই সরষগুলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

আসলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বেদান্ততত্ত্বেরই আভাস দিয়েছেন। মানুষের অন্তঃকরণও ইন্দ্রিয়, তবে অন্তরিন্দ্রিয়। অন্তঃকরণ একটাই, কেবল বৃত্তি বা কার্যভেদে কখনও মন-রূপে, কখনও চিত্ত-রূপে, কখনও অহংকার-রূপে তা আত্মপ্রকাশ করে। অন্তঃকরণের গঠন ও প্রকৃতি সাংখ্যের প্রকৃতির মতো। প্রকৃতি একটাই ও সে প্রকৃতির রূপ সৃষ্টি করে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ। সুতরাং প্রকৃতি তিন গুণের সমষ্টি। অথবা গুণসাম্যই প্রকৃতি। প্রকৃতির কার্য ও প্রকাশের অবস্থাভেদে কখনও শান্তভাবের প্রকাশক, কখনও কর্ম-চাঞ্চল্যের প্রকাশক রজঃগুণ, আবার কখনও অহং বা তামসভাবের প্রকাশক

তমঃগুণ-রূপে প্রকাশ পায়। সাংখ্যকার কপিল তাই প্রকৃতির দুটি অবস্থার কথা বলেছেন : একটি, সাম্যবস্থা অর্থাৎ সম বা শান্ত অবস্থা ও অপরটি, গুণক্ষোভ বা চঞ্চল অবস্থা। ক্ষোভ কিনা বিকাশ বা বিস্তৃতি। অন্তঃকরণও তাই। মন অন্তঃকরণের একটি বৃত্তি বা কার্য। কোন পুকুরের জলে যদি একটি ঢিল পড়ে, তবে তা ছোট ছোট তরঙ্গের সৃষ্টি করে ও সেই তরঙ্গ ক্রমে বিস্তার লাভ ক'রে পুকুরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বৃত্তিও তেমনি। বৃত্তিও একটি তরঙ্গ বা কার্য। মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার এক একটি তরঙ্গবিশেষ। অনেক সময়ে মন ও অন্তঃকরণকে আমরা একই অর্থে ব্যবহার করি। আসলে মন বা অন্তঃকরণ সংস্কারের আধার। অসংখ্য অতীত জীবনে আমরা যে সকল কর্ম করেছি ও বর্তমান জীবনে করি—সকল-কিছুই সূক্ষ্ম-সংস্কারের আকারে মনে অর্থাৎ অন্তঃকরণে সঞ্চিত থাকে। এ সংস্কারসঞ্চিত মন বা অন্তঃকরণকে পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে (সাইকোলজিতে) সাবকন্‌নাস্ অর্থাৎ 'অবচেতন-মন' বলা হয়েছে। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে মনকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছে : চেতন (মন), অবচেতন (মন) ও পরাচেতন (মন)—ইংরেজীতে যাদের নাম conscious (mind), subconscious (mind) ও superconscious (mind)। সাবকন্‌সাস বা আন্‌কন্‌সাস্ তথা অবচেতন মনকে ভারতীয় দর্শনে ও বিশেষ ক'রে তন্ত্রশাস্ত্রে কামকলা বা কুণ্ডলিনীশক্তি বলা হয়েছে। কাম কিনা ইচ্ছা বা বাসনা—যা মন বা অন্তঃকরণের আকারেই থাকে। যখন কোন ইচ্ছা মনে বা অন্তঃকরণে প্রকাশিত না হয়ে অপ্রকাশিত বা অব্যক্ত থাকে তখন কুণ্ডলিনী (coiling or concentrated energy)। সাধক রাম-প্রসাদ কুণ্ডলিনী-শক্তিকে বলেছেন : 'প্রসুপ্তা ভুজগাকারা স্বয়ম্ভুশিববেষ্টিনী'। মূলাধারে প্রসুপ্ত বা কুণ্ডলীকৃত সর্প অর্থাৎ জীব (প্রাণশক্তি) সহস্রারে স্বয়ম্ভু বা সনাতন শিবরূপী ব্রহ্ম। শক্তি শিববেষ্টিনী বলার উদ্দেশ্য শিবশক্তি-সামরস্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, চলা (চঞ্চল) সাপ ও স্থির (অচঞ্চল) সাপ এক ও অভিন্ন, কেননা যে সাপ চলে বা চঞ্চল. সে সাপই আবার চলে না বলতে স্থির বা অচঞ্চল। তন্ত্রে শক্তি ও শিব তাই স্বরূপে অভিন্ন, কেবল প্রকাশে ভিন্ন।

তন্ত্রশাস্ত্রে কামকলা বা কুণ্ডলিনীশক্তিকে কুণ্ডলীকৃত সর্প ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। সর্প গতি ও শক্তির প্রতীক। সর্প energy, তাই তা সর্বদাই

ক্রিয়াশীল ও চঞ্চল। কুণ্ডলিনীশক্তি বহুজন্মের সঞ্চিত ও পুঞ্জীভূত অসংখ্য কর্ম-সংস্কারের রূপ। সংস্কররাশি মনের সুবিশাল অবচেতনস্তরে (মূলাধারে) প্রথমে গতিহীন, ক্রিয়াহীন ও প্রকাশহীন হয়ে বিমর্শশক্তিরূপে নিদ্রিত থাকে। মানুষের ইচ্ছার অভিঘাতে (প্রেরণায়) তা জাগ্রত হয়। তবে সকল সংস্কারই যে জাগ্রত হয়—তা নয়। যেগুলি ইচ্ছার তাড়নায় বা প্রেরণায় জাগ্রত হয় সেগুলিকে উদ্বুদ্ধ-সংস্কার বলে। উদ্বুদ্ধ-সংস্কার ভাল ও মন্দ—সৎ ও অসৎ—দু'রকম হয়। শুদ্ধ বা সৎ-ইচ্ছার প্রেরণায় মনে সৎ সংস্কার ও অশুদ্ধ বা অসৎ-ইচ্ছার প্রেরণায় অসৎ-সংস্কার সৃষ্টি হয়। পরে কার্যের আকারে তারা প্রকাশ পায়। বাসনার ভাণ্ডার মন বা অন্তঃকরণ। সুতরাং মনে শুদ্ধ বা সৎ-বাসনার প্রেরণা এলে তা মনের অবচেতনস্তরে যে শুদ্ধ বা সৎ-সংস্কার সঞ্চিত থাকে তাদের চেতনস্তরে কার্যাকারে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন, habit by counter-habit; অর্থাৎ সংস্কারের সাহায্যেই সংস্কারকে পরিশুদ্ধ করতে হয়। অশুদ্ধ বা অসৎ-সংস্কার বিনষ্ট হয় বল্তে অশুদ্ধ-সংস্কার রূপান্তরিত হয় শুদ্ধ বা সৎ-সংস্কারে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, পায়ে কাঁটা ফুটলে যেমন অন্য একটা কাঁটা দিয়ে তা তুলে ফেলতে হয় ও পরে দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়, তেমনই সৎ-সংস্কার দিয়ে অসৎ-সংস্কার দূর করতে হয়। সংস্কারই বন্ধন। সংস্কারই আসক্তি ও অজ্ঞান। তাই সকল সংস্কারের পারে না গেলে মুক্তি ও ঈশ্বরোপলব্ধি হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'মন নিয়ে কথা। মন নিয়েই সব'। মন এখানে সংস্কার —ভাল ও মন্দ। তাই মনকে পরিশুদ্ধ করতে হয় মনের চঞ্চল অবস্থাকে শান্ত ক'রে। মনেরই কার্য চিন্তা, তাই কার্য দিয়ে কারণের রূপান্তর ঘটানো দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ'প্রসঙ্গ একটু ভিন্নভাবে করেছেন: "তিনি (ঈশ্বর) মনকে আঁখি ঠেরে ইসারা ক'রে বলে দিয়েছেন—'যা, এখন সংসার করগে যা'। মনের কি দোষ! তিনি (ঈশ্বর) যদি আবার দয়া ক'রে মনকে ফিরিয়ে দেন, তাহলে বিষয়বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি হয়। তখন আবার তাঁর (ঈশ্বরের) পাদপদ্মে মনে হয়" (শ্রীকথামৃত ১ম ভাগ, পৃঃ ৫৪-৫৫)। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই মনের মোড় (গতিকে) ফেরাতে বলেছেন—'মোড় ফিরিয়ে দে'। মন সকল বিষয়ের আসক্তিতে ডুবে থাকে। আবার সদসদ্-বিচার ক'রে সকল আসক্তির সে পারে যেতে পারে। মনে যদি কল্যাণময়ী

মুক্তির ইচ্ছা জাগে তবে তা সৎ-সংস্কারের রূপ ধরে অসৎ, অশুভ বা বন্ধন-সংস্কারকে দূর করে ও আত্মোপলব্ধির পথে সাধককে পরিচালিত করে। তাই মন দিয়েই মনকে শিক্ষিত, সংস্কৃত ও মুক্তির পথে পরিচালিত করতে হয়।

পূর্বেই বলেছি শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, সংসার করায় দোষ নাই, "তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে।" শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন : 'কর্মের সংসারে কর্ম করো, নইলে মিথ্যাচারী হবে।' শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "এক হাতে কর্ম করো, আর একহাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো। কর্ম শেষ হলে তুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।" এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে অন্য হাতে যখন মানুষ কর্ম করে তখন কর্মে ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে পরকল্যাণের জন্যই সে কর্ম করে। নিরাসক্ত-ভাবে কর্ম করলে চিত্ত তখন ধ্যানমুখী হয় এবং পরে ঈশ্বরই নিত্য ও ঈশ্বর ছাড়া বিশ্বসংসারে কোন-কিছু নাই—মনে এই স্থিরবুদ্ধি হয়। তখন সাধনার আর প্রয়োজন থাকে না। তখন ঈশ্বরকে তুই হাতে ধ'রে বলতে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার সব-কিছু ঈশ্বরকে অর্পণ ক'রে সাধক ঈশ্বরের শরণাগত হয়। এ শরণাগতি বা ঈশ্বরপ্রপত্তিই মানুষকে বন্ধনমুক্তির আশীর্বাদ দান করে। আর তখনই—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থীশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি, তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

মুক্তি বা আত্মোপলব্ধি হ'লে মনের সকল সংশয় ও সকল কর্মের অবসান হয়। কর্মশেষের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান দূর হয় ও আত্মজ্ঞানে মানুষের জীবন সমুজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।[১]

১। পূর্বেও এ সম্বন্ধে ভিন্নভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ ॥

[সচ্চিদানন্দ ও সচ্চিদানন্দময়ী—ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি অভেদ]

"শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞানী ব্রহ্মকে জানতে চায়। ভক্তের ভগবান,—ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ সর্বশক্তিমান ভগবান। কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যিনি সচ্চিদানন্দ, তিনিই সচ্চিদানন্দময়ী। যেমন, মণির জ্যোতিঃ ও মণি। মণির জ্যোতিঃ বল্‌লেই মণি বুঝায়, মণি বল্‌লেই জ্যোতিঃ বুঝায়। মণি না ভাবলে মণির জ্যোতিঃ ভাবতে পারা যায় না, মণির জ্যোতিঃ না ভাবলে মণি ভাবতে পারা যায় না।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ (১৩৬৬), পৃঃ ১২৪

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এ ধরনের উপদেশ নিয়ে পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। তবে চরম-জীবনোপলব্ধির প্রসঙ্গ যেখানে,সেখানে পুনরাবৃত্তি হওয়ায় কোন দোষ নাই। অদ্বৈতবেদান্তও একথা স্বীকার করে যে, বেদান্তবাক্য বারংবার অনুশীলন করা প্রয়োজন, তবেই মহাবাক্য ও উপদেশের মর্ম বোঝা যায়। 'বোঝা যায়' বল্‌তে প্রাণে প্রাণে অনুভব করা যায় ; বোধে বোধ—যাকে বলে অপরোক্ষ-ব্রহ্মানুভূতি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব পূর্বোক্ত কথাগুলি বলেছেন বিচারপথসম্পর্কে। বিচারপথ যেমন "শ্যামারূপ—পুরুষ-প্রকৃতি—যোগমায়া—শিব-কালী ও রাধা-কৃষ্ণ-রূপের ব্যাখ্যা—উত্তম ভক্ত" প্রভৃতি আলোচনার ও প্রসঙ্গের বিচার (শ্রীশ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ, ৩য় পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১১৫)। সেখানে 'শ্যামা পুরুষ—না প্রকৃতি' এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সমন্বয়ী অদ্বৈতদৃষ্টিসেবী শ্রীশ্রীরাম-

কৃষ্ণদেব বলেছেন: "যিনি শ্যামা, তিনিই ব্রহ্ম। যাঁরই রূপ, তিনিই অরূপ। যিনি সগুণ, তিনিই নির্গুণ। ব্রহ্ম শক্তি—শক্তি ব্রহ্ম—অভেদ। সচ্চিদানন্দময়, আর সচ্চিদানন্দময়ী।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বেদান্তবিচার ও বেদান্ততত্ত্বের মধ্যে এক অরূপতা ও বৈশিষ্ট্য আছে সেকথা পূর্বে বলেছি। এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার প্রভৃতি ভাব ও বিকাশের কথা আচার্য শঙ্করও বলেছেন, তবে ভিন্নভাবে। তিনি বলেছেন একটিকে বিকার ও অপরটিকে অবিকার। বিকার কিনা ভিন্ন রূপ বা পরিবর্তন। অবিকার একভাবেই থাকে, তার কোন পরিবর্তন হয় না। বিকার পরিবর্তন, সুতরাং আচার্য শঙ্করের মতে বিকার অনিত্য বা মিথ্যা। অনিত্যকে নিত্য ব'লে মনে হয় ভ্রমে। শঙ্করাচার্য বলেছেন, ভ্রম ও মিথ্যাজ্ঞান এক। সুবর্ণপিণ্ড (সোনা) থেকে নানা রকমের অলঙ্কার হয়; মাটি থেকে নানা রকমের মাটির পাত্র হয়; শঙ্করাচার্যের মতে, সোনা বা মাটিই সত্য, আর সোনা ও মাটি থেকে তৈরী অলঙ্কার ও বাসনপত্র অসত্য, কেননা সোনা ও মাটি থেকে ঐগুলি নামে ও আকারে পৃথক। বেদান্তের মতে, নাম ও রূপ মিথ্যা। তাই আচার্য শঙ্কর নাম ও রূপকে মিথ্যা অর্থে পরিণামী ও বিকারী বলেছেন। পাশ্চাত্যদর্শনে বিজ্ঞানবাদী (আইডিয়ালিষ্ট) দার্শনিকরাও স্পেস ও টাইমকে (দেশ ও কালকে) পরিবর্তনশীল ও অনিত্য বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনদৃষ্টি ঠিক এ ধরনের নয়, তাদের থেকে একটু ভিন্ন। তিনি বলেছেন: "যিনিই শ্যামা, তিনিই ব্রহ্ম। যাঁরই রূপ, তিনিই অরূপ। যিনি সগুণ, তিনিই নির্গুণ। ব্রহ্ম শক্তি—শক্তি ব্রহ্ম অভেদ।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্বৈতদৃষ্টি লক্ষ্য করার বিষয়। তাঁর দৃষ্টি 'যিনি'-তে। 'যিনি' হলেন দ্বৈতবিহীন এক অদ্বিতীয় চৈতন্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—'অভেদ'। যিনি সচ্চিদানন্দময় পুরুষ বা ব্রহ্ম, তিনিই সচ্চিদানন্দময়ী প্রকৃতি বা শক্তি। একই পরমার্থ—উপাধি-হীন চৈতন্য (ব্রহ্মচৈতন্য)। যিনি সগুণ ও নির্গুণ নন, সাকার ও নিরাকার নন, তিনিই আবার গুণরূপ উপাধিকে নিয়ে সগুণ-ব্রহ্মচৈতন্য এবং সগুণ থেকে অতীত নির্গুণ-ব্রহ্মচৈতন্য। একই চৈতন্যবস্তু, কখনও লীলায় সগুণ ও সাকার, কখনও নিত্যে নির্গুণ ও নিরাকার। মোটকথা এক ও অদ্বিতীয় শুদ্ধচৈতন্যই (ব্রহ্মচৈতন্য) কখনও সাকার, কখনও নিরাকার; কখনও সগুণ,
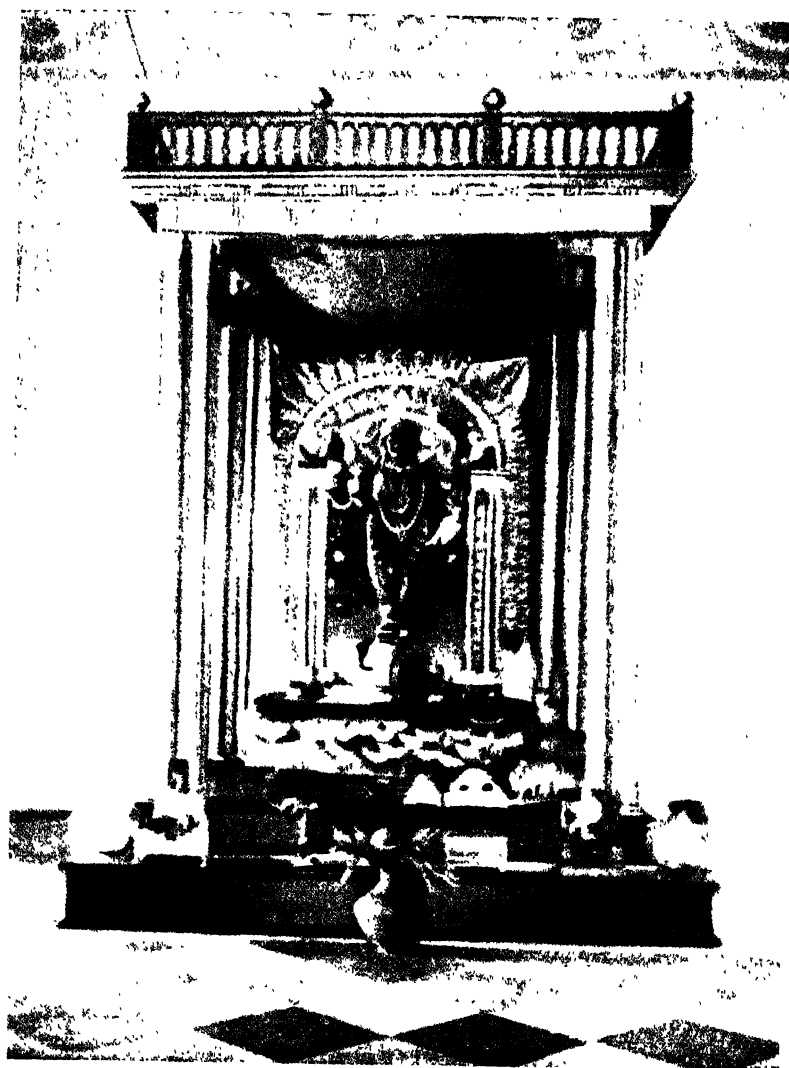
দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্থের-অধিশ্বরী

শ্রীশ্রীভবতারিণী

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দির
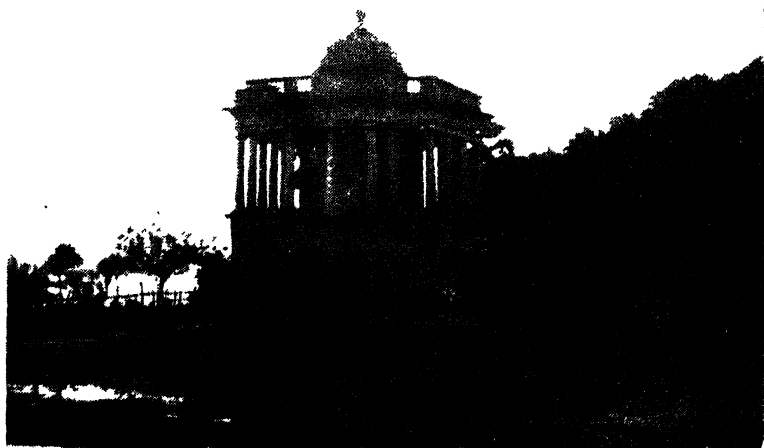
নহবৎখানা (যেখানে শ্রীশ্রীমা থাকতেন

দক্ষিণেশ্বর-পঞ্চবটী-সাধনক্ষেত্র
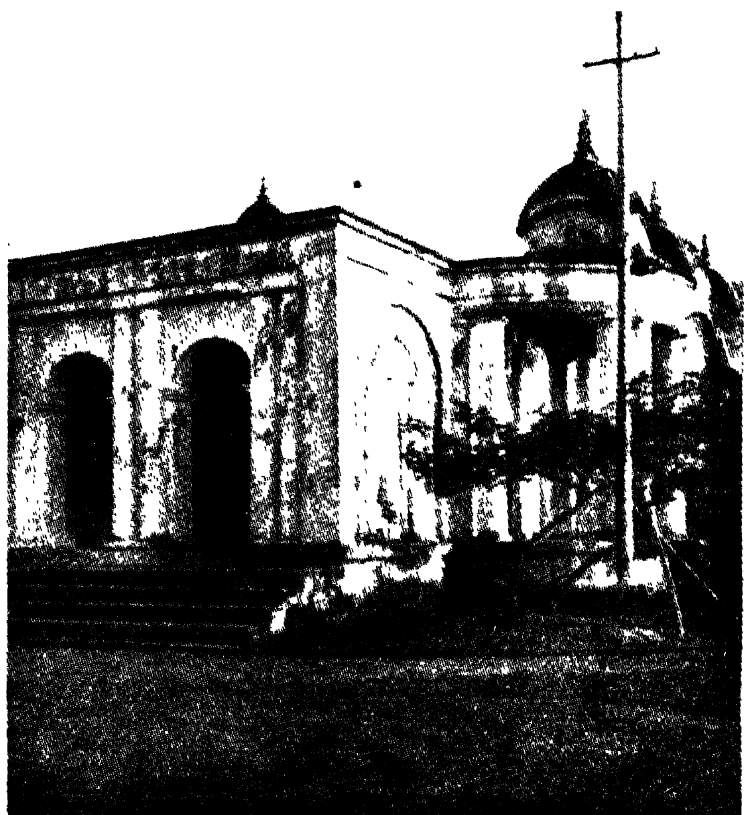
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘর

(দক্ষিণেশ্বরে যেখানে শ্রীশ্রীঠাকুর থাকতেন)

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয়

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত রচয়িতা)

কখনও নিগুর্ণ। একই সুবর্ণ, কখনও স্বরূপে এক, কখনও বিরূপে নানা, কিন্তু একই সুবর্ণ। সুতরাং এক ও অদ্বিতীয় পরমচৈতন্যই সকল-কিছুতে অনুস্যূত; যেমন সকল মণিতে একই সূতা অনুস্যূত—'সূত্রে মণিগণাইব'। ভিন্ন ভিন্ন রূপ রূপের পরিবর্তনকে আচার্য শঙ্কর মিথ্যা ও অনিত্য বলেছেন, আর শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবিকার ও বিকার এ দুটিকেই এক ব্রহ্মচৈতন্যেরই ভিন্ন ভিন্ন আকার বা অবস্থা বলেছেন। মনে রাখতে হবে যে, আকার বা অবস্থাও ব্রহ্মচৈতন্য ছাড়া অন্য-কিছু নয়—'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্'; আর সে'দিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে, মায়াও ব্রহ্মের রূপ ছাড়া অন্য-কিছু নয়। রজ্জুতে (দড়িতে) সর্পের ভ্রম হয় রজ্জুর (দড়ির) যথার্থ রূপকে জানতে পারে না ব'লে। এই 'জানতে পারে না'-কে আচার্য শঙ্কর ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব দু'জনেই ভ্রমজ্ঞান বা ভ্রান্তি বলেছেন। ভ্রম দূর হয় সত্যবস্তুর জ্ঞান হ'লে। এখন কথা এই যে, ভ্রমজ্ঞান দূর হ'লে ভ্রমজ্ঞান যায় কোথায়। আচার্য শঙ্কর ভ্রম বা মায়াকে 'যৎকিঞ্চিদিতি'—যৎকিঞ্চিৎ বস্তু বলেছেন। যদিও মায়া অনির্বচনীয়, তাহলেও সতের জ্ঞান হ'লে অসৎ বস্তুর রূপান্তর ঘটে। এখন যদি বলি তার নাশ হয়, তাহলে তার নাশ হ'লে সে নষ্ট বস্তু যায় বা থাকে কোথায়? আসলে ভ্রমজ্ঞানের সংশোধনই (correction) হয় স্বরূপজ্ঞানের প্রকাশ হ'লে। অথবা ভ্রম সত্যজ্ঞানে পর্যবসিত হয়। ভ্রমের সর্প সত্য রজ্জুতে পর্যবসিত হয়। সুতরাং ভ্রমের নাশ বলতে ভ্রমের সংশোধন মাত্র হয়। এ সংশোধন হওয়ার অর্থ ভ্রমজ্ঞানের স্থানে সত্যজ্ঞানের প্রকাশ হওয়া। রজ্জু বা দড়িকে ভুলজ্ঞানের জন্য সর্প ব'লে মনে হয়, ভুলের সংশোধন হ'লে স্বরূপজ্ঞান, অর্থাৎ রজ্জু বা দড়িকে রজ্জু বা দড়ি বলেই জ্ঞান হয়। সুতরাং ভ্রমজ্ঞান সত্যজ্ঞানে রূপান্তরিত হয় মাত্র। আসলে মায়াজ্ঞানের সংশোধন বা রূপান্তরই (transforimation) ব্রহ্মজ্ঞান। তত্ত্বটি সাধারণভাবে একটু অদ্ভুত ব'লে মনে হয়—যদিও উপলব্ধির দৃষ্টিতে (জ্ঞানদৃষ্টিতে) মোটেই অদ্ভুত বা অলৌকিক বলে মনে হয় না।

যোগবাশিষ্ট-রামায়ণকার, অষ্টাবক্রসংহিতকার ও এমন কি মাণ্ডুক্য-কারিকাকার গৌড়পাদ অধ্যাস, বা মায়া ঠিকঠিকভাবে স্বীকার করেন এ'জন্য যে, ব্রহ্ম থেকে অধ্যাস বা মায়া ব'লে সত্যকার কোন পৃথক বস্তু নাই। মানুষ কল্পনা দিয়েই অধ্যাস বা মায়া স্বীকার করে, অথচ না কোনদিনই

সত্তা হয় না। যোগবাশিষ্টকারের মতে, কল্পনা করে যে—তার অপর নাম চিত্ত বা মন। এ চিত্ত বা মনই সংসার ও মায়া সৃষ্টি করে, আর চিত্ত বা মনের নাশে সংসারও নষ্ট হয়। যোগবাশিষ্টকার বলেছেন,

চিত্তনাশে ন সংসারঃ কুম্ভনাশে ন কুম্ভ সন্।
চিত্তে ত্যক্তে, লয়ং যাতি দ্বৈতমৈক্যং চ সর্বতঃ।
শিষ্যতে পরমং শান্তম্ স্বচ্ছমেকমনাময়ম্ ॥

তিনি আরও বলেছেন,

সর্বশক্তি পরং ব্রহ্ম সর্ববস্তুময়ং ততম্।
ন চেতনো ন চ জড়ো ন চৈবাসন সন্ময়ঃ।

চৈতন্য বা জড় কোনোটাই ব্রহ্মবস্তু নয়, আবার এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্যই চৈতন্য ও জড়ের আকারে প্রকাশিত হন। অষ্টাবক্রসংহিতাকারের অভিমত অনেকটা তাই। কিন্তু আচার্য শঙ্কর এই মতকে কিছুটা সংশোধন করেছেন মায়াশ্রয়ী মানুষের মায়ার পারে যাবার জন্য। 'মায়ার পারে' বল্‌তে মায়া যে আসলে ব্রহ্মচৈতন্য থেকে ভিন্ন নয়—এই তত্ত্ব সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করা। তাই আচার্য শঙ্করের পূর্বে অদ্বৈতবেদান্তের বিচারপ্রণালী যে রকম ছিল, আচার্য শঙ্করের সময়ে ও পরে তার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। অষ্টাবক্রসংহিতকার ও যোগবাশিষ্ট-রামায়ণকার বিশ্বসংসার ও মায়ার ব্যবহারিকসত্তা (apparent phenomenal reality) স্বীকার করেন নি, কেননা পরমার্থত বিশ্বের সকল-কিছুই যখন ব্রহ্মস্বরূপ তখন তার ব্যবহারিক ও পারমার্থিক এ ধরনের দুটি সত্তা স্বীকার করায় কোন সার্থকতা নাই। আচার্য শঙ্কর বলেছেন, যতদিন ব্রহ্মজ্ঞান (স্বরূপজ্ঞান) না হয় ততদিন ব্যবহারিকভাবে বিশ্বসংসার ও মায়া (অজ্ঞান) স্বীকার করতে হয়, পারমার্থিক জ্ঞানের প্রকাশ হ'লে ব্যবহারিক জ্ঞানের নাশ হয় বলতে অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা বধিত বা অপসারিত হয়। আচার্য শঙ্করের পরবর্তী অধিকাংশ অদ্বৈতবেদান্তী এই অভিমত স্বীকার করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ-পার্ষদগণও এ অভিমত স্বীকার করেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ভিতর—বিশেষ ক'রে ইমানুয়েল কাণ্ট ও কাণ্টের অনুবর্তীগণের অনেকেও এই অভিমত স্বীকার করেন। ইংরেজীতে এ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীকে দার্শনিকরা বলেছেন অবজেকটিভ-আইডিয়ালিজম্ বা বিষয়-বিজ্ঞান—যেটি যোগবাশিষ্টকার ও

যোগাচারী বৌদ্ধ-দার্শনিকদের মতে সাবজেকটিভ-আইডিয়ালিজম বা বিষয়ী-বিজ্ঞানবাদ। বিষয়ী-বিজ্ঞানবাদে বিজ্ঞান (ব্রহ্মবিজ্ঞানের) সত্তাই একমাত্র স্বীকার করা হয়, আর বাইরের বিকাশ ও বৈচিত্র্য আন্তরজ্ঞান বা বিজ্ঞানেরই প্রতিভাস বা প্রতিচ্ছায়া। কিন্তু বিষয়-বিজ্ঞানবাদে বাহ্যবিষয় বা বিকাশবৈচিত্র্যের ব্যবহারিক ও প্রাতীতিক সত্তা সাময়িকভাবে স্বীকার করা হয়। সাময়িকভাবে এজন্য যে, পারমার্থিক ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশ হ'লে ব্যবহারিক ও প্রাতীতিক উভয় সত্তার বিলোপসাধন ঘটে। অবশ্য ব্যবহারিক ও প্রাতীতিক সত্তাদুটির মধ্যে প্রাতীতিক বা প্রাতিভাসিক সত্তা ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়াই জাগতিক জ্ঞানের দ্বারা দূর হয়, আর ব্যবহারিক সত্তা পারমার্থিক সত্তার প্রকাশে দূর হয়। 'দূর হয়' বল্‌তে ভুলপ্রতীতির সত্যপ্রতীতি হয়। তবে জ্ঞানদৃস্টির ক্ষেত্রে ব্যবহারিক মায়িক-সত্তা পারমার্থিক-ব্রহ্মসত্তা থেকে অতিরিক্ত সত্তা; কেননা ঈশ-উপনিষদের 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ' এ প্রথম মন্ত্রই সে সমস্যার সমাধান করে।

এখানে যোগবাশিষ্ট-রামায়ণকারের মতে বিশ্বসৃষ্টিসম্পর্কে কিছু আলোচনা করা দরকার। যোগবাশিষ্টকারের মতে, বিশ্বসৃষ্টি অর্থাৎ জগতের বিকাশ হয় নিছক মন বা চিত্তের কল্পনায়। ৩।৬৬।১১ শ্লোকে যোগবাশিস্টকার বলেছেন,

মনোমাত্রমতো বিশ্বম্ যদ্‌যজ্জাতম্ তদেব হি।

সমগ্র বিশ্ব বা সংসার মনের সৃষ্টি ও মনেই তার স্থিতি। আবার ৩।৪৪।২০ এবং ২১।১১০।৪৮ শ্লোকগুলিতে বশিস্টদেব বশিস্টরামায়ণে বলেছেন,

সমস্তম্ কল্পনামাত্রামিদম্ বিশ্বম্
নাস্ত্যেব মননাদৃতে॥

*   *   *

মনোমননির্মানমাত্রমেতজ্জগত্রয়ম্।
মনোবিজ্‌স্তণাদিদম্ সংসার ইতি সম্মতম্॥

এই বিশ্বসংসার কল্পনামাত্র এবং মনের কল্পনা ছাড়া জগতের পৃথক সত্তা নাই। অষ্টাবক্রসংহিতাকারও বলেছেন: "বাসনা এব সংসার * *" (৯।৮)। "তদা বন্ধো যদা চিত্তং * *" (৮।৩) প্রভৃতি। মাণ্ডুক্য-কারিকাকারও বলেছেন: "মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং যৎকিঞ্চিৎ স চরাচরম্। মনসো হ্যমনী-

ভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে॥" (৩।৩১) যোগবাশিষ্টকারও সৃষ্টির কারণকে মন বা চিত্ত বলেছেন। আবার যোগাচারী বৌদ্ধ বলেছেন, বিজ্ঞানের প্রতিভাস বা প্রতিচ্ছবি বিশ্বসংসার। গৌড়পাদও কারিকায় অনুরূপভাবে বলেছেন: "বিজ্ঞানে স্পন্দমানে বৈ" (৪।৫১—৫২)। আচার্য শঙ্করও বিশ্বসংসারসৃষ্টির কারণকে মন বলেছেন: "চরাচরম্ ভাতি মনোবিলাসম্"। বিবেকচূড়ামণির ১৭০-৭১ শ্লোকে আচার্য শঙ্কর বলেছেন: "ভোক্ত্যাদি বিশ্বম্ মন এব সর্বম্, অতো মনোকল্পিত এব পুংসঃ সংসার, ন বস্তুতোঽস্তি।" এই শ্লোকগুলি যেন নাগার্জুন-রচিত মাধ্যমিকবৃত্তি ও গৌড়পাদ-রচিত মাণ্ডুক্য-কারিকা-র অনুরূপ। অষ্টাবক্রসংহিতাকারেরও অভিমত পূর্বে বলেছি।

এক্ষণে যোগবাশিষ্টকারের 'মনোমননির্মাণম্'-এর সঙ্গে আচার্য শঙ্করের 'মনোবিলাসম্' কথার পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য এখানে যে, যেখানে যোগবাশিষ্টকার বলেছেন 'কল্পনামাত্রমিদম্ বিশ্বম্' সেখানে বিশ্বের বা জগতের ব্যবহারিক সত্তার কোন সার্থকতা নাই, বিশ্বপ্রতীতি ভ্রম ও কল্পনামাত্র, কিন্তু আচার্য শঙ্কর যেখানে বলেছেন: 'চরাচরম্ ভাতি মনো-বিলাসম্' বা 'অতো মনোকল্পিত * * সংসারঃ'। এখানে পারমার্থিকভাবে জগতের সত্তা ও সত্যতা নাই, কিন্তু ব্যবহারিকভাবে জগতের অস্তিত্ব স্বীকৃত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে সংসার নিত্যেরই লীলা এবং লীলা নিত্যেরই অভিন্ন রূপ—এপীঠ ও ওপীঠ। নিত্যস্বরূপচৈতন্য—যিনি সাকার-নিরাকার ও সগুণ-নির্গুণ দুইই, আবার আরো কত কি। জগৎ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন ব'লে মনে হয় ভ্রম বা মিথ্যাজ্ঞানের জন্য। পৃথক ব'লে মনে হওয়াই ভুলজ্ঞান, আর ভুলজ্ঞানেব সংশোধন হ'লেই সত্যজ্ঞানের প্রকাশ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, তখন ব্রহ্ম ও শক্তি—নিত্য ও লীলা—বিশ্বচৈতন্য ও বিশ্বসংসার এক ও অভেদ ব'লে মনে হয়। ভেদ ভুলজ্ঞানে, আর অভেদ সত্যজ্ঞানে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "এক সচ্চিদানন্দ, শক্তিভেদে উপলব্ধিভেদ, তাই নানা রূপ।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টি এখানে অভ্রান্ত। তিনি বলেছেন, সচ্চিদানন্দ এক, নানা বা বৈচিত্র্য শক্তিভেদে ও উপাধিভেদ। উপাধিই শক্তি এবং শক্তির স্বভাব বৈচিত্র্য বা 'নানা' সৃষ্টি করা। উপাধির আর এক নাম বিশেষণ—যা বিশেষ্যকে প্রকারান্তরে সীমায়িত বা ভাগ করে। 'মানুষটি

সৎ' বললেই অসৎপ্রকৃতির মানুষ থেকে আলাদা ক'রে সৎস্বভাবের মানুষকে বুঝানো হয়। আচার্য শঙ্কর বলেছেন, উপাধিই মায়া, কেননা সীমিত (limit) বা ভাগ করাই উপাধির (মায়ার) কাজ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টি একটু ভিন্ন ধরনের। তিনি বলেছেন : "সেই সচ্চিদানন্দই আদ্যাশক্তি—যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন।" এ অপরূপ দৃষ্টি ও তত্ত্বকে আরও পরিষ্কার ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "যিনিই শ্যামা, তিনিই ব্রহ্ম। * * ব্রহ্মশক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ। সচ্চিদানন্দহয় আর সচ্চিদানন্দময়ী।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই অভেদদৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য বিচারশৈলীর অবতারণা করেছেন এই ব'লে : "উত্তম ভক্ত কে ?' উত্তম ভক্ত ব্রহ্মজ্ঞানের পর দেখে—তিনিই জীব-জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। প্রথমে 'নেতি নেতি' বিচার ক'রে ছাদে পৌঁছুতে হয়। তারপর সে দেখে, ছাদও যে জিনিসে তৈয়ারী, ইট, চূণ, শুরকী, সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈয়ারি। তখন দেখে—ব্রহ্মই জীব-জগৎ সমস্ত হয়েছেন।"

এটি বিচারের কথা। বিচার কিনা জ্ঞানবিচার বা নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক বিচার। যারা অজ্ঞানের পথযাত্রী, ভ্রমকে যারা স্বভাবে পরিণত ক'রে নিয়েছে, তাদের অজ্ঞান, ভ্রম বা ভুলজ্ঞান দূর করার জন্য বিচার দরকার। বিচার জ্ঞানপথের পথিকের জন্য। 'দুর্গমপথস্তৎ'—বিচারপথ দুর্গম। বস্তুতান্ত্রিক যুগে বাহ্যবস্তুর জ্ঞান নিয়ে যারা দিন যাপন করে, ঈশ্বর-সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে চায়, অথচ জ্ঞানবিচারের পথকে কঠিন ও দুঃসাধ্য ব'লে মনে করে, তাদের জন্য ভক্তিপথ। কিন্তু ভক্তিপথও একেবারে সরল ও সোজা নয়। ভক্তিসাধনার মধ্যে তর-তম ভেদ আছে। সাধারণ-ভক্তি ও শুদ্ধা-ভক্তি। শুদ্ধাভক্তি নারদীয়া-ভক্তি। এই বিচারযুক্ত অনুকূল তর্কনিষ্ঠ ভক্তি-সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—'কলিতে নারদীয়া-ভক্তি'। বর্তমান যুগে মানুষের পক্ষে ভক্তি বা ভক্তিসাধনার ক্ষেত্র অনুকূল (—প্রতিকূল নয়)। তবে ভক্তির সঙ্গে বিচারের প্রয়োজন। বিচার ছাড়া ভক্তির স্থিতি হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বর্তমান যুগের মানুষের জন্য ভক্তিসাধনার উপর বেশ জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : "শুধু বিচার ? থু থু—কাজ নাই। * * কেন বিচার ক'রে শুষ্ক হয়ে থাকব। যতক্ষণ 'আমি-তুমি' আছে, ততক্ষণ যেন তাঁর (ঈশ্বরের) পাদপদ্মে শুদ্ধা-ভক্তি থাকে।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এ কথাগুলি বিশেষ তৎপর্যপূর্ণ। 'আমি'-'তুমি'-র জগৎ আপেক্ষিক (রিলেটিভ) দ্বৈতজ্ঞানের জগৎ, কেননা এক থাকলে যেমন দুইয়ের ধারণা হয়, তেমনি 'আমি' থাকলে 'তুমি'-র ধারণা আসে। যেখানে এক নাই, সেখানে দুইও নাই, আর সেখানে বহু এবং বৈচিত্র্যও নাই। তাই আমি থাকলেই তুমি। এই 'আমি'-'তুমি'-র সম্বন্ধপাতানো বিশ্ব ভেদের ও সম্পর্কের সংসার। এ সম্পর্কের সংসারে বিচারের প্রয়োজন, কেননা সম্পর্ক বা রিলেটিভ ভাব যেখানে, সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বীতার ভাব থাকে এবং সেখানেই অজ্ঞান অজ্ঞানে শান্তি নাই, কেবলই বন্ধন ; তাই অজ্ঞানের পারে মুক্তিময় জীবন লাভ করতে হয়।

অজ্ঞান বলতে আমি-তুমি-র জগৎ, সম্পর্কের জগৎ। এ সম্পর্কের ও দ্বৈতভাবের জগতে ভক্তিভাব নিয়ে সাধন-ভজন করা ভাল। তবে ভক্তির সঙ্গে জ্ঞানের সম্পর্ক থাকলে আরও ভাল হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "যতক্ষণ 'আমি-তুমি' আছে ততক্ষণ যেন তাঁর পাদপদ্মে শুদ্ধা-ভক্তি থাকে।" 'তাঁর পাদপদ্মে শুদ্ধা-ভক্তি থাকে'। এটি ভক্তিসাধনার পথ। আবার শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন বলেছেন : "তুমিই আমি, আমিই তুমি", তখন 'আমি' খুঁজে পাওয়ার বিচার থাকে, আর থাকে অচলা একমুখী শুদ্ধা-ভক্তি। এই একনিষ্ঠতারূপ মনের স্থিতিই জ্ঞানপথের নির্মল আশীর্বাদ এনে দেয়। একটি অপরের সহায়ক। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ যখন মত ও পথের উল্লেখ ক'রে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত (duality, qualified non-duality ও non-duality) সাধনার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন তখন তিনি একটিকে অপরটির বিরুদ্ধ বলেন নি, বলেছেন সহায়ক বা পরিপূরক। প্রথমে মানুষ সহজ বুদ্ধি নিয়েই দ্বৈতধারণার জগতে বাস করে। তখন সেব্য-সেবক, ভগবান-ভক্ত এ দ্বৈতভাবকে গ্রহণ করে মানুষ সাধনা করে। ক্রমে ধারণা দৃঢ়, সংস্কৃত ও কেন্দ্রীভূত হয়। তখন ভগবানের ও বিশ্ববৈচিত্র্যরূপ লীলার সঙ্গে মানুষ নিজেকে যুক্ত করে এবং বিশিষ্টাদ্বৈতভাবের সাধনা করে। তখন ঈশ্বর থেকে সাধক নিজেকে দুর্বল ও পৃথক বলে ধারণা করলেও করুণাময় ঈশ্বরের সম্পর্ক থেকে কোনদিন নিজেকে বঞ্চিত বা বিচ্ছিন্ন মনে করে না। ক্রমে চিত্তের প্রসারণ ঘটে, বৃত্তির দৃঢ়তা ও কেন্দ্রীকরণী শক্তির স্ফূরণ হয়, তখনই এক ও অদ্বিতীয় আত্মচৈতন্যের অনুভূতির দিকে সাধক শ্রদ্ধাশীল ও

যুক্ত হয়। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাই বলেছেন, দ্বৈতমত বিশিষ্টাদ্বৈত মতের পরিপূরক ও সহায়ক এবং বিশিষ্টাদ্বৈত অদ্বৈতমতের পরিপূরক ও সহায়ক। তার জন্য সংসারে সম্পর্কের সার্থকতা কি ও সম্পর্কের কার্যকারিতা ও পরিণাম কি—তা চিন্তা করা দরকার। এ চিন্তার নাম বিচার ও আত্ম-বিশ্লেষণ। অদ্বৈতজ্ঞান সকল সাধনার চরমপরিণতি। শ্রীকৃষ্ণ নাকি ভক্তি-পরীক্ষার জন্য একবার অসুখের ভাণ করেছিলেন। তখন পরমপ্রেম-স্বরূপা শ্রীরাধা নিজের 'আমি'-সত্তার বিলোপ ক'রে একাত্মজ্ঞানে আপনার পদধূলি দান করেছিলেন পরমপূজ্য শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে। এ গল্প বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। এটি শ্রীরাধার একাত্মতা ও অদ্বৈতজ্ঞানানুভূতিরই নিদর্শন। তাছাড়া 'যোগমায়া বা পুরুষ-প্রকৃতির যোগ'-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ১১৫) শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ, তাই শ্রীমতীর নীল পাথর। আবার শ্রীকৃষ্ণ পীতবসন ও শ্রীমতী নীলবসন পরেছেন।" সমান বা একাত্মজ্ঞান থেকেই অদ্বৈতজ্ঞান ও অদ্বৈতানুভূতির বিকাশ। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর উপাস্য যুগলদেবতা শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সম্বন্ধে একাত্মানুভূতি লাভ করেছিলেন বলেই বৈষ্ণব-সাধকরা শ্রীচৈতন্যকে রাধা-কৃষ্ণের সমন্বয়মূর্তি ব'লে জ্ঞান করেন। জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের একাত্মানুভূতির নাম অদ্বৈতজ্ঞান।

এই অদ্বৈতজ্ঞানের পরিচয় দেবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব অভিনব পদ্ধতিতে বলেছেন : "জ্ঞানী ব্রহ্মকে জানতে চায়। ভক্তের ভগবান—ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ সর্বশক্তিমান ভগবান। কিন্তু বস্তুত ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যিনি সচ্চিদানন্দ, তিনিই সচ্চিদানন্দময়ী। যেমন মণির জ্যোতিঃ ও মণি। মণির জ্যোতির বললেই মণি বুঝায়, মণি বললেই জ্যোতিঃ বুঝায়। মণি না ভাবলে মণির জ্যোতি ভাবতে পারা যায় না, (তেমনি) মণির জ্যোতিঃ না ভাবলে মণি ভাবতে পারা যায় না।" পূর্বে এ প্রসঙ্গের আলোচনা করা হয়েছে। কথাগুলি এই মর্ম প্রকাশ করে যে, শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তি এক ও অভেদ। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব একথাই বলেছেন। "জ্ঞানী ব্রহ্মকে জানতে চায়। ভক্তের ভগবান" কথাগুলির প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব জ্ঞান ও ভক্তি এ' দুটি পথের কথাই বলেছেন। আবার দুটি পথের চরমসিদ্ধান্ত যে এক, সেকথাও তিনি বলেছেন : "শুদ্ধজ্ঞান যেখানে, শুদ্ধাভক্তিও সেইখানে নিয়ে যায়।" ব্রহ্ম ও শক্তি—জ্ঞান ও ভক্তি চরমজ্ঞানদৃষ্টিতে এক ও অভেদ। এ দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায়, যিনি

সচ্চিদানন্দ, তিনিই সচ্চিদানন্দময়ী। মণির জ্যোতিঃ থেকে মণিকে আলাদা করা যায় না, যেমন মানুষের ব্যক্তিত্ব থেকে তেমনি মানুষকে পৃথক করা যায় না, কেননা ব্যক্তিত্বহীন মানুষ জড় ও অনড়। সুতরাং জ্যোতিঃহীন মণি 'মণি'-পদবাচ্য নয়। সূর্য থেকে যেমন তার কিরণকে (আলোককে) বাদ দেওয়া যায় না, অগ্নি থেকে যেমন তার দাহিকাশক্তিকে পৃথক করা যায় না, তেমনি ব্রহ্ম থেকে শক্তিকে পৃথক করা যায় না। কেননা ব্রহ্ম ও শক্তি এক ও এখানে কোন কোন বিচারীর দৃষ্টিতে এ' সিদ্ধান্ত হয়তো একটু বিসদৃশ বলে মনে হয়, কেননা শক্তি গুণ, সুতরাং শক্তিযুক্ত ব্রহ্ম নির্গুণ বা শুদ্ধব্রহ্ম নয়, সগুণ-ব্রহ্ম বা মায়াশবলিত ব্রহ্ম। সুতরাং বিশেষণযুক্ত বিশেষ্য কোনদিনই অদ্বৈতদৃষ্টির সহায়ক হ'তে পারে না।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টি এখানে একটু অভিনব ও স্বতন্ত্র। তিনি শক্তিকে ব্রহ্ম থেকে পৃথক বলেন নি। তাছাড়া পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম থেকে শক্তি পৃথক নয়, বিরোধী ভাবযুক্ত ভ্রম থাকার জন্যই কেবল পৃথক ব'লে প্রতীতি হয়। আসলে ভ্রমের সংশোধনে ভ্রম বিজ্ঞানেই পর্যবসিত হয়। মিথ্যাপ্রত্যয় অজ্ঞান, আর সত্যপ্রত্যয় ও অভ্রান্ত প্রতীতির নাম উপলব্ধিই। ভুলজ্ঞানে জীব, কিন্তু সত্যজ্ঞানে শিব বা ব্রহ্ম। রজ্জু বা দড়িকে ভ্রমের (ভুলজ্ঞানের) জন্য সাপ বলে মনে হয়, কিন্তু সত্যজ্ঞানে ভ্রম দূর হয় অর্থে মিথ্যাজ্ঞান সত্যজ্ঞানে রূপে প্রকাশিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে, বৈচিত্র্য ও বিকাশই লীলা, এবং তা এক ও অদ্বিতীয় নিত্যেরই বিকাশ বা লীলা! শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : 'যিনিই নিত্য, তাঁরই লীলা'। জ্ঞানদৃষ্টিতে তত্ত্ব ও বস্তু এক। তাই এক অবস্থায় তাঁকে নিত্য, আর অন্য অবস্থায় তাকে লীলা বলা হয়। স্থির ও চলমান সাপ যেমন একটাই, তেমনি নিত্য ও লীলারূপী ব্রহ্ম একই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ সিদ্ধান্ত তন্ত্রশাস্ত্রের শক্তিবিশিষ্ট-অদ্বৈতদৃষ্টিকে অনুসরণ ক'রে করেন নি, তিনি সমন্বয়ী-অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিসেবী হয়েই একথা বলেছেন। বলেছেন, সাকার-সগুণ, নিরাকার-নির্গুণ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এবং আরও কত কিছু হন ব্রহ্ম। সর্বত্র ও সমস্তই এক ও বিশ্বব্যাপক চৈতন্য। ভিন্ন দৃষ্টিতে এককে আমরা দুই বা বহু ব'লে অনুভব করি, কিন্তু স্বরূপদৃষ্টিতে অনুভব হয়—ব্রহ্ম ও শক্তি এক ও অভিন্ন। এক সত্তার দুই বা বহু রূপ তাই প্রতিভাস, বিকার বা মিথ্যা নয়। কেননা

সত্য ও মিথ্যা দৃষ্টিদুটি আমরা একই ব্যাপকচৈতন্যে আরোপ করি যথার্থ-জ্ঞানের অভাবের জন্য। তাই অযথার্থজ্ঞানকে সংশোধন (correct) ক'রে যথার্থজ্ঞানের পথচারী হওয়া প্রয়োজন সত্যতত্ত্বকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বলেছেন, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ এবং এই অভিন্ন-দৃষ্টিতে শক্তি ব্রহ্মেরই আর এক রূপ। কিন্তু শক্তিকে ব্রহ্ম থেকে আমরা ভিন্ন ভাবি ভ্রান্তি ভেদজ্ঞানের জন্য। আচার্য শঙ্করও এ ভ্রান্তি বা ভ্রমকে বলেছেন 'মিথ্যাপ্রত্যয়'। মিথ্যাপ্রত্যয় ভুলের জন্য হয়, ভ্রম চলে গেলে আবার চিরন্তন সত্য,—যার নাম সত্যপ্রত্যয়। সুতরাং যিনি সচ্চিদানন্দ, তিনিই সচ্চিদানন্দময়ী—টাকার এপীঠ ও ওপীঠ। শাঙ্কর-বেদান্তের হুবহু বিচার-প্রণালী এখানে প্রয়োগ করলে ভুল করা হবে। প্রতিটি দর্শনচিন্তার বিচারপ্রণালী তাই কিছুটা স্বতন্ত্র হওয়াই স্বাভাবিক, যদিও সিদ্ধান্ত এক। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীস্বতন্ত্রের দৃষ্টিতেই তাঁর দর্শনচিন্তার বিচার করা উচিত।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ গৃহস্থের প্রতি উপদেশ ॥

"শ্রীরামকৃষ্ণ। (সমবেত ব্রাহ্ম-ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া) বলিতেছেন : 'নির্লিপ্ত হ'য়ে সংসার করা বড় কঠিন। প্রতাপ বলেছিল, মহাশয় আমাদের জনকরাজার মতো। জনক নির্লিপ্ত হয়ে সংসার করেছিলেন, আমরাও তাই করবো'। আমি বললুম, 'মনে করলেই কি জনকরাজা হওয়া যায়, জনক-রাজা কত তপস্যা ক'রে জ্ঞান লাভ করেছিলেন, হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ হ'য়ে অনেক বৎসর ঘোরতর তপস্যা ক'রে তবে সংসারে ফিরে গিছলেন।'

তবে সংসারীর কি উপায় নাই? হাঁ, অবশ্যই আছে। দিনকতক নির্জনে সাধন করতে হয়। নির্জনে (সাধন) করলে ভক্তি লাভ হয়, জ্ঞান লাভ হয়, তারপর গিয়ে সংসার করলে দোষ নাই। যখন নির্জনে সাধন করবে (তখন) সংসার থেকে একেবারে তফাতে যাবে। তখন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী, আত্মীয়-কুটুম্ব কেহই যেন কাছে না থাকে। নির্জনে সাধনের সময় ভাববে—'আমার কেউ নাই, ঈশ্বরই আমার সর্বস্ব'। আর কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে জ্ঞান-ভক্তির জন্য প্রার্থনা করবে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ (১৩৬৬), দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২৩১

গৃহস্থ গৃহবাসী, তপস্বী বনবাসী, তাই গৃহস্থ ত্যাগী-তপস্বীদের (সন্ন্যাসীদের) থেকে ভিন্ন। তবে গৃহে বাস করলেই সে গৃহস্থ হয় এমন কোন নিয়ম নাই। বিবাহিত বা অবিবাহিত জীবন ও স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আত্মীয়-স্বজন নিয়ে একত্রে বাস করার পরিবেশই যথার্থভাবে সমাজজীবন ও গার্হস্থ্য-আশ্রমের রূপ সৃষ্টি করে। আত্মচিন্তা, ঈশ্বরচিন্তা, ইষ্টচিন্তা কিংবা অধ্যাত্মজীবনচিন্তা

থেকে বিরতির ভাব ধর্মহীন জীবনের রূপ সৃষ্টি করে। কিন্তু ভোগাসক্তিপূর্ণ সংসার-আবেষ্টনীর মধ্যে থেকে নিরাসক্তভাবে সংসার যে করা যায় এমন নিদর্শনের অভাব নেই। তবে ঈশ্বরে নিবেদিত মন-প্রাণ এবং অহং-অভিমানশূন্য হ'য়ে বাস করলে তাকে নিছক গৃহস্থজীবন বলা যায় না। এ তত্ত্বশিক্ষা দেবার জন্যই গৃহস্থ-মানুষের উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এ উদার উপদেশই শুধু উপদেশ নয়, এটি তাঁর অন্তরের বেদনাপূর্ণ আকুলতাও! তার জন্য তিনি বলেছেন, স্বার্থময় বাসনা-কামনা থেকে বিরত মহাতেজা রাজর্ষি জনকের মতো আসক্তির রাজ্যে বাস করেও নিরাসক্তির জীবন নিয়ে সংসার করা যায়। বলেছেন: "হাতে তেল মেঁখে কাঁটাল ভাঙলে হাতে আঠা লাগে না", কিংবা "চোর-চোর যদি খেল, (তবে) বুড়ি ছুঁয়ে ফেল্‌লে আর (চোর হবার) ভয় নাই" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৩১)। হাতে তেল মাখা ও লুকোচুরি খেলায় বুড়ি-ছোঁয়ার অর্থ সংসারে থেকেও সার্থক মুক্তিময় জীবন লাভ করা যায়। সাধনায় সিদ্ধি লাভ ক'রে সংসারের সকল কাজই করা যায়, তাতে পাঁকালমাছের গায়ে যেমন পাঁক লাগে না, তেমনি মুক্তির আলোকদীপ্ত জীবনকে ভোগাসক্তিরূপ পাঁক (মায়া) কলুষিত করে না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একথাও বলেছেন, যারা অধ্যাত্মপথের পথিক নয় ও বিবেক-বৈরাগ্যময় জীবন থেকে বঞ্চিত, যারা অজস্র আসক্তির অক্টোপাশে আবদ্ধ হ'য়ে পার্থিব ভোগসুখকেই জীবনে যথাসর্বস্ব ব'লে মনে করে, তাদের পক্ষে 'নির্লিপ্ত হয়ে সংসার করা বড় কঠিন'। আসলে বাসনা-কামনাময় ভোগের আসক্তি সংসার সৃষ্টি করে। তাই ঈশ্বরচিন্তাবিমুখ মানুষ নিরাসক্তির মহিমা ও মাধুর্য সাধারণত উপলব্ধি করতে পারে না। বাসনা বা তৃষ্ণাই যে সংসার সৃষ্টি করে সেকথা অষ্টাবক্রসংহিতকারও বলেছেন: "বাসনা এব সংসারঃ * *" (১০।৮), কিংবা "যত্র তত্র ভবেৎ তৃষ্ণা সংসারং বিদ্ধি তত্র বৈ" (১০।৩)। মাণ্ডুক্যকারিকায়ও এ'ধরনের স্বীকৃতি আছে। তাই বাসনা বা আসক্তির পাশে গিয়ে নিরাসক্তভাবে সংসার করা সংসারীদের পক্ষে 'বড় কঠিন'। কিন্তু একথাও মনে রাখা উচিত যে, ভোগ ও ত্যাগ, কামনা ও নিষ্কামনা, তৃষ্ণা ও বিতৃষ্ণা এক জিনিস নয়, তারা অন্ধকার ও আলোকের মতো পরস্পরবিরুদ্ধ। কোন সাধক-কবি বলেছেন: 'যাঁহা কাম, তাঁহা নেহি রাম', অর্থাৎ কাম বা সংসারাসক্তি ও রাম বা সংসার-

বিরক্তি পরস্পরে ভিন্ন। দুটির মধ্যে মিলন করতে হ'লে সকল স্বার্থের পারে জীবনকে মুক্তিময় করতে হবে। তা না হলে একটি—জীবনযাত্রার পথে আনে মোহ, ভ্রান্তি ও বন্ধন, এবং অপরটি—আনে অপার্থিব শান্তি ও বন্ধনমুক্তি। বিবেক ও বিচারের প্রকাশ সাধারণ মানুষের জীবনে প্রায় আসে না, আসে বরং ভ্রান্তি। আবার বিবেক ও বিচারের দীপশিখা সকলের হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত থাকলেও যথার্থ সাধনা ও অধ্যাত্মচেতনার অভাবে তাদের প্রকাশ স্বচ্ছ হয় না। সংসারের আপাতমধুর সৌন্দর্যে যারা মোহিত, তারা আসক্তি ও ভোগকেই জীবনের চরমবস্তু ব'লে গ্রহণ করে। নিরাসক্তির ভাবকে তারা জীবনে ব্যর্থতা ব'লে মনে ক'রে বরং ভীত হয়। ভীত হয় এজন্য যে, ত্যাগকে তারা মনে করে রিক্ততা বা শূন্যতা। এ' চিন্তার কোন সার্থকতা নেই, কেননা নিরাসক্ত জীবনই আনন্দলোকের শান্তি ও আশীর্বাদ বহন ক'রে আনে।

ভক্ত প্রতাপচন্দ্র সাধারণ মানুষের মতো জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে: "মহাশয়, আমাদের জনক রাজার মতো (অবস্থা)। জনক নির্লিপ্ত হ'য়ে সংসার করেছিলেন, আমরাও তাই করবো।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্ত প্রতাপের কথা শুনে সহাস্যে উত্তর দিলেন: জনক রাজা কি সহজে হওয়া যায়? মহাতপস্বী ছিলেন জনক রাজা। তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রে সংসারে ছিলেন, তাই সংসারের মায়া তাঁকে বাঁধতে পারে নি।

জনকরাজা মহাতেজা তাঁর ছিল কিসে ক্রটি।
(তিনি) এদিক ওদিক দু'দিক রেখে খেয়েছিলেন দুধের বাটি॥

ব্রহ্মজ্ঞানী রাজর্ষি জনক ভোগকে ত্যাগের অমৃতরসে সিক্ত করেছিলেন, তাই তাঁর জীবনচিন্তা ও জীবনকর্মের মধ্যে ছিল দুটি দিক—ত্যাগ ও নিরাসক্ত ভোগ। ত্যাগদীপ্ত জীবন নিয়ে তিনি প্রজাপালন করতেন, আবার অগণিত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রাজগণকে ব্রহ্মজ্ঞানও উপদেশ দিতেন। শোনা যায়, সে যুগে (ত্রেতাযুগে) ক্ষত্রিয়রাজগণ ছিলেন ত্যাগী, তপস্বী ও ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী। জনক রাজা ছিলেন সেই রাজর্ষিগণেরই একজন। মন্ত্রসিদ্ধ সাপুড়ে যেমন নিপুণতার সঙ্গে বিষাক্ত সাপকে নিয়েও খেলা করতে পারে, তেমনি লক্ষ্যাশ্রয়ী সাধক যদি বিবেক ও বৈরাগ্যের সাধনায় আসক্তি ও নিরাসক্তি—রাগ ও বিরাগের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করতে পারেন

তবে সংসাররূপ ভোগ ও অসংসাররূপ ত্যাগকে তিনি ব্রহ্মদৃষ্টির প্রসন্নতা দিয়ে একই সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন—যেমন ব্রহ্মদৃষ্টিসম্পন্ন রাজর্ষি জনক এদিক ও ওদিক দু'দিক রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলেছেন : "মনে করলেই কি জনক রাজা হওয়া যায়? জনক রাজা কত তপস্যা ক'রে জ্ঞান লাভ করেছিলেন! হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ হয়ে অনেক বৎসর ঘোরতর তপস্যা ক'রে তবে সংসারে ফিরে গিছলেন।"

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তপস্যার দ্বারা জ্ঞান লাভ ক'রে সেই জ্ঞানের প্রশান্ত দীপ্তি নিয়ে যিনি কর্মের মধ্যে অকর্ম ও অকর্মে কর্ম দর্শন করেন তিনিই ধন্য—

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মাণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥ গীতা ৪।১৮

আচার্য শঙ্কর এ শ্লোকটি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন : (১) জ্ঞানী কর্মের অভাবে (কর্মশূন্যতায়) কর্ম করেন। কর্মপ্রবৃত্তি ও কর্মনিবৃত্তি উভয়ই যখন কর্তার (যিনি কর্ম করেন তাঁর) অধীন তখন জ্ঞানী ত্যাগে অর্থাৎ কর্মনিবৃত্তিতেও কর্ম (কর্মপ্রচেষ্টা) দর্শন করেন। (২) অকর্ম অর্থে পরমার্থ বা আত্মা। আত্মা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ের মূলে থাকেন; সুতরাং আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ কর্মকে যখন শ্রীভগবানের পূজাস্বরূপ মনে করেন তখন তাঁর কর্তৃত্ব-রূপ অহংকার বিনষ্ট হয়। জ্ঞানীর সকল কর্মে তখন অকর্মরূপ আত্মদৃষ্টি হয়।

সংসারে অহংজ্ঞানই সকল অনর্থের মূল। জ্ঞানদৃষ্টিতে 'আমি'-জ্ঞান 'তুমি'-জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু অজ্ঞানদৃষ্টিতে আমি ও তুমির ভেদ থাকে—যাতে সকল অনর্থ সৃষ্টি হয়। তখন সকল প্রচেষ্টায়, কর্মে ও বস্তুতেই ব্রহ্মের প্রকাশ অনুভূত হয়। কর্মে স্বার্থকেন্দ্রিক বাসনা তখন থাকে না, আর ফলাসক্তিও থাকে না। নিরাসক্ত জীবন নিয়ে জ্ঞানী ও যোগী তখন সংসারের সকল কর্ম করেন লোককল্যাণের জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন : "ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না। নিরাসক্তির আশীর্বাদ সাধকের জীবনে বন্ধনমুক্তি নিয়ে আসে। গীতার ৪।২০ শ্লোকে তাই দেখি,

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥

ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে কর্ম করলে কর্মে আসক্তি থাকা বা না থাকা একই কথা। নিরাসক্ত জীবন জ্ঞানীরা কর্ম করলেও কর্মে তাই তাঁদের কর্তৃত্ব-অভিমান থাকে না। তাই শরীর থাকলেও জ্ঞানীদের পক্ষে অশরীর অর্থাৎ শরীর না থাকারই সামিল ব'লে মনে হয়। মোটকথা আত্মজ্ঞানীদের শরীরের উপর কোন স্বার্থের আকর্ষণ থাকে না, কেবল শরীরী বা আত্মাতেই তাঁদের আসক্তি ও দৃষ্টি থাকে। তাই যাঁরা জ্ঞানী, তাঁরা কর্তৃত্বাভিমান না রেখে কর্ম করেন লোককল্যাণের জন্য সেকথা বলেছি। মিথিলাধিপতি জনকের পক্ষেও তাই ছিল। তিনি সর্ববস্তুর ও সর্বপ্রাণীর প্রতিষ্ঠা ও প্রাণ-স্বরূপ ব্রহ্মকে নিজের স্বরূপ বোলে জেনেছিলেন, তাই সংসারে থেকে তিনি অসংসারী ছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞানের মহিমাই হোল মানুষের স্বার্থজ্ঞান বা অজ্ঞান দূর ক'রে জ্ঞানের আলোকে জীবনকে চিরপবিত্র করা। যে সংসারকে অজ্ঞানী ঈশ্বর থেকে পৃথক মনে করে, ব্রহ্মানুভূতির পর মিথ্যাজ্ঞান দূর হ'লে সেই সংসারকেই সে 'ঈশাবাস্যম্'—ঈশ্বরের দ্বারা পূর্ণ ব'লে দেখেন। মানুষ তখন জ্ঞানের আশীর্বাদ নিয়ে সংসারকে ভগবানের সংসার বোলে দেখেন। তখন তিনি দেখেন যে, সংসার ঈশ্বর থেকে অভিন্ন। উপনিষদও তাই বলে: "তৎ স্রষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ,"—বিশ্বচরাচর সৃষ্টি ক'রে ঈশ্বর বিশ্বচরাচররূপে নিজেকে প্রকাশ করলেন। তখন অজ্ঞান জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়, মায়া ব্রহ্মে পর্যবসিত হয়। এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই সেখানে সত্তা, সেখানে অন্য আর কোন সত্তা থাকে না। এটি জ্ঞানী ও যোগীর জ্ঞানদৃষ্টি! এই জ্ঞানদৃষ্টি নিয়ে সংসার করা যায়। সংসার তখন আর জ্ঞানীকে মোহযুক্ত করে না, মুক্তির আলোকে সংসার ও সংসারের সকল কর্ম ও বস্তু তখন পবিত্র ব'লে মনে হয়। মনে হয় তখন ঈশ্বরময়, বা ঈশ্বরে সমর্পিত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সংসারের প্রতিটি মানুষকে তাই মুক্তির মহিমময় রূপের সঙ্গে পরিচিত হ'তে বলেছেন। তিনি বলেছেন: "একবার পরশমণিকে ছুঁয়ে সোনা হও, সোনা হবার পর হাজার বৎসর যদি মাটিতে পোঁতা থাক, মাটি থেকে তোলবার সময় সোনাই থাকবে" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৩০)। নিজের স্বরূপই অবিনশ্বর। এই শাশ্বত স্বরূপ একবার উপলব্ধি করলে সে উপলব্ধি আর কোনদিন ম্লান হয় না। হাজার বৎসরের অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘর

যেমন একটিমাত্র দেশলাইকাটির আলোকে উদ্ভাসিত হয় ও সে আলোক চিরদিন থাকে, তেমনি একবার মিথ্যাজ্ঞান সত্যজ্ঞানের আলোকে দূর হ'লে কোনদিন আর মিথ্যা বা ভুল জ্ঞান হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মনুষ্যজীবনের এ ভ্রমকে দূর ক'রে সোনা হতে বলেছেন। এ আদর্শকে স্মরণ করিয়ে দেয় এগানটি—

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে॥ প্রভৃতি

'নিজ নিকেতন' মানুষের নিজের পবিত্র স্বরূপ একথা পূর্বে বলেছি। কিন্তু ভ্রমে সেই পবিত্র আত্মস্বরূপকে লোকে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি বলে ভ্রম করে। ভ্রম থেকে অজ্ঞান, অজ্ঞান থেকে সংসার, আর সংসার থেকে মোহ ও বন্ধন সৃষ্টি হয়। সংসারই বিদেশ এবং সংসারে বিদেশীর বেশে মানুষ ঘুরে বেড়ায় অকারণে কারণরূপ আত্মাকে উপলব্ধি না ক'রে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'নিজ নিকেতন' বা 'আপনার স্বরূপ' আত্মাকে উপলব্ধি ক'রে সংসারে থাকতে বলেছেন পাঁকালমাছের মতো। এই উপলব্ধির চিরসম্ভাবনা প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আছে, তার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "তবে সংসারীর কি উপায় নাই? হাঁ, অবশ্যই আছে।" সাধারণ সংসারী ভগবানকে ভুলে থাকে। স্বার্থ ও আসক্তির জালে আবদ্ধ হ'য়ে সংসারী ভুলে যায় যে, সংসার ভগবানেরই, সংসারের প্রতিষ্ঠা বা অধিষ্ঠান একমাত্র আত্মা বা ব্রহ্মই, সুতরাং নিজের কর্তৃত্বাভিমান নিরর্থক। স্বার্থের ভাব ও কর্তৃত্বের অভিমান দূর হলেই নিরাসক্তির ভাব হৃদয়ে জাগে। তখনই চিত্ত শুদ্ধ হয়। তখনই চিত্ত বা মন ঈশ্বরাভিমুখী হ'য়ে ঈশ্বরদর্শনের জন্য আকুল হয়। হৃদয় ও মন তখন শ্রীভগবানের বৈঠকখানায় পরিণত হয়। ভগবান সর্বত্রই আছেন ও তিনি সকল-কিছুর প্রাণ এ তত্ত্ব উপলব্ধি ক'রে সংসার করলে তখন আর কোন ভ্রমের সম্ভাবনা থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, সংসার করা কঠিন নয়—যদি মানুষ ধর্ম-সাধনাকে আশ্রয় ক'রে কতকগুলি নিয়ম-নীতি পালন করে। এ নিয়ম-নীতিই আচার ও সাধনা। তিনি বলেছেন: "দিনকতক নির্জনে সাধন করতে হয়। নির্জনে (সাধন) করলে ভক্তি লাভ হয়, জ্ঞান লাভ হয়। তারপর গিয়ে সংসার

করো, দোষ নাই, তিনি।" আরও বলেছেন: "হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙলে হাতে আঠা লাগে না," তেমনি জীবনসিদ্ধিরূপ যথার্থজ্ঞান লাভ ক'রে আসক্তির সংসারে থাকলে ও সংসারের কোন আকর্ষণ বা প্রলোভন সংসারীকে তখন আর বাঁধতে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নির্জনে সাধন করতে বলেছেন। জন বা লোকের সমাগম যেখানে থাকে না তাকেই নির্জন বলে। অথবা নির্জন ও নিরালা তাকেই বলে যেখানে লোক থাকে না, লোকের কোলাহল থাকে না এবং যেখানকার পরিবেশ নীরব নিস্তব্ধ। কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি হয় জন-মানবশূন্য স্থানেও। মানুষ যদিও লোকালয়শূন্য নির্জন স্থানে বাস করে তাহলেও অসংখ্য ভোগের লালসা ও তৃষ্ণা তার মনের মধ্যে সুপ্ত থাকে। তাই ভোগচরিতার্থের জন্য তার মন চঞ্চল হয়, মনের শান্তিও নষ্ট হয়। তাই জনশূন্য নির্জন স্থানে যদি মন স্থির না থাকে তবে জনবহুল ও জনশূন্য স্থান একই কথা। ঋষি পতঞ্জলি যোগসাধন করার আগে তাই মনকে সংযত ও স্থির করতে বলেছেন। স্থির করার অর্থ সমাহিত করা। নির্জন স্থানের পরিবেশ কিছুটা সাহায্য করে মনের চঞ্চল স্বভাবকে শান্ত করার জন্য, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে শান্ত করতে হ'লে 'কিছুটা' বা 'সামান্য' সাহায্যে বিশেষ কোন ফল হয় না। তাই সাধন অর্থাৎ ধারণা ও ধ্যান অভ্যাস করার পূর্বে মনের বৃত্তিকে সংযত ও শান্ত এবং ঈশ্বরাভিমুখী করা দরকার। কিন্তু মনকে সংযত ও শান্ত করার জন্যও সাধনা প্রয়োজন।

কিন্তু সাধনা কি? ঋষি পতঞ্জলি বলেছেন 'যোগ'-সাধনা। তিনি বলেছেন: 'যোগ' বলতে বোঝায় চিত্তবৃত্তিকে (মনের বৃত্তি বা কর্মচাঞ্চল্যকে) নিরোধ, স্থির করা—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিঃ নিরোধঃ" (১)। 'নিরোধঃ'-শব্দটি নিয়ে অনেক বাদানুবাদ আছে। কেউ বলেছেন, মনকে দাবিয়ে রাখা (suppression), বা মনের উদ্দাম বৃত্তি বা প্রবৃত্তিকে দমন (control) করা। আবার কেউ বলেছেন, রূপান্তর (transformation) ঘটানো। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি মনীষীরা মনের রূপান্তর-ঘটানোর পক্ষপাতী। ভাষ্যে ব্যাস নিরোধ অর্থে সমাধি বলেছেন। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন। "You cannot kill the mind. You cannot, but you can transform the mind"। রূপান্তর ঘটানো বা transformation বলতে

মনকে চৈতন্য প্রতিষ্ঠিত করা। এ পরিবর্তন দুধ থেকে দইয়ে পরিবর্তন করার মতো নয়। মনের স্বরূপ গড়ে ওঠে সংকল্প ও বিকল্প-বৃত্তিদুটিকে নিয়ে—সেকথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে, সুতরাং অভ্যাসের সাহায্যে সংকল্প ও বিকল্পকে দূর বা শান্ত করলেই মনের স্বরূপ যে চৈতন্য তাতে মন রূপান্তরিত বা পর্যবসিত হয়—যেমন অজ্ঞান দূর হ'লে জ্ঞানের প্রকাশ হয়। সংকল্প-বিকল্প-রূপ তরঙ্গ (বৃত্তি) দূর হ'লে মন শান্ত হয় ও আত্মস্বরূপে স্থিত হয়। তাই মনের সংকল্প ও বিকল্প-বৃত্তিদুটিকে দূর করতে হয়। বৃত্তি দূর হলেই স্বরূপ কিনা চৈতন্যের প্রকাশ হয়।

কিন্তু তা কেমন ক'রে হয়? শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, সাধনের সময়ে "(তখন) যেন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী, আত্মীয়-কুটুম্ব কেহই কাছে না থাকে, কেননা এগুলি মায়ারূপ আকর্ষণের বস্তু। রোগীর কাছ থেকে যেমন আচার প্রভৃতি লোভনীয় বস্তু সরিয়ে রাখতে হয়—পাছে সে খায় বলে, তেমনি সংসারে প্রবৃত্তির উদ্বোধক ও আকর্ষণের সামগ্রী স্বজন-পরিজনদেরও দূরে রাখতে হয়। এটি করতে হয় একমাত্র সাধনের সময়ে, সিদ্ধিলাভ হ'লে তখন সকল-কিছু কাছে থাকলেও ভয়ের আর কোন কারণ থাকে না। চারাগাছের চারদিকে বেড়া দিতে হয়—পাছে গরু খেয়ে নষ্ট করে, কিন্তু চারাগাছ বড় হ'লে তখন আর বেড়ার দরকার হয় না। তেমনি সাধনার সময়ে সকল-কিছু আকর্ষণের সামগ্রী থেকে দূরে থাকতে হয়, তাতে সাধনার পথ সুগম ও সচ্ছল হয়।

স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়-কুটুম্ব থেকে শুধু দূরে থাকাই নয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, নির্জনে সাধনের সময়ে ভাববে যে, আমার কেউ নেই, এক ঈশ্বরই আছেন, ঈশ্বরই আমার সর্বস্ব। "আর কেঁদে কেঁদে তাঁর (ঈশ্বরের) কাছে জ্ঞান ভক্তির জন্য প্রার্থনা করবে।"

কোন লোক হয়তো বলতে পারেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনার উপদেশ একটু কঠিন, কেননা পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন—যাঁদের নিয়ে সংসার, তাদের বিমুখ করা ন্যায়সঙ্গত কি? কিন্তু তত্ত্ববিচারের দিক থেকে চিন্তা করলে বোঝা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিন্তা, বাণী ও উপদেশের মধ্যে কাঠিন্যের পরিচয় এতটুকুও পাওয়া যায় না। সংসার-অরণ্যে লক্ষ্যহীন ও আদর্শহীন হ'য়ে ঘুরে বেড়ালে মনে হয় না যে, ঈশ্বরই সত্যকারের আপন

জন, তাই আপনার জন ঈশ্বরকে ভুলে থাকা সমীচীন নয়। কত শত জন্মে ও জীবনেই তো আমরা আত্মীয়সম্পর্ক পাতিয়েছি মাতা-পিতা, ভাই বন্ধুর সঙ্গে, কতবার কখনও পিতা-রূপে, কখনও মাতা-রূপে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, আবার মৃত্যুর মুখেও পতিত হয়েছি বারবার, সুতরাং পার্থিব সম্বন্ধের কোন নিশ্চয়তা নেই; আজ যে পুত্র, কাল সে হয়তো পিতারূপে জন্মগ্রহণ করবে; আজ যে কন্যা, কাল সে কারো মাতা-রূপে হয়তো পরিচিত হবে। পুনরায় এ জন্মে যিনি পুত্রের পিতা, পরজন্মে হয়তো তিনি পুত্র-রূপে জন্মগ্রহণ করবেন। আত্মোপলব্ধির অমোঘ আশীর্বাদ না পাওয়া পর্যন্ত কতবারই না মানুষকে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে পড়তে হয়! কিন্তু এই আবর্তের মধ্যে সত্তা একই, কেবল নাম ও রূপের পরিবর্তন। যিনি আত্মার আত্মা—প্রাণের প্রাণ, সেই ব্রহ্মচৈতন্য সকল জন্মে একই রূপে ও একই ভাবে থাকেন, বিকার বা পরিবর্তন তাঁর কোনদিনই হয় না। সুতরাং পরিবর্তনকে ছেড়ে চির-অপরিবর্তনের আশ্রয় গ্রহণ করা সমীচীন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'নির্জন'-শব্দটির কথা অন্যত্র বলেছেন এবং তা হোল বন, মন ও কোন। তিনি বলেছেন: "ধ্যান করবে বনে, মনে, আর কোনে।" 'বন' বলতে জন-মানবশূন্য নির্জন স্থান বা অরণ্য, অথবা জনকোলাহীন নির্জন স্থান। 'মনে' বলতে বিষয়ভোগের বাসনা দূর করা ও মনকে কেন্দ্রগত ও স্থির ক'রে ইষ্টদেবতা বা ভগবানের ধ্যান করা। আর 'কোনে' অর্থে ঘরের কোনে যেখানে স্থানের আর কোন বিস্তৃতি নেই, গোলমাল নেই—সেখানে বসে সাধন ভজন করা। ত্যাগী ও সংসারীদের পক্ষে এ'গুলি প্রশস্ত স্থান।

কিন্তু নির্জনে সাধন করার সময়ে একটি চিন্তাকে আশ্রয় করতে শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব বলেছেন ও সেটি হোল: "নির্জনে সাধনা ও ঈশ্বরের ধ্যান করার সময় চিন্তা করতে হয় 'ঈশ্বরই আমার সর্বস্ব'। স্বজন-পরিজন আজ আছে —কাল নাই, কিন্তু চিরদিনের জন্য সকল সময়ে আছেন ও থাকেন ঈশ্বর। তিনিই মানুষের যথার্থ আশ্রয় ও সহায়—'সর্বস্য প্রভুমীশানং সর্বস্য শরণং বৃহৎ' (শ্বেতাশ্বতর উঃ ৩।১৭)। 'শরণ' বল্‌তে আশ্রয় বা প্রতিষ্ঠা। তিনিই বিশ্বচরাচরের সর্বত্র সর্বাবভাসক চৈতন্যরূপে ও সর্বব্যাপক প্রাণরূপে আছেন —'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'। আবার অন্তর্যামী-রূপে সকল প্রাণীর অন্তরে তিনি অধিষ্ঠিত—'সর্বভূত গুহাশয়ঃ, সর্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ'

(শ্বেতঃ উঃ ৩।১১)। কঠ ও অন্যান্য উপনিষদে হৃদয়-গুহাস্থিত আত্মচৈতন্য বা আত্মার উল্লেখ আছে : 'গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং' (কঠ ২।৬৭, ১।১২—১৩), অথবা 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষোঽন্তরাত্মা, সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' (কঠ ৩।১৭)। এই 'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং' বা অন্তঃকরণশায়ী চৈতন্যময় আত্মাকে দর্শন (বা উপলব্ধি) করাই মানুষের বা সাধকের কর্তব্য)।

জ্ঞানী চিন্তা করেন ও বিচার করেন, কিন্তু ভক্তের ভাব ভিন্ন। ভক্ত 'কেঁদে কেঁদে তাঁর (ঈশ্বরের) কাছে জ্ঞান ভক্তির জন্য প্রার্থনা করবে'। কাঁদার অর্থ ব্যাকুল হ'য়ে ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন করা। এই আত্ম-নিবেদনে এতটুকু 'অহং'-অভিমান থাকবে না। এ আত্মনিবেদনের নাম আত্মসমর্পণ বা self-surrender। এতে দ্বৈতবুদ্ধির নাশ হয়, পরমাত্মাকে আত্মার আত্মা—প্রাণের প্রাণ ব'লে উপলব্ধি হয়। উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত চাইতে হয়, জ্ঞানের দ্বারে আঘাত দিতে হয়, তবেই অজ্ঞানের আবরণে রুদ্ধ জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হয়। পরমজ্ঞান ও পরমপ্রেম চরমদৃষ্টিতে এক ও অভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধপ্রেম এক ও অভেদ,—টাকার এপীঠ ও ওপীঠ। তিনি আরও বলেছেন : "নির্জনে (সাধন) করলে ভক্তি লাভ হয়, জ্ঞান লাভ হয়। * * আর কেঁদে কেঁদে তাঁর (ঈশ্বরের) কাছে জ্ঞান ভক্তির জন্য প্রার্থনা করবে।"

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ *Path of Realization*-গ্রন্থে Efficacy of Prayer বা 'প্রার্থনার উপকারিতা'-সম্পর্কে আলোচনায় বলেছেন সত্যকারের প্রার্থনা কাকে বলে। সাধারণ প্রার্থনায় স্বার্থ মিশানো থাকে—'এই দাও', 'এই করো' প্রভৃতি। 'ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করা' প্রভৃতি আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ প্রার্থনায় মুক্তির বাসনা ও আকুলতা কলুসিত ও ম্লান হয় ; সত্যকার প্রার্থনায় বন্ধনমুক্তির স্বার্থ পরমার্থরূপভাবে পরিণত হয়। জ্ঞান ও প্রেম সকলের হৃদয়ে স্বতঃপ্রকাশিত থাকলেও অজ্ঞান-আবরণের জন্য মানুষ তাদের সত্যকার আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে না। তাঁর প্রকাশের জন্য তাই অন্তরের দ্বারে আঘাত দিতে হয়। এই আঘাত অনেকটা auto-suggestion-এর মতো। তাতে জ্ঞানের ও প্রেমের প্রকাশকে সার্থক করতে সাহায্য করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "জ্ঞান ভক্তি লাভ ক'রে সংসার করলে আর বেশী ভয় নাই।" এই 'বেশী ভয় নাই' কথাগুলি থেকে একথাই বুঝায় যে, জ্ঞানী

ও ভক্তের পক্ষে সংসারে থাকায় ভয় একেবারে যায় না, একটু-আধটু থাকে। জ্ঞানী ও ভক্ত বিচারী, বিবেক-বিচারের শানিত তরবারি নিয়ে তাঁরা সংসার করেন। কিন্তু বিচার একটু স্তিমিত হ'লে পদস্খলনের ভয় আছে। কিন্তু জ্ঞানী ব্রহ্মবিজ্ঞানী। যে ভক্ত ভগবানকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন সংসারে তাঁর ভয় থাকে না। আসলে সংসারকে ভগবানের সত্তা ও প্রকাশ থেকে ভিন্ন মনে করলেই ভয়—'দ্বৈতাদ্ ভয়ম্'। দুয়ের ধারণা থেকেই ভয়ের সৃষ্টি হয়। দুই থাকলে প্রতিদন্দ্বীতার ভয়, কিন্তু যেখানে এক ও অদ্বিতীয় সেখানে কে আর কাকে ভয় করবে! সুতরাং সত্যকার জ্ঞান ও ভক্তি (প্রেম) লাভ হ'লে দ্বৈতজ্ঞান ও ভেদভাব বিলুপ্ত হয়। অদ্বৈতজ্ঞান অভয় ও নিরপেক্ষ, কিন্তু দ্বৈতজ্ঞান আপেক্ষিক ও সম্পর্কযুক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব জ্ঞান বা ভক্তি-সম্পর্কে অদ্বৈতজ্ঞানের কিংবা অভিন্নজ্ঞান ও ভক্তির কথাই বলেছেন। এ জ্ঞান ও ভক্তিই মানবজীবনে কাম্য ও লভ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সত্যকারের জ্ঞান ও ভক্তি লাভ হ'লে মানবজীবনে কি পরিবর্তন হয় ও কি অবস্থার সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন: "যখন নির্জনে সাধন ক'রে মন-রূপ দুধ থেকে জ্ঞান-ভক্তি-রূপ মাখন তোলা হলো, তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার-জলে রাখা যায়। সে মাখন কখনও সংসার-জলের সঙ্গে মিশে যাবে না—সংসার জলের উপর নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৩২)। উদাহরণটি স্পষ্ট ও সুন্দর। যেমন, তেল জলের সঙ্গে মিশে না, তেমনি ভোগের সঙ্গে ত্যাগের মিল হয় না। সাধারণত স্বার্থ ও দেওয়া-নেওয়ার সংসারে আমরা ভোগ ও ত্যাগ একই সঙ্গে জোড়াতালি দিয়ে ব্যবহার করি, ফলে দু'টির (ভোগ ও ত্যাগের) মধ্যে সত্যকার পার্থক্য কি তা বোঝা যায় না। জোড়াতালি দেওয়া মনের কাজ, আর বিবেক-বিচার বা সৎ থেকে অসৎ—নিত্য থেকে অনিত্যকে পৃথক করা বুদ্ধির কাজ। সাংসারিক মায়াবী মানুষ বুদ্ধির চেয়ে মনের অনুশীলন বেশী করে, তাতে ক'রে বিবেক-বিচারের প্রকাশ হয় মলিন এবং জীবন হয় বিপন্ন।

কঠোপনিষদে (২।৩।৮) "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্" প্রভৃতি শ্লোকে (গীতায় ৩।৪২ অনুরূপ মন্ত্রও দ্রষ্টব্য) ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন ও মন অপেক্ষা সত্ত্ব বা বুদ্ধি, বুদ্ধি অপেক্ষা ব্যক্তব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ (মহৎ) এবং মহৎ থেকে

অব্যক্ত ঈশ্বর ও অব্যক্ত থেকে পুরুষ বা আত্মা শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ *Mystery of Death*-গ্রন্থে (কঠোপনিষদের ইংরেজী ব্যাখ্যায়) মন থেকে বুদ্ধি যে কেন শ্রেষ্ঠ সে-সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছেন : "So mind which includes all emotions, volitions, etc. is not the same as our intellect or understanding. Intellect (*buddhi*) is that by which we discriminate and compare one thing with another. That is cognition, and that power of cognition may be called as intellect." *True Psychology*-গ্রন্থেও তিনি অনুরূপভাবে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা ও কার্যকারিতা-সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। বুদ্ধির বিকাশ বলতে 'অগ্রয়া বুদ্ধ্যা'—তীক্ষ্ম ও ক্ষুরধার বুদ্ধি। বুদ্ধি তীক্ষ্ম ও স্বচ্ছ না হ'লে মনে নিরাসক্ত ভাব আসে না, নিরসক্তি না এলে বুদ্ধির বিচার-বিবেকও পরিশুদ্ধ বা সঠিক হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন নির্জনে সাধন করতে। কিন্তু এই সাধনের সঙ্গে শুদ্ধমন ও শুদ্ধবুদ্ধির সহযোগ থাকা চাই। শুদ্ধমন ও শুদ্ধবুদ্ধি পরমচৈতন্য ছাড়া অন্য-কিছু নয়। প্রদীপ্ত চেতনাই নিষ্কাম ও নিরাসক্তির ফলশ্রুতি বহন করে। কামনার সংসারে নিরাসক্ত সংসারী বৈরাগ্যবান সন্ন্যাসীর প্রতিরূপ। নিরাসক্ত শুদ্ধমনাশ্রয়ী সুপ্রসন্ন মানুষ কর্মের সংসারে সকল কর্ম ও কর্তব্য ঠিক ঠিক ভাবে সম্পাদন ক'রে ঈশ্বরে মন রাখতে পারে ও ঈশ্বরে তদ্‌গত মনই সংসারীকে মুক্তির আশীর্বাদ দান করে। তখনই মানুষ 'ঈশ্বরই আমার সর্বস্ব—আমার প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা' এ তত্ত্ব যথার্থভাবে অনুভব করে ও অজ্ঞানবন্ধন চিরদিনের জন্য ছিন্ন ক'রে জীবন্মুক্ত হয়। সুতরাং "তবে সংসারীর কি উপায় নাই?—হাঁ৷ অবশ্যই আছে"—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই বাণী সকল মানুষের অন্তরে শান্তি ও জীবনসান্ত্বনার আশ্বাস দান করে। সান্ত্বনার যথার্থ আশ্বাস না থাকলে বিশ্বাসও আসে না। তাই বিশ্বাস দৃঢ় ক'রে সাধনা-সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়, তবেই জীবনসিদ্ধি।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

॥ কাঁচা-আমি ও পাকা-আমি ॥

"শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশব সেনের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা হচ্ছিল। কেশব বললে, আরও বলুন। আমি বললুম, আর বললে দল-টল থাকে না। তখন কেশব বললে, তবে আর থাক মশাই (সকলের হাস্য)। তবু কেশবকে বললুম, 'আমি' 'আমার' এটি অজ্ঞান। 'আমি কর্তা, আর আমার এই সব স্ত্রী, পুত্র, বিষয়, মান, সম্ভ্রম'—এসব অজ্ঞান না হ'লে হয় না। তখন কেশব বললে, 'মশাই, 'আমি' ত্যাগ করলে যে আর কিছুই থাকে না'। আমি বললুম, 'কেশব, আমি তোমাকে সব আমি ত্যাগ করতে বলছি না, তুমি কাঁচা-আমি ত্যাগ করো। আমি কর্তা, আমার স্ত্রী, পুত্র, আমি গুরু—এ'সব অভিমান কাঁচা-আমি। এইটি ত্যাগ ক'রে পাকা-আমি হয়ে থাকো। আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর ভক্ত, আমি অকর্তা—তিনি কর্তা।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ (১৩৬৬), পৃঃ ১১১—১১২

ব্রহ্মজ্ঞানের কথা শুধু কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গেই নয়, অনেকের সঙ্গে অনেক সময় নানান্ স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলতেন। ব্রহ্মের সঙ্গে যিনি এক হ'য়ে আছেন তিনি ব্রহ্ম ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ করবেন কেন! পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, অদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতব্রহ্ম-সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখনই কিছু বলতেন, বলতেন—'অদ্বৈতবেদান্তীরা বলে' বা 'তোমাদের বেদান্তে আছে' প্রভৃতি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবও অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদী ছিলেন—যদিও তাঁর ব্রহ্মবাদ এবং আচার্য শঙ্করের পূর্বে, সময়ে ও পরে যে ব্রহ্মবাদ, অর্থাৎ শঙ্কর ও শঙ্করানুসারীরা যেভাবে অজ্ঞান ও জগৎকে (বিশ্বসংসারের সত্তাকে) মিথ্যা

(অনিত্য) এবং একমাত্র ব্রহ্মকে সত্য ব'লে ব্রহ্মের একমেবাদ্বিতীয়ম্-তত্ত্ব প্রতিপাদন করেছেন উভয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে দৃষ্টি ও বিচারের দিক থেকে—সেকথা পূর্বেই কিছুটা আলোচনা করেছি। ব্রহ্মজ্ঞানের কথা হচ্ছিল ব্রহ্মবাদী কেশব সেন ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যে। সেটা প্রাসঙ্গিক ও স্বাভাবিক।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে দেখা করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন কেশব সেনের বাড়ীতে যেতেন তেমনি কেশব সেনও সদলবলে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যেতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আলোচনার বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি যেমন গভীর তত্ত্বকথার আলোচনা করতেন, তেমনি মাঝে মাঝে রঙ্গ-তামাসাদিও করতেন হাস্যরসের পরিবেশন ক'রে। যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ ও মহামানবদের জীবনের বৈশিষ্ট্যই তাই। রসস্বরূপ ব্রহ্মকে উপলব্ধি ক'রে তাঁরা কোনদিনই রসহীন শুষ্ক জীবন যাপন করতেন না। একমাত্র সাধারণ ও প্রবর্তক যারা তাদের মধ্যেই দেখি নিরস জীবনের প্রতিফলন ও মিথ্যা গাম্ভীর্য।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী, প্রতিভাবান, তেজস্বী, সুন্দরদর্শন, মিষ্টভাষী ও সত্যের যথার্থ অনুসন্ধী। কেশবচন্দ্র প্রগতিশীল ছিলেন, অচলায়তনের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর সংগ্রামময় জীবন। তিনি পুরাতন ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ ক'রে 'নব-বিধান'-ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যস্পর্শে এসে তাঁর মধ্যে এক নবচেতনার উন্মেষ হয়েছিল। তিনি পুরোপুরি ব্রহ্মবাদী ছিলেন। কিন্তু পরিশেষে শক্তি স্বীকারও করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলেছেন: "কেশব কালী (শক্তি) মেনেছিল।" কিন্তু কেশবচন্দ্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শক্তি স্বীকার করেছিলেন—না শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য-সান্নিধ্যপ্রভাবে এসে শক্তি স্বীকার করেছিলেন সে বিচার-বিতর্কের প্রসঙ্গ এখানে নয়। তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কথাপ্রসঙ্গে (কেশবচন্দ্রকে) বলেছিলেন: "কেশবকে বলেছিলাম, তুমি আদ্যাশক্তিকে মানো। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। (তবে) যতক্ষণ দেহবুদ্ধি, ততক্ষণ দুটো ব'লে বোধ হয়। বলতে গেলেই দুটো। কেশব কালী (শক্তি) মেনেছিল" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ১১২)।

অদ্বৈতবেদান্তের দিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "যতক্ষণ দেহবুদ্ধি

ততক্ষণ দুটো ব'লে বোধ হয়। যতক্ষণ দেহে আত্মবুদ্ধি ততক্ষণই ভ্রম ও মিথ্যাজ্ঞান, ততক্ষণই দ্বৈত। তাছাড়া বাক্য ও মন দিয়ে যে ব্রহ্মকে বোঝানো ও ধরা যায় না, তাকে বাক্য দিয়ে বোঝাতে গেলে, বা মন দিয়ে ধরতে গেলে মানুষকে দ্বৈতক্ষেত্রে অবতরণ করতে হয়। মায়ার ক্ষেত্রেই মন ও বাক্য; মায়ার পারে যেখানে ব্রহ্মচৈতন্যের প্রকাশ তাকে সেখানে মায়ার কার্য ও মায়িক বস্তু দিয়ে ধরা যায় না—একথাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতে চেয়েছেন। তিনি এ'বিচার করেছেন ব্রহ্মবাদী কেশবচন্দ্রের সঙ্গে, সুতরাং চিরপ্রচলিত বেদান্তবিচারেরই শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারণা করেছেন। কিন্তু "যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি" তত্ত্বকথাটি শাঙ্কর বেদান্তে নূতন এবং চিরপ্রচলিত বেদান্তমতের পথচারী কেশব সেনের নিকটও নূতন ব'লে প্রতীত হয়েছিল। কিন্তু তাহলেও শ্রীরামকৃষ্ণের সেই তত্ত্বকথা প্রগতিশীল ও বিচারী কেশবচন্দ্রের মনে এক নূতন চিন্তার আলোড়ন এনেছিল। বেদান্ত বিচার করার সময়ে এতদিন যে একটি সমস্যার সমাধান করার জন্য তাঁর মন অতৃপ্ত ছিল, আজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখে "ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ; যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি" এ সিদ্ধান্তবাক্য তাঁর মনে এক নূতন আশা ও আলোকের সঞ্চার করেছিল। কেশবচন্দ্রের বিচারী মন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সে-কথায় সাড়া দিয়েছিল এবং তিনি শক্তি স্বীকার করেছিলেন—"কেশব কালী মেনেছিল"। মনে হয়, কেশবচন্দ্র সেদিন বুঝেছিলেন, দাহিকাশক্তি ছাড়া যেমন অগ্নির কোন সার্থকতা থাকতে পারে না, তেমনি মহাশক্তি ছাড়া ব্রহ্মচৈতন্যের বিকাশ অসম্পূর্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর অন্যতম শিক্ষাগুরু অদ্বৈতবাদী তোতাপুরীকেও দৈবী মায়া বা শক্তি স্বীকার করিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট মায়া বা শক্তি ছিল ব্রহ্মেরই অভিন্ন বিকাশ। মনে হয়, শুদ্ধ বেদান্তবাদী তোতাপুরীও তাঁর অলৌকিক শিষ্যের অভেদদৃষ্টিকে নির্বিচারে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র শক্তি স্বীকার করেছিলেন কীভাবে সেকথা স্পষ্টভাবে জানা না গেলেও তাঁর মাতৃনামমুখর কীর্তন যে ব্রহ্ম ও শক্তির অভিন্ন ভাব ও রূপকে নিয়ে সার্থক ছিল একথা সহজেই অনুমান করা যায়। কেশবচন্দ্রের পরবর্তী জীবনচর্যা, বিভিন্ন বক্তৃতা, উপাসনা ও উপদেশপ্রণালী লক্ষ্য করলে সেকথা সত্য ব'লে মনে হয়। তাছাড়া দেখি যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব কেশবচন্দ্রকেই লক্ষ্য ক'রে বলেছেন: "যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যতক্ষণ দেহবুদ্ধি ততক্ষণ দুটো

বলে বোধ হয়।" অন্যথা দেহাতীত ও মায়াতীত দিব্যচেতনায় দু'য়ের জ্ঞান বা দ্বৈতজ্ঞান বিলুপ্ত এবং অদ্বৈতজ্ঞানই প্রতিষ্ঠিত হয়।

এখানে বিচার-বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূর্বোক্ত উপদেশের মধ্যে পাই দুটি দৃষ্টির প্রকাশ—অদ্বৈত ও দ্বৈত। যেমন,

(ক) যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি—অদ্বৈত দৃষ্টি,

(খ) যতক্ষণ দেহবুদ্ধি ততক্ষণ দুটো (ব্রহ্ম ও শক্তি) ব'লে বোধ হয়। (মন ও বাক্য দিয়ে) বলতে গেলেই দুটো—দ্বৈত দৃষ্টি।

(ক) অদ্বৈত দৃষ্টি: অদ্বৈত দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ও শক্তির স্বরূপে ও প্রকাশে কোন ভেদ নাই—টাকার এপীঠ ও ওপীঠ, যেমন একই টাকা। একই অখণ্ড চৈতন্যের কখনও ব্রহ্ম-রূপে ও কখনও শক্তি-রূপে প্রকাশ। শক্তি এখানে ব্রহ্মের স্বরূপচ্যুতি বা বিকার নয়, শক্তি অখণ্ড ব্রহ্মেরই অভিন্ন প্রকাশ।

(খ) দ্বৈত দৃষ্টি: যখন ভেদবুদ্ধি বা দুই ব'লে মনে হয় তখনই ব্রহ্ম থেকে শক্তিকে পৃথক মনে হয়। বাক্য দিয়ে বাক্যের অতীত ব্রহ্মবস্তুর ধারণা করা যায় না, কেননা ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ বাক্য ও মনের অতীত—অবাঙ্মনসোঽগোচরম্। বাক্য বা শব্দ ও মননকর্ম বা চিন্তা মায়িক সংসারের বস্তু। তাদের রূপে ও বিকাশে পরিবর্তন আছে। পরিবর্তন অপরিবর্তনীয় সত্তাকে যথার্থভাবে নিরূপণ করতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গেলে গলে যায়, কেননা নুন (লবণ) সমুদ্রের জলেরই পরিণতি। তেমনি বাক্য ও মন যখন তাদের অতীত ব্রহ্মচৈতন্যের স্বরূপ নির্ণয় করতে যায় তখন তাদের অক্ষমতাই প্রকাশ পায়। অদ্বৈত ও অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে বাক্য ও মন দ্বৈত ও পার্থিব রূপকেই প্রকাশ করে। দিব্যানুভূতি বা অপরোক্ষানুভূতির ক্ষেত্রে ব্রহ্ম দুই নয়, ব্রহ্ম ও শক্তি ভিন্ন নয়, বরং সকল দ্বৈত প্রকাশ ও প্রতীতিই অদ্বৈত অনুভবে পর্যবসিত হয়।

মহাসমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্বৈতবাদে ও অদ্বৈতদৃষ্টিতে একটু স্বাতন্ত্র্য ও অপরূপতা আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্বৈতদৃষ্টি আচার্য শঙ্করাদির অদ্বৈতদৃষ্টি থেকে কিছুটা পৃথক, অথবা তার পরিপূরক। আচার্য শঙ্কর ও শঙ্করানুসারীরা স্বরূপের রূপান্তরকে বলেছেন পরিবর্তন, সুতরাং তা মিথ্যা বা অসত্য, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব রূপান্তরকে মোটেই রূপান্তর ব'লে গ্রহণ করেন

নি, বলেছেন রূপান্তর অর্থে একেরই বিচিত্র রূপ, কেননা একও তিনি, বহু বা বৈচিত্র্যও তিনি। তিনি ছাড়া যখন আর কোন-কিছুরই সত্তা নেই তখন আপাতপ্রতীয়মান দ্বৈত ও বৈচিত্র্য এক ও অখণ্ড সত্তারই অভিন্ন রূপ ও প্রকাশ। সাকারও তিনি, নিরাকারও তিনি। সগুণও তিনি, নির্গুণও তিনি।[১] আপেক্ষিক দৃষ্টিতে সকল-কিছুকে দুই বা দ্বৈত ব'লে মনে হয়, কিন্তু পারমার্থিক বা স্বরূপদৃষ্টিতে সমস্তই এক ও অখণ্ড। এই এক ও অভিন্ন দৃষ্টির মাধুর্য জীবন্মুক্তেরাই যথার্থভাবে অনুভব করতে পারেন। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সোনা (সুবর্ণ) থেকে সোনার অলঙ্কারাদি পৃথক বলে মনে হলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে অলঙ্কার সোনা বা সুবর্ণ ছাড়া অন্য-কিছু নয়। বালিশ, লেপ, তোষক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে ও আকারে প্রকাশ পেলেও সকলের উপাদান একই তুলা। তাছাড়া সকলের আবরণবস্ত্রও এক তুলা থেকে তৈরী, সুতরাং তুলাই সকলের উপাদান, অধিষ্ঠান প্রভৃতি। আচার্য শঙ্কর ও শঙ্করানুসারীদের বিচারে সোনা ও তুলা থেকে তৈরী অলঙ্কার ও তোষকাদি সামগ্রী বিকার, সুতরাং মিথ্যা ও পরিবর্তনশীল, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সমন্বয়ী দৃষ্টিতে বিকার স্বরূপচ্যুতি নয়, একই সত্তার বহু রূপে ও নামে প্রকাশ মাত্র। নাম-রূপ শাঙ্কর বেদান্তে পরিবর্তনশীল ব'লে মিথ্যা বা অসত্য, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন নাম-রূপ সৃষ্টির সামগ্রী এবং সৃষ্টির দৃষ্টিতেই তাদের থাকা ও সত্তা। কিন্তু সৃষ্টিও সেই এক ব্রহ্মচৈতন্যের বিকাশ। উপনিষৎ পরিষ্কার ক'রেই বলেছে যে, সৃষ্টি স্রষ্টা থেকে ভিন্ন ব'লে মনে হলেও স্রষ্টাই সৃষ্টিরূপে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করেন—'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ'। তাই বিচিত্র সত্তা এক ও অখণ্ডেরই সত্তা। স্বরূপসত্তায় একেরই যখন প্রকাশ তখন আপাতপ্রতীয়মান বহু বা বৈচিত্র্য এক ও অখণ্ড সত্তা থেকে ভিন্ন কোথায়? একটি উদাহরণ যেমন, একই নট বা অভিনেতা যেমন ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করলেও ব্যক্তিহিসাবে একই নট বা অভিনেতা, তেমনি সংসাররঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন মানুষ ও প্রাণী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যে যার ভূমিকায় অভিনয় করলেও সবার মধ্যে একই চৈতন্যসত্তা ব্রহ্মের প্রকাশ ও স্থিতি। এ সকল কথায় আশ্চর্য হবার কিছু নাই। প্রতিটি যুগে নূতন নূতন পরিবেশে ও সমাজে ঈশ্বরের অবতারগণ আসেন সেই সেই সমাজের

১। এসম্বন্ধে পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

মানুষের ভাব-গ্রহণসামর্থ্যের অনুযায়ী। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ একথার সত্যতা প্রমাণ করেছেন। সকলে এক ঈশ্বরের বা আদ্যাশক্তির প্রকাশ হলেও সকলের নামে, রূপে, চিন্তায় ও কর্মে কিছু কিছু পার্থক্য থাকে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবধারা ও দর্শনচিন্তার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হতে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্বৈতচিন্তা বা অদ্বৈতবাদের চশমাই চোখে দিতে হবে, অন্য চশমায় এ তত্ত্বের অবগুণ্ঠন মোচন করা যাবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, মিছরির রুটি যেমনি ক'রে যেদিক থেকেই খাও না কেন—সকল সময়ে সকল দিকেই মিষ্টি লাগবে। একই জ্ঞানঘন ব্যাপক আত্মচৈতন্য যেকোন নামে যেকোন রূপে প্রকাশ পেলেও তাঁর অখণ্ড রূপের কোন হানি হয় না। তাই রূপ ও অরূপ, সাকার ও নিরাকার এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই বিকাশ। এক ও অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্য কখনও রূপ ও অরূপের অতীত, আবার কখনও সকল রূপের মধ্যে, কখনও অরূপের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন। এক ও বৈচিত্র্য সেই অখণ্ড চৈতন্যেরই প্রকাশভেদ বা রূপভেদ। বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ তাই বলেছে: 'রূপং রূপং প্রতিরূপ বভুব', 'একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা', 'একং রূপং বহুধা য করোতি'। মোটকথা করা ও না-করা (সগুণ)-ব্রহ্মের খুশী। এ খুশীকেই ব্রহ্মের আনন্দকর্ম বা লীলা বলা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই কেশবচন্দ্রকে বলেছিলেন: "তুমি আদ্যা-শক্তিকে মানো। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ; যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি।" এথেকে স্পষ্টই বুঝা যায়, একেরই দুই বা বহু প্রকাশ। প্রকাশে আপাত-ভিন্নতা, কিন্তু স্বরূপে এক ও অখণ্ড। সেজন্য আচার্য শঙ্কর বলেছেন, প্রকাশ মিথ্যা কিনা পরিবর্তনশীল, অর্থাৎ একই রূপে যা থাকে না তাই বিকারী সুতরাং মিথ্যা। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, প্রকাশ তাঁর বা তিনিই, আবার অপ্রকাশও তাঁর বা তিনিই। নিত্য ও লীলায় ভেদ নাই, কেননা যিনিই নিত্য বা নিত্যে, তিনিই লীলা বা লীলায়। সুতরাং নিত্য ও লীলা তত্ত্বে সত্য ও মিথ্যা-বিচারের কোন অবকাশ নাই।

দেখা যায়, শক্তি যে এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই অভিন্ন রূপ—এ তত্ত্ব কেশবচন্দ্র প্রথমে বুঝতেন না, বা বুঝার চেষ্টা করেন নি, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন 'ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ' এ তত্ত্ব প্রত্যক্ষানুভূতির আলোকে ও দৃঢ়প্রত্যয়

নিয়ে বলেছিলেন তখনই মনে হয়, কেশবচন্দ্র শক্তি মেনেছিলেন, অর্থাৎ শক্তিকে ব্রহ্ম থেকে অভেদ ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। কেশবচন্দ্রের পরবর্তী জীবনে তাই দেখি যে, তাঁর মধ্যে ভাবের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছিল, কীর্তনানন্দে তিনি 'মা মা' বলে নৃত্য করতেন।

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আলোচনা হয়েছিল বিশেষভাবে সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িক ভাবের প্রসঙ্গ নিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কেশবচন্দ্র প্রশ্ন করেছিলেন: "ব্রহ্মজ্ঞান হলে কি দলটল থাকে ?" শ্রীরামকৃষ্ণদেব উত্তরে 'না' বলেছিলেন, কেননা দল বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় 'আমি কর্তা' এই জ্ঞান থেকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন: "'আমি' 'আমার' এটি অজ্ঞান। 'আমি কর্তা', আর 'আমার এই সব স্ত্রী, পুত্র, বিষয়, মান, সম্ভ্রম' —এই সব অজ্ঞান না হলে হয় না।" অজ্ঞান 'কাঁচা-আমি' বা অহংজ্ঞান। অজ্ঞান অহংজ্ঞানের আবরণ। অজ্ঞানের কাজই সত্যজ্ঞানকে আবৃত ক'রে মিথ্যাজ্ঞান সৃষ্টি করা। মিথ্যাজ্ঞানের নাম অধ্যাস। এই অধ্যাসের পরিচয় দিয়ে আচার্য শঙ্কর বলেছেন 'অতস্মিংস্তদ্‌বুদ্ধিঃ'—যেটা যা নয় তাকে তাই বলে জ্ঞান করানোর নাম অধ্যাস। কিন্তু অজ্ঞান জ্ঞানের অভাব (ন + জ্ঞান) নয়, কিন্তু অজ্ঞান জ্ঞানই, তবে মিথ্যাজ্ঞান—যা সত্যজ্ঞানের বিপরীত। আচার্য শঙ্কর আলোক ও অন্ধকারের মতো অজ্ঞানকে জ্ঞানের বিপরীত বলেছেন। এই বিপরীত বুদ্ধিই অসত্য ও মিথ্যাজ্ঞান।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, মিথ্যাজ্ঞান 'আমি' 'আমার' প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির সৃষ্টি করে। স্বার্থবুদ্ধি (ego-centric idea) বিরাট আমির বিকাশ ও দৃষ্টিকে হীনপ্রভ করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই 'কাঁচা-আমি' ত্যাগ ক'রে 'পাকা-আমি' বা বিরাট আমির আশ্রয় গ্রহণ করতে বলেছেন। কেশবচন্দ্রকে লক্ষ্য ক'রে তাই তিনি বলেছেন: "কেশব, তোমাকে সব 'আমি' ত্যাগ করতে বলছি না, তুমি 'কাঁচা-আমি' ত্যাগ করো। 'আমি কর্তা', 'আমার স্ত্রী-পুত্র', 'আমি গুরু'—এসব অহং-অভিমান, কাঁচা-আমি। এটি ত্যাগ ক'রে পাকা আমি হয়ে থাকো। আমি তাঁর (শ্রীভগবানের) দাস, আমি তাঁর ভক্ত, আমি অকর্তা, তিনি কর্তা—এই অভিমান পাকা-আমি-র অভিমান —যা অভিমান পদবাচ্য নয়। পাকা-আমি সর্বাত্মক সমষ্টিচেতনা—ইংরেজীতে যাকে বলে Cosmic Idea বা Cosmic Will। গীতায় দেখি,

শ্রীকৃষ্ণ আত্মস্থ হয়ে বহু স্থানেই 'আমি' 'আমার', 'আমাকে' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন—

(ক) অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। ১৮।৬৬

(খ) সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। ১৮।৬৬

(গ) মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। ১৮।৬৫

(ঘ) ময়ি সর্বাণি কর্মাণি···। ৩।৩০ প্রভৃতি

শ্রীকৃষ্ণ আত্মস্থ হ'য়ে 'অহং' 'ময়ি'—'আমি', 'আমাতে' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করার অর্থই অহংজ্ঞান-রূপ স্বার্থবুদ্ধি বা অজ্ঞানের পারে গিয়ে তিনি পাকা আমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। পাকা-আমি-র অভিমানে বা আসক্তিতে বন্ধনের ভয় থাকে না, বরং মুক্তির আশীর্বাদ থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাধনাবস্থায় বলতেন—'নাহং নাহং, তুহুঁ তুহুঁ'। তাই আমি-র আসনে তুমি-কে বসালে সংসারাসক্তি দূর হয়, চিত্ত নির্মল হয়, অজ্ঞান দূর হয়ে জ্ঞানের আলোকে অন্তর উদ্‌ভাসিত হয়। সুতরাং মনে রাখতে হবে যে, স্বার্থের সঙ্কীর্ণ অভিমানই অজ্ঞান, আর নিঃস্বার্থের অভিমান দেশ-কালহীন ব্যাপকচৈতন্য। একটি অভিমানে কাঁচা-আমি-তে সংসারবন্ধন, ও আর একটি অভিমানে পাকা-আমি-তে বন্ধনমুক্তি।

এপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীকথামৃত থেকে একটি উদাহরণ দেই। 'ঈশ্বরের আদেশ পেয়ে তবে ধর্মপ্রচার করা উচিত' শীর্ষক আলোচনার প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "কেশব সেনকে বললুম, আমি দলপতি, দল করেছি, আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি—এ 'আমি' কাঁচা-আমি। মত প্রচার বড় কঠিন। ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতিরেকে (লোকশিক্ষা) হয় না। তার আদেশ চাই (এই আদেশকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অন্যত্র 'চাপরাশ' বলেছেন)। যেমন শুকদেব ভাগবত-কথা বলতে আদেশ পেয়েছিলেন। যদি ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার ক'রে কেউ আদেশ পায় (চাপরাশ পায়), তখন সে যদি প্রচার করে, লোকশিক্ষা দেয়, দে'ষ নাই। তার 'আমি' কাঁচা-আমি নয়, পাকা 'আমি' (শ্রীশ্রীকথামৃত ১ম ভাগ, পৃঃ ১১২)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, ঈশ্বরের আদেশ পেয়ে তবে ধর্মপ্রচার করা উচিত। ঈশ্বরের আদেশ পাওয়া ও ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ শরণাগতির ভাব নিয়ে সংসারে থাকা প্রায় একই কথা। সংসারাসক্তির 'আমি' থাকবে, আর

নিরাসক্তি ও শরণাগতির 'তুমি' থাকবে—এ কখনও হয় না। ঈশ্বরকে যিনি জেনেছেন ও লাভ করেছেন, তিনি আত্মজ্ঞানী, তিনি অজ্ঞানের আবরণ দূর করেছেন। জ্ঞানীর হৃদয়ে অজ্ঞানের মালিন্য না থাকায় মন চিরনির্মল। জ্ঞানীও সংসারে কর্ম করেন, তবে নিরাসক্তভাবে। জ্ঞানী ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে সংসারের সকল কাজ করেন, তাই কর্মের ফল তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না। এই আত্মদৃষ্টি ও নিরাসক্তিই 'ঈশ্বরের আদেশ' বা 'চাপরাশ'। এই অবস্থায় লোকশিক্ষা দেওয়া যায়। তখন লোকশিক্ষা—লোকের কল্যাণসাধন করা-রূপ ব্রতে রূপান্তরিত হয়। তখন সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা, আমার ইচ্ছা থাকে না। একটি গানে আছে, যথার্থ ঈশ্বরাশ্রয়ী সাধক ঈশ্বর ছাড়া অন্য-কিছু আকাঙ্ক্ষা করে না, বা অন্য-কিছুর আশ্রয় গ্রহণ করে না। তখন এ অবস্থা দাঁড়ায়—

সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি ॥

সংসারের সমস্ত কর্মই তখন ঈশ্বরের কর্ম ও কর্তব্য ব'লে দৃঢ়প্রত্যয় হয়। স্বার্থদুষ্ট 'আমি'-র আর তখন কোন স্থান থাকে না। গীতায় ঈশ্বরাশ্রয়ী আত্মজ্ঞানী মানুষের কী অবস্থা হয় তার বর্ণনা ক'রে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে…(২।৪৬)

অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ হলে যাবতীয় পরিচ্ছিন্ন চিন্তা, কর্ম ও অভিমান অখণ্ডৈকরসস্বরূপ ব্রহ্মে একাকার বা একীভূত হয়—যেমন একাকার ও একীভূত হয় ক্ষুদ্র পুষ্করিণী, নদী প্রভৃতি বন্যার দ্বারা প্লাবিত হলে। আত্মজ্ঞান-রূপ আদেশ বা চাপরাশ লাভ হ'লে তবেই গুরু বা আচার্যের আসনে বসে লোকশিক্ষা দেওয়া যায়, তখন আর 'আমি গুরু' 'আমি আচার্য' এ সব অভিমান থাকে না।

কেশবচন্দ্র সেনকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এভাবেই শিক্ষা দিয়াছিলেন অনেকবার (শ্রীশ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ৬১)। 'কেশবকে শিক্ষা শীর্ষক' আলোচনায় শ্রীম শ্রীশ্রীকথামৃতে লিপিবদ্ধ করেছেন : "**গুরু এক সচ্চিদানন্দ।** তিনিই শিক্ষা দেবেন। * * লোকশিক্ষা বড় কঠিন। যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন, আর **আদেশ** দেন, তাহলে হতে পারে। নারদ শুকদেবাদির আদেশ

হয়েছিল। শঙ্করের আদেশ হয়েছিল। আদেশ না হ'লে কে তোমার কথা শুনবে * *।"

"আবার মনে মনে আদেশ হ'লে হয় না। তিনি সত্য-সত্যই সাক্ষাৎকার হন, আর কথা কন। তখন আদেশ হ'তে পারে। সে কথার জোর কত, পর্বত টলে যায়! শুধু লেক্‌চার? দিন কতক লোক শুন্‌বে, তারপর ভুলে যাবে * *।"

কেশবচন্দ্র নববিধান-ব্রহ্মসমাজের আচার্য, সুতরাং লোকশিক্ষার জন্য বক্তৃতাদি তাঁকে প্রায়ই দিতে হোত। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট কেশবচন্দ্র শুনলেন আত্মদর্শন ছাড়া আর সকল কাজ ও চিন্তাই অসার্থক ও মূল্যহীন। কেশবচন্দ্রকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রথমে ঈশ্বর দর্শন ও পরে লোকশিক্ষা দেবার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "যদি তিনি (ঈশ্বর) সাক্ষাৎকার হন (দর্শন দেন) আর আদেশ দেন, তাহলে হ'তে পারে।" 'হতে পারে' বলতে তখনই গুরু বা আচার্যের আসনে বসে লোককে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, না হলে হাসির কথা হয়। "আপনারই হয় না, আবার অন্যলোক। **কানা কানাকে পথ দেখিয়ে লয়ে যাচ্ছে** (হাস্য)। হিতে বিপরীত।" ঈশ্বরদর্শন ছাড়া জীবন অন্ধলোকের মত মূল্যহীন। সুতরাং যার আত্মজ্ঞান নাই, সে অজ্ঞান-অন্ধকারের মধ্যে পড়ে নিজেও অন্ধ হয়। যে গুরু বা আচার্য ঈশ্বরদর্শন বা আত্মজ্ঞান লাভ করেন নি তিনি অজ্ঞানে আবদ্ধ থাকার জন্য অন্ধ, চক্ষুরিন্দ্রিয় থাকলেও তিনি অজ্ঞানান্ধ। সুতরাং আত্মহীন আচার্য বা লোকশিক্ষক অধ্যাত্মজীবনে পথের নিশানা দেওয়ার পক্ষে অক্ষম ও অপারক। কঠোপনিষৎ তাই বলছে: "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ"। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "কানা কানাকে পথ দেখিয়ে লয়ে যাচ্ছে। হিতে বিপরীত।" সত্যই হিতে বিপরীত হয়। মহাত্মা কবির বলেছেন অনুরূপ কথাই—

অন্ধে গুরু অন্ধে চেলা, দোনো নরকমে ঠেল্লাম ঠেলা।

অন্ধ গুরু ও অন্ধ শিষ্য ঠেলাঠেলি করতে করতে পরিশেষে অন্ধকূপে পড়ে দু'জনেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভবসাগর পার করার দায়িত্ব নেওয়া কি সহজ? 'উপদেশসাহস্রী'-গ্রন্থে উপনিষদের উদ্ধৃতি দিয়ে আচার্য শঙ্কর লিখেছেন: 'আচার্যঃ প্লাবয়িতা, তস্য সম্যগ্‌জ্ঞানং প্লব ইহোচ্যতে' "ইত্যাদি

শ্রুতিভ্যঃ"। সম্যকজ্ঞানীই সংসার-সাগরে প্লব কিনা নৌকারূপ আচার্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "ভগবান লাভ হ'লে অন্তদৃষ্টি হয়, কার কি রোগ বোঝা যায়।" সংসারে ও জীবনের পথে অজ্ঞান ও ভ্রান্তিই একমাত্র রোগ। এই ভ্রান্তিরোগ বা অজ্ঞানরোগের উপশম হ'লে তবেই জ্ঞানের প্রকাশ হয় ও জীবনে পরমশান্তি লাভ হয়।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ দাস, ভক্ত ও বালকের আমি ॥

"বিজয় (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। মহাশয়, আপনি বজ্জাৎ 'আমি' ত্যাগ করতে বলেছেন। 'দাস-আমি'-তে দোষ নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, দাস-আমি অর্থাৎ আমি ঈশ্বরের দাস, আমি তাঁর ভক্ত—এই অভিমান। এতে দোষ নাই, বরং এতে ঈশ্বর লাভ হয়।

বিজয়। আচ্ছা, যার দাস-আমি, তার কাম-ক্রোধাদি কিরূপ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক ভাব যদি হয় তাহলে কাম-ক্রোধের কেবল আকারমাত্র থাকে। যদি কারো ঈশ্বরলাভের পর 'দাস-আমি' বা 'ভক্তের আমি' থাকে, সে ব্যক্তি কারো অনিষ্ট করতে পারে না। পরশমণি ছোঁয়ার পর তরবার সোনা হ'য়ে যায়, (তখন) তরবারের আকার থাকে, কিন্তু কারো হিংসা করে না।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, ১৩৬৬, পৃঃ ৯৭

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্ত কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে উপদেশপ্রসঙ্গে 'কাঁচা-আমি' ও 'পাকা-আমি'-র আলোচনা করেছেন সুনিপুণভাবে। 'আমি' বা 'অহং'-অভিমানই সংসার-বন্ধনের কারণ। 'আমি'-রূপ অহং বা 'অহং'-অভিমান অন্তঃকরণের একটি বৃত্তি: ঐ বৃত্তিজ্ঞানের উপর অজ্ঞানের আবরণ দিয়ে ভ্রম সৃষ্টি করে ও অসত্যকে সত্য ব'লে ভুল বোঝায়; মরণশীল দেহকে আত্মা ব'লে মনে করায়। এই ভুল বুঝানো ও মনে করানোর নাম ভ্রম বা মিথ্যাজ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞানকে আচার্য শঙ্কর বলেছেন অধ্যাস। অধ্যাস কিনা অধ্যস্ত হয় একটি মিথ্যাবস্তু সত্যবস্তুর উপর, যেমন সর্প অধ্যস্ত হয়

রজ্জুর উপর, অনাত্মবস্তু অধ্যস্ত হয় আত্মার উপর, বিশ্বচরাচর অধ্যস্ত হয় ঈশ্বরের উপর। মোটকথা অধ্যাস মিথ্যাজ্ঞান। এই অধ্যাস মিথ্যাবস্তুকে সত্য ব'লে জ্ঞান করায়; ক্ষয়শীল দেহকে অক্ষয় আত্মা ব'লে ভ্রম করায়। আচার্য শঙ্কর তাই অধ্যাসকে বলেছেন: "তমঃপ্রকাশবৎ বিরুদ্ধস্বভাবয়োঃ…", অর্থাৎ অধ্যাস অন্ধকার ও আলোকের মতো বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন, কারণ অধ্যাস অন্ধকারকে আলোক ব'লে ভুল বোঝায়, অথচ অন্ধকার আলোকের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বস্তু।

ভ্রমই মায়া বা মিথ্যা। সাধারণ মানুষ ভ্রমের জন্য সংসারে অন্যায় কর্ম করে। সংসার চঞ্চল, প্রতিমুহূর্তেই তার সকল-কিছুর পরিবর্তন হয়। সংসারের স্বভাব-সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায় মানুষ সংসার ও তার সকল বস্তুকে নিত্য ও সত্য ব'লে মনে ক'রে পদে পদে বিপর্যস্ত হয়। অনিত্য ও অসত্য বস্তুকে নিত্য ও সত্য ব'লে মনে করাটাই ভ্রম। ভ্রমে বিচারশক্তি নষ্ট হয়। কোন্‌টা সত্য ও কোন্‌টা অসত্য—কোন্‌টা নিত্য ও কোন্‌টা অনিত্য এই বিবেকজ্ঞান মানুষ তখন হারিয়ে ফেলে। ভ্রমই মানুষের বিবেক ও বিচারকে ম্লান ক'রে সত্য-মিথ্যা-নির্ধারণের পথ রুদ্ধ করে। তাই নিত্য ও সত্য-বস্তু আত্মাকে জানতে গেলে ভ্রমরূপ মায়াকে দূর করতে হয়। মিথ্যাজ্ঞান-সংশোধনের প্রয়োজন হয়। একথাও আবার সত্য যে, ভ্রম বা মিথ্যাজ্ঞানের সৃষ্টি হয় কোন একটি সত্যজ্ঞানের স্মৃতি আগে থেকে মনের মধ্যে থাকে ব'লে। যেমন নৈয়ায়িকরা বলেন, রজ্জুতে সর্পজ্ঞানরূপ ভ্রম হয়, যেহেতু পূর্বে কোথাও কোন সময়ে সত্যকারের সর্প দেখেছি ব'লে। সে সত্যকারের সর্পের স্মৃতিজ্ঞানই রজ্জুরূপ সত্যবস্তুতে সর্পরূপ মিথ্যাজ্ঞান করায়। এক্ষণে 'স্মৃতি' কাকে বলে তার পরিচয় দিয়ে শাস্ত্রকাররা বলেছেন: "স্মৃতিরত্রপূর্ব-দৃষ্টাবভাসঃ", অর্থাৎ পূর্বে দেখা কোন বস্তুর অবভাস বা মানসিক ছায়ার নাম স্মৃতি।

বেদান্তে অহংপ্রত্যয় বা 'আমি'-জ্ঞান নিয়ে বিভিন্ন রকমের বিচার আছে। যেমন জড়দেহকে আমরা 'আমি' ব'লে সম্বোধন করি, তেমনি আত্মাকে যখন যথার্থ-অহং বা আমি বলি তখনই অজ্ঞান দূর হয়ে জ্ঞানের প্রকাশ হয়। অবশ্য আত্মজ্ঞান হ'লে অহং বা 'আমি'-শব্দ আমরা ব্যবহার করি যখন একাত্মক (দেহকে আত্মা ব'লে) জ্ঞান হয়। উপনিষদ্‌ভাষ্যের এক স্থানে আচার্য শঙ্কর বলেছেন, স্বরূপত আমরা ব্রহ্ম বা আত্মা ব'লে অজ্ঞান-

অভিমানের বেলাতেও অহং বা আমি-শব্দ ব্যবহার করি দেহবান ব্যক্তিকে বুঝানোর জন্য। আসলে ব্রহ্মরূপ অহম্ বা 'আমি'-র স্মৃতিই জড়দেহে বা ব্যক্তিতে সংক্রমিত হয়—এটি প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা। ব্রহ্মরূপ শুদ্ধ-অহং-ই 'পাকা আমি'—যা দেহে ও ইন্দ্রিয়াদিতে অহংজ্ঞান 'কাঁচা-আমি'-রূপে প্রকাশ পায়। কাঁচা ও পাকা এই বিশেষণ-দুটি বাদ দিলে উভয়ের সঙ্গে যুক্ত যে অহং বা 'আমি' বিশেষ্য তা এক ও অভিন্ন, যেমন জীব ও ব্রহ্মের চৈতন্যাংশ এক ও অভিন্ন। অজ্ঞানই আমাদের এই অভিন্ন অংশ আত্মচৈতন্যকে বুঝতে দেয় না, ভুলিয়ে রাখে, কিন্তু অজ্ঞান (ভ্রম) দূর হ'লে কাঁচা ও পাকা-আমি—জীবে ও ব্রহ্মে যে এক ও অভিন্ন অনুস্যূত ব্যাপ্ত চৈতন্য তাঁকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হই।

এ যুক্তি ও বিচার একটু কঠিন। তবে একথাও আমরা জানি যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্দেশিত 'কাঁচা-আমি'-রূপ অজ্ঞানে প্রলেপযুক্ত আমি ও 'পাকা-আমি'-রূপ অজ্ঞানলেশশূন্য আমি এই দুটির মধ্যে একটিতে থাকে স্বার্থদুষ্ট সসীম কর্তৃত্বের অভিমান ও অপরটিতে থাকে নিঃস্বার্থ আত্মচৈতন্যনিষ্ঠ অসীম কর্তৃত্বের অভিমান। দুটি অভিমানের মধ্যে পার্থক্য অনেক। আচার্য শঙ্কর এ দুটি অভিমান বা প্রত্যয়কে আলোক ও অন্ধকারের মতো বিরুদ্ধস্বভাব-সম্পন্ন বলেছেন। তবে একথা ঠিক যে, বিরুদ্ধ জ্ঞানরূপ ভ্রম দূর হ'লে অবিরুদ্ধ অখণ্ড আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধি হয়। এ উপলব্ধির নাম ব্রহ্মজ্ঞান, স্বরূপজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান।

কাঁচা-আমি থেকে পাকা-আমি-র জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হ'তে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব বলেছেন 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু' এই মন্ত্রবাক্য বারবার উচ্চারণ করতে হয়। 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু' মন্ত্রবাক্যের অর্থ অহং কিনা দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্ত সীমাবদ্ধ আমি বা ব্যক্তি তুঁহু বা তুমি কিনা স্বার্থগন্ধহীন বিরাট-আমি বা ব্যক্তি। এই 'বিরাট-আমি'-র (ব্যক্তির) নাম ঈশ্বর, অব্যক্ত, অব্যাকৃত, প্রজ্ঞা, প্রকৃতি প্রভৃতি—ইংরেজীতে যাকে বলে Cosmic Energy, Cosmic Will বা Cosmic Universal Person বা God। এই অসীম (ইউনিভার্স্যাল) আমি-সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে গেলে সসীম (ইন্ডিভিডুয়াল) সত্তাকে ভুলে যেতে হয়, কিংবা সসীম ক্ষুদ্র সত্তাকে অসীম বৃহৎ সত্তার মাঝে বিলীন করতে হয়। এরই জন্য 'কাঁচা-আমি'-রূপ বজ্জাত (বজ্জাৎ এ'জন্য যে, কল্যাণময়

আত্মস্বরূপকে এ স্বার্থের আমি জানতে দেয় না) আমিকে 'পাকা আমি'-র আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন।

তাহলে স্বার্থগন্ধহীন অসীম 'আমি'-জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করার সত্যকারের উপায় কি? শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'দাস-আমি'—আমি ঈশ্বরের দাস, আমি তাঁর ভক্ত—এই অভিমান অন্তরে আন্‌তে হয়। ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার রূপ শরণাগতির নাম দাসভাব। 'দাস'-ভাব বা অভিজ্ঞান কিন্তু পরাধীনতারূপ দাসত্বের শৃঙ্খল নয়, এর নাম প্রপত্তি বা শরণাগতি। ঈশ্বরই পরমবস্তু, বিশ্বসংসারের সার ও আধার, তাঁর সত্তাতেই সকল-কিছুর সত্তা—এই স্থির বিশ্বাস ও প্রত্যয় নিয়ে বিরাট ও ব্যাপক সত্তার পাদপীঠে নিজের ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তাকে বলিদান দেওয়ার নাম শরণাগতি—যে শরণাগতির পরিচয় পাই বীরভক্ত অর্জুনের মুখে—'শিষ্যস্তেঽহং সাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'-বাণীতে। অর্জুন দেহসত্তায় বিশ্বাসী হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যে তর্ক, বিচার ও প্রতিবাদ করেছিলেন, বিশ্বরূপ দর্শনের পর তাঁর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়। তখন তিনি 'শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানই একমাত্র যন্ত্রী ও সকল-কিছুর কারণ ও কর্তা এবং তিনি ভগবানের যন্ত্রমাত্র' এই তত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন, সেজন্য অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তাই অহং-জ্ঞান দূর ক'রে নিরভিমানতার আশ্রয় গ্রহণের নাম শরণাগতি। তাই 'দাস-আমি' অর্থাৎ 'আমি ঈশ্বরের দাস, আমি তাঁর ভক্ত' এ অভিমানে বা জ্ঞানে ঈশ্বরের মহিমানুভূতির পর ঈশ্বরের প্রতি শরণাগতির ভাব উদয় হয়।

মনে রাখতে হবে যে, 'দাস-আমি'-রূপ শরণাগতির পিছনে থাকে একটি জ্ঞান বা প্রত্যয়—যে জ্ঞানে বা প্রত্যয়ে ঈশ্বরের সত্তা ও স্বরূপসম্বন্ধে জানার মধ্যে সন্দেহের আর কোন অবকাশ থাকে না। ঈশ্বরচেতনায় সাধকের হৃদয় তখন আপ্লুত হয়। সাধক তখন উপলব্ধি করেন যে, আমার ব্যক্তিত্ব, সত্তা ও শক্তি সকল-কিছুর কারণ ও উৎস ঈশ্বরই। তখনই 'বিরাট-আমি'-রূপ 'পাকা-আমি'-জ্ঞানের প্রকাশ হয় ও সেই প্রকাশে 'ঈশ্বর লাভ হয়' কিনা ঈশ্বর যে আমার আত্মা এই নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞানের প্রকাশ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "এতে (এই 'পাকা' ও সীমাহীন বিরাট-আমি-র অভিমানে) ঈশ্বর লাভ হয়।" ঈশ্বরলাভের অর্থ ঈশ্বরদর্শন। তখন সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বরচৈতন্যই স্বরূপে নিগুর্ণ-ব্রহ্মচৈতন্য এই অভেদতত্ত্ব উপলব্ধি হয়।

প্রথমটিতে (প্রথম অর্থে) জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন, কিন্তু ঈশ্বর জীবের একমাত্র আরাধ্য ও আশ্রয়স্থল, ঈশ্বর ছাড়া জীবের অন্য সত্তা নাই—এই প্রপত্তি বা শরণাগতিযুক্ত জ্ঞান হয় এবং ঈশ্বরের (সগুণ-ব্রহ্মের) জ্ঞানময় ও আনন্দময় স্বরূপ দর্শনে সাধক কৃতকৃতার্থ হয়, আর দ্বিতীয়টিতে (দ্বিতীয় অর্থে) ঈশ্বর-লাভের অর্থ জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে মায়ার আবরণ দূর হ'লে স্বতঃপ্রকাশ ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়—মেঘের অপসারণে যেমন আকাশে সূর্য প্রকাশিত হয়। এ উপলব্ধিতে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় ও জীবই ব্রহ্ম এই অভেদজ্ঞানের প্রকাশ হয়। এই প্রকাশের নাম উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষানুভূতি।

কাঁচা-আমি ও পাকা-আমি-র মধ্যে পার্থক্য কি রকম তারও পরিচয় দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীকথামৃতে (১ম ভাগ, পৃঃ ৯৬)। দু'টি আমি-র প্রভেদ-সম্বন্ধে উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন, জীব (কাঁচা-আমি) ও আত্মার (পাকা-আমি-র) প্রভেদ হয় এই (অজ্ঞান-অহং-রূপ) 'আমি' মাঝখানে আছে ব'লে। জলের উপর একটি লাঠি ফেলে দিলে জলের দু'টি ভাগ হয়, আসলে একই জল, লাঠিটার জন্য দু'টি দেখায়। 'অহং'-ই এই লাঠি। লাঠি তুলে নিলে এক জলই থাকে (শ্রীশ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ৯৬)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই উদাহরণে প্রকারান্তরে পার্থিব জড়বস্তুর জ্ঞান ও অপার্থিব ব্রহ্মবস্তুর জ্ঞানরূপ দ্বৈত ও অদ্বৈত তত্ত্বের কথাই বলেছেন। দ্বৈত-জ্ঞান ভেদজ্ঞান ও অদ্বৈতজ্ঞান অভেদজ্ঞান। অভেদজ্ঞানে অদ্বৈতানুভূতি হয়। মনে রাখতে হবে যে, আচার্য শঙ্কর এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব উভয়ের অদ্বৈতজ্ঞানের মধ্যে অনুভূতির যে একটু প্রকারভেদ আছে সে-সম্বন্ধে পূর্বে আলোচিত হয়েছে। তবে দু'জনের সিদ্ধান্তই অদ্বৈততত্ত্ব।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রশ্ন করেছেন : "আচ্ছা, যার 'দাস-আমি', তার কাম-ক্রোধাদি কিরূপ? তিনি প্রশ্ন করেছেন যে, সাধক ও ভক্ত শরণাগতি নিয়ে 'ঈশ্বরের দাস এই আমি' ভাবে থাকে, কিন্তু তার নির্মল অন্তঃকরণে কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপুর কোন প্রভাব ও ক্রিয়া থাকে কি-না? তার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "ঠিক ভাব যদি হয় তাহলে কাম-ক্রোধের কেবল আকার-মাত্র থাকে।" 'দাস-আমি'-রূপ শরণাগতি বা প্রপত্তির মধ্যে উনিশ-কুড়ি ভেদ বা কম-বেশী কিছু পার্থক্য থাকতে পারে, তাই

শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'ঠিক-ভাব'-এই কথা বলেছেন। দাস-ভাবের মধ্যে কোথাও কোথাও 'আমি-দাস' এই 'অহং'-ভাবের একটু প্রকাশ থাকে—যা মনে সৃষ্টি করে গর্ব, স্বার্থভাব ও অহংকার। 'আমি অনেক তীর্থ ক'রে পুণ্যলাভ করেছি', 'আমি লোককে দয়া-দাক্ষিণ্য করি,' 'আমি অপরের চেয়ে বেশী সাধন-ভজন ও ঈশ্বর-চিন্তা করি'-এই 'আমি'-র উপর গুরুত্ব-আরোপ-স্বার্থের আসক্তি ও নির্মলতার পরিবর্তে সৃষ্টি করে অজ্ঞান মালিণ্য, ফলে মনে প্রসারতা সৃষ্টি হয় না, আর আমি-র আসনে তুমি-র আসন প্রতিষ্ঠিত হয় না, ফলকামনা ও যশলিপ্সাই বরং হৃদয়কে অধিকার ক'রে বসে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন 'ঠিক ভাব' কিনা যথার্থ 'দাস-আমি'-র ভাব যদি অন্তরে থাকে তবেই আসক্তিরূপ বন্ধন শিথিল হয় ও স্বার্থের ভাব পরার্থভাবে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরের ফলে চিত্ত নির্মল হয় ও নির্মল সেই চিত্তমুকুরে ব্রহ্মচৈতন্য প্রতিফলিত হন এবং তখনই আত্মস্বরূপের উপলব্ধি হয়। এ উপলব্ধির আর এক নাম ঈশ্বরলাভ বা ঈশ্বরদর্শন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "ঈশ্বরলাভের পর 'দাস-আমি' বা 'ভক্তের আমি' যে ব্যক্তিতে থাকে, সে ব্যক্তি কারো অনিষ্ট করতে পারে না। পরশমণি ছোঁয়ার পর তরবারি সোনা হয়ে যায়, তরবারের আকার-মাত্র থাকে কিন্তু কারো হিংসা করে না।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব-প্রদর্শিত এই উদাহরণের পিছনে এক গূঢ়তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ঈশ্বরলাভ বা ঈশ্বরদর্শন হ'লে অহং-অভিমানের ও অজ্ঞানের রূপান্তর ঘটে, সুতরাং মনে তখন আর সৎ বা অসৎ কোনরকম বৃত্তির বিকাশ থাকে না। মন তখন প্রশান্ত সচ্চিদানন্দসাগরে রূপান্তরিত হয়। যোগদর্শনে ঋষি পতঞ্জলি প্রথম পাদের ১ম ও ২য় সূত্রে এই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন: 'যোগ অর্থে চিত্তবৃত্তির নিরোধ' ও তারপর 'তখন দ্রষ্টা (আত্মা) স্বরূপে অবস্থান করেন'। তরবারি লৌহে (ইস্পাতে) তৈরী হয়, কিন্তু স্পর্শমণির সংস্পর্শে লোহার তরবারি সোনার তরবারিতে পরিণত হয়। তখন তরবারির আকার-মাত্র থাকে, কিন্তু সেই সোনার তরবারি দিয়ে আর জীবহিংসা হয় না। তেমনি যে সাধক ঈশ্বরকে দর্শন বা আত্মাকে উপলব্ধি ক'রে মন ও বুদ্ধির পারে উপনীত হন তিনি সাধারণ মানুষের মতো আর কাম-ক্রোধ-লোভাদির বশীভূত হন না, তিনি চিরমুক্তিময় জীবনই যাপন

করেন এবং স্বার্থের বাসনা ও কর্মের পরিবর্তে ফলকামনাহীন নিঃস্বার্থ জীবন নিয়ে লোককল্যাণময় কর্মের অনুষ্ঠান করেন। বেদান্তশাস্ত্রে জীবন্মুক্ত পুরুষের ঐ এক অবস্থার কথাই আলোচিত হয়েছে। 'জীবন্মুক্তিবিবেক', 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি' প্রভৃতি গ্রন্থে এবং 'তত্তু্ সমন্বয়াৎ' ব্রহ্মসূত্রের ১ম পাদ ৪র্থ সূত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর এবং আরও অনেক অদ্বৈতবেদান্তের অনুসারীরা জীবন্মুক্তি-অবস্থার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন, অজ্ঞানলেশ-রূপ শরীর থাকাকালে যাঁরা ব্রহ্মানুভূতি লাভ করেন তাঁরা সংসারে নিরাসক্তভাবে কর্ম করেন। কোন কর্মের ফল তাঁরা আকাঙ্ক্ষা করেন না, কামক্রোধাদি রিপু তাঁদের কখনও কোনদিন স্পর্শ করে না, নিরাসক্তি ও ঈশ্বরার্পণবুদ্ধি নিয়ে তাঁরা ঝড়ের এঁটো পাতার মতো সংসারে থাকেন ও সকল কর্ম করেন। তাঁদের শরীর থাকলেও তারা অশরীরী। জড়শরীরের মোহ ও আসক্তি আর তাঁদের স্পর্শ করে না। সেই সকল জীবন্মুক্ত পুরুষ সর্বদাই ব্রহ্মচৈতন্যের সঙ্গে নিজেদের এক ও অভিন্ন জ্ঞান করেন। অথবা তাঁরা 'আমি তাঁর দাস ও যন্ত্র', 'আমি তাঁর সন্তান, আমি যন্ত্র ও তিনি (ঈশ্বর) যন্ত্রী' প্রভৃতি ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভক্তির ক্ষেত্রে যাঁরা যথার্থ ভক্ত, কর্মের ক্ষেত্রে যাঁরা যথার্থ নিষ্কাম-কর্মী, জ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁরা যথার্থ আত্মজ্ঞানী—তাঁদের অবস্থা একই রকমের। অদ্বৈতসাধনায় ব্রহ্মানুভূতির পর শ্রীরামকৃষ্ণদেবও লোককল্যাণ করার জন্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন। বলেছিলেন : 'মা' আমায় রসে-বশে রাখিস', আমার সন্তানভাব', 'মা (শ্রীশ্রীভবতারিণী) আছেন আর আমি আছি' প্রভৃতি এটি ভাবমুখের অবস্থা। তাঁর দিব্যজীবনচর্য্যায়ও দেখি, তিনি বলতেন—'ইচ্ছাময়ী মা যা করেন' প্রভৃতি। এটি ঈশ্বরের বা জগন্মাতা মহামায়ার উপর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরণাগতির ভাব। এ অবস্থাকে দর্শনশাস্ত্র পোড়াদড়ীর কিংবা কুলালচক্রের (যে চক্রের সাহায্যে কুম্ভকাররা মাটির পাত্রাদি তৈরী করে) সঙ্গে, অথবা ঝরাপাতা বা এঁটোপাতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। পোড়াদড়ীর আকার দড়ীর মতোই থাকে, কিন্তু তা দিয়ে আর কোন-কিছুকে বাঁধা যায় না। অর্থাৎ পোড়াদড়ির আর বন্ধনশক্তি থাকে না। কুলালচক্রের সাহায্যে মাটির বাসনপত্র তৈরী হ'য়ে গেলেও কুলালচক্র কিছুক্ষণের জন্য ঘুরতে থাকে। ঝরাপাতা মাটিতে পড়ে থাকে, বাতাস তাকে এদিকে সেদিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। কিংবা 'এঁটো পাতা' অর্থে লোকে যখন

কলাপাতা বা শালপাতায় খেয়ে সেটি ফেলে দেয় তখন তা ঝড়ের মুখে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উড়ে যায়, তখন পাতার নিজের কোন গতি বা কর্তৃত্ব থাকে না। শাস্ত্রে জ্ঞানী-সম্বন্ধে এ'রকমও বলা হয়েছে যে, জ্ঞানী যদি ব্রহ্মহত্যাও করেন তাহলে পাপ তাঁকে স্পর্শ করে না। এ'ধরনের উক্তির নাম অর্থবাদ, বা জ্ঞানীর অবস্থার প্রশংসাসূচক বাক্য। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পরশমণির সংস্পর্শে তরবারির সোনা হবার উদাহরণ দিয়েছেন, আর দিয়েছেন নারিকেল গাছের শুষ্ক বেল্লোর ও সরল বালকের উপমা। তিনি বলেছেন:

"নারিকেলগাছের বেল্লো শুকিয়ে ঝরে পড়ে গেলে কেবল তার দাগ-মাত্র থাকে। সেই দাগে এইটি টের পাওয়া যায় যে, এককালে ঐখানে নারিকেলের বেল্লো (নারিকেল গাছের গোড়া) ছিল। সে রকম যার ঈশ্বর লাভ হয়েছে, তার অহংকারের দাগ-মাত্র থাকে, কাম-ক্রোধের আকারমাত্র থাকে ও বালকের অবস্থা হয়। বালকের সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণের মধ্যে কোন গুণের আঁট নাই। বালকের কোন জিনিসের উপর টান করতেও যতক্ষণ, তাকে ছাড়তেও ততক্ষণ। একখানা পাঁচ টাকার কাপড় তুমি আধ-পয়সার পুতুল দিয়ে ভুলিয়ে নিতে পার। * * বালকের আবার সবাই সমান—ইনি বড়, উনি ছোট, এরূপ বোধ নাই। তাই জাতিবিচার নাই। মা বলে দিয়েছে, 'ও তোর দাদা হয়', সে ছুঁতোর হ'লেও একপাতে বসে খাবে। বালকের ঘৃণা নাই, শুচি-অশুচি-বোধ নাই।" জীবন্মুক্ত পুরুষের অবস্থাও তাই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই গল্পের মধ্যে ঈশ্বরে নিবেদিত মন-প্রাণ ও শরণাগত ভক্ত ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত জ্ঞানী ও এই দু'জনের অবস্থার কথাই বলেছেন। যথার্থ ভক্ত ও যথার্থ জ্ঞানীর জাতিবিচারের ও শুচি-অশুচির জ্ঞান থাকে না, কেননা তাদের কাছে সকলেই ঈশ্বরের সন্তান কিংবা ব্রহ্মের রূপ—'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব'। বৃহদারণ্যক-উপনিষদে আছে, 'সগুণ-ব্রহ্ম বিশ্ব সৃষ্টি করে বিশ্বচরাচরের মধ্যে প্রবেশ করেন' বলতে ব্রহ্ম সৃষ্টি ক'রে বিশ্বচরাচরের রূপ ধারণ করেন। তাই দিব্যচক্ষুষ্মান স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,' অর্থাৎ সকল মানুষ, জীবজন্তু ও বস্তুই ভগবানের দিব্যপ্রকাশ। এই দিব্যানুভূতি লাভ করা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু ইচ্ছা করলে মানুষ দিব্যজ্ঞান লাভ করতে পারে।

সাধারণ লোক কারা ? যারা ভুলজ্ঞানে ডুবে থাকে ও বিষয়বুদ্ধি নিয়ে বাস করে তারা সাধারণ লোক। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "বিষয়বুদ্ধির লেশ-মাত্র থাকলে তাঁর (ঈশ্বরের) দর্শন হয় না। দেশালয়ের কাঠি যদি ভিজে থাকে, (তাকে) হাজার ঘসো, কোন রকমেই জলবে না * *। বিষয়াসক্ত মন ভিজে দেশালাই।" এখানে বিষয় বুদ্ধি বলতে কামনা-বাসনাযুক্ত বুদ্ধি ও স্বার্থ—দৃষ্টি। বেদান্তদর্শনে আছে, ব্রহ্মই একমাত্র বিষয় বা বস্তু, আর সমস্তই অবিষয় বা অবস্তু। ব্রহ্মবস্তুর জ্ঞানেই সংসারবন্ধন দূর ও পরমমুক্তি লাভ হয়, আর জড়বিষয়বস্তুর জ্ঞানে বন্ধন ও অসীম দুঃখ। যোগবাশিষ্ট-রামায়ণে বাসনাহীনতাকে 'মুক্তি' বলা হয়েছে, কেননা বাসনাই (ভোগের বাসনাই) বন্ধনের পর বন্ধন স্বষ্টি করে, আর নির্বাসনা মুক্তির আশীর্বাদ দান করে। কিন্তু সকল মানুষই চায় বন্ধন দূর ক'রে মুক্তি লাভ করতে, কারণ বাসনাহীন মুক্ত মানুষই একমাত্র শাশ্বত আনন্দলাভের অধিকারী। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, এই শাশ্বত আনন্দভোগর অধিকারী হতে গেলে 'অহং-অভিমান' বা 'আমি কর্তা' এই স্বার্থের অহংজ্ঞান ত্যাগ করতে হয়। অহংকারই মায়া; অহংকারই আবরণ ও বন্ধন। তাই যতক্ষণ-পর্যন্ত না ঈশ্বরদর্শন ক'রে মানুষ নিজেকে অকর্তা ও ঈশ্বরের দাস ব'লে মনে করে, ততক্ষণ ঈশ্বর দর্শন হয় না; আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "যে নিজে কর্তা হ'য়ে বসেছে, তার হৃদয় মধ্যে ঈশ্বর সহজে আসেন না"; "তাই হৃদয় মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালতে হয়।" জ্ঞানের আলো জ্বালা ও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে অকর্তা ভাবা একই কথা। কর্তৃত্বের অভিমানই 'কাঁচা আমি', আর অকর্তার অভিমান 'পাকা-আমি'। শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব 'পাকা আমি'-রূপ জ্ঞানদীপ জেলে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখতে বলেছেন: "জ্ঞানদীপ জেলে ঘরে, ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না'। ব্রহ্মময়ীই কালী বা শক্তিই ব্রহ্ম। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্বৈতানুভূতিতে ব্রহ্ম ও শক্তি এক ও অভিন্ন, কেবল নামে ও প্রকাশে ভিন্ন, কিন্তু স্বরূপে এক ঊনবিংশ বিংশ শতকের ধর্মসাধনার এটি একটি বিশিষ্ট অনুভূতি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব-প্রচারিত ধর্মে, সাধনায় এ অনুভূতিই সুস্পষ্ট।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

॥ সচ্চিদানন্দই গুরু ও মুক্তিদাতা ॥

"শ্রীরামকৃষ্ণ। 'মানুষের কি সাধ্য অপরকে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত করে। যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া, তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন। সচ্চিদানন্দ-গুরু বই আর গতি নাই। যারা ঈশ্বর লাভ করে নাই, যারা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান হয় নাই, তাদের কি সাধ্য জীবের ভববন্ধন মোচন করে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ (১৩৬৬), পৃঃ ৯৩

গুরু কে ও গুরু বল্‌তে সত্যকারভাবে কি বুঝায় সে সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। গুরুর ধ্যানমন্ত্রে আছে,

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞান মূর্তি।

আবার প্রণামমন্ত্রে আছে,

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, সচ্চিদানন্দই গুরু এবং সে জ্ঞানমূর্তি গুরুই একমাত্র সংসারবন্ধন দূর ক'রে মুক্তি ও শান্তি দিতে পারেন। সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ যিনি, তিনি সচ্চিদানন্দ। 'সৎ' কিনা যিনি সর্বত্র সর্বকালে থাকেন। তাই সৎ ও শাশ্বত সত্তা একই। সৎ বা সত্তা চিরদিন থাকলেও যদি তাঁর প্রকাশ না থাকে তাহলে তিনি আছেন—কি নাই লোকে তা বুঝতে পারে না, সুতরাং তিনি সর্বকালে থাকলেও তার প্রকাশ চাই ও তবেই তাঁর অনুভব হয়। সৎ বা সত্তার প্রকাশের নাম 'চিৎ'। প্রকাশ থাকে ব'লে সৎ-এর

অনুভব হয়—যেমন আলোক বস্তু হিসাবে থাকলেও তার প্রকাশ না থাকলে তার থাকার কোন সার্থকতা নেই আলোকের প্রয়োজন অন্ধকারের মধ্যে কোন বস্তু বা পদার্থকে জানার জন্য। 'চিৎ'-এর আর এক নাম সম্বিদ্‌ বা 'জ্ঞান'—যা অজানা বস্তুকে জানায়। জ্ঞান আলোকস্বরূপ বা প্রকাশ। অজানা কোন বিষয় জানা হ'লে তবেই তার প্রকাশ ও জ্ঞান হয় ও সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ হয়। ভারতীয় দার্শনিকরা তাই সৎ (সত্তা), চিৎ (প্রকাশ) ও আনন্দকে (আত্মপ্রসাদকে) শুধুই পরস্পরসম্পর্কযুক্ত বলেন নি, বলেছেন তারা এক ও অভিন্ন। অথবা তারা একেরই তিনটি প্রকাশ অবস্থা-অনুসারে, যেমন—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এক প্রকৃতিরই তিন গুণ; যেমন—এক অন্তঃকরণেরই মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার চারটি বৃত্তি। সৎ, চিৎ ও আনন্দের অপর নাম অস্তি, ভাতি, প্রিয়। অস্তি বা অস্তিত্ব থাকলে তার প্রকাশ হয়, আর প্রকাশ হলে তা প্রিয় বা আদরণীয় হয়। তাই প্রিয়ই আনন্দ।

মোটকথা যা আছে ও চিরদিন থাকে (সত্তাবান) তাকেই 'সৎ' বলে। সতেরই প্রকাশ ও প্রত্যক্ষ হয়, আর প্রকাশ ও প্রত্যক্ষ হ'লে মনের প্রসাদ বা আনন্দ হয়। সুতরাং সৎ, চিৎ ও আনন্দ তিনটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তারা এক আত্মারই অবস্থাভেদে তিনটি প্রকাশ। বেদান্ত বলে, ঈশ্বর একমাত্র সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তিনি সর্বকালে ও সর্বত্র আছেন। তিনি বিশ্বের সকল বস্তুকে প্রকাশ করেন ও অন্তরে আনন্দ দেন। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহস্বরূপ ঈশ্বরকে (আত্মচৈতন্যকে) যখন আমরা প্রাণের প্রাণ ও একান্ত আপনার জন বলে উপলব্ধি করি তখনই অপার্থিব এক আনন্দের অনুভূতি হয়। এই আনন্দকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তাই অব্যক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, সচ্চিদানন্দই গুরু: "সচ্চিদানন্দই বই আর গতি নাই।" গুরু তিনি—যিনি অজ্ঞান-অন্ধকার দূর ক'রে মহামুক্তিরূপ জ্ঞান দান করেন। গুরুর প্রণামমন্ত্রের তাই বলা হয়েছে: 'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া, চক্ষুরুন্মিলিতং যেন',—যিনি চক্ষে জ্ঞানরূপ অঞ্জন পরিয়ে অজ্ঞান অন্ধকার দূর করেন তিনিই গুরু। ইষ্ট বা অভিপ্রেত দেবতাই গুরু। আবার গুরু ও ইষ্ট (ইষ্টদেবতা) এক ও অভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, গুরু যিনি, ইষ্টও তিনি। ইষ্ট কিনা ইপ্সিত বা অভিপ্রেত দেবতা। তিনি কল্যাণকারী ব'লে ইষ্ট। তিনি সকল অনিষ্ট দূর করেন ব'লে ইষ্ট। আবার

গুরুই ঈশ্বর। গুরুই শক্তির প্রতিমূর্তি কিনা গুরুই আদ্যাশক্তি মহামায়া। শক্তিরই হয় অবতার। সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ শিবই নিজেকে শক্তিরূপে প্রকাশ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, কালী (শক্তি) ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। শক্তি ঈশ্বরের (ব্রহ্মের) ব'লে তিনি (ঈশ্বর বা ব্রহ্ম) শক্তির ঐশ্বর্যরূপ খেলার অবসান ঘটাতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া, তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন।" বেদান্ত বলে: 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরঃ'। ভুবনমোহিনী মায়া বা আদ্যাশক্তিই প্রকৃতি, আর মায়া যার অধীনে, বা যাঁর করতলগত, তিনি মায়িন্—মহেশ্বর।

আচার্য শঙ্করও বলেছেন: 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়ীনন্তু মহেশ্বরঃ।' মায়া পরমেশশক্তি, আর মায়াধিপতি ঈশ্বর। ঈশ্বর নিজের মায়ার দ্বারা নিজেই আবৃত হন—'স্বগুণৈঃ নিগূঢ়াম্'। ঈশ্বর মায়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত, আবার অসম্পৃক্ত ও অধীশ্বর। বিভিন্ন পুরাণে এই ভাবটিকে বুঝানোর জন্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, স্বয়ং লক্ষ্মী (প্রকৃতি) কারণসলিলে শায়িত নারায়ণের পদসেবা করছেন। বেদান্ত বলে, ব্রহ্ম বৃহৎ কিনা ব্যাপকচৈতন্য—'ব্যাপকত্বাদ্ ব্রহ্ম'। একই ব্রহ্মচৈতন্যের দুটি রূপ কল্পনা করা হয়েছে—সগুণ ও নির্গুণ, সশক্তিক ও নিঃশক্তিক। শক্তিই গুণ, শক্তিই কলা, শক্তিই মায়া, শক্তিই স-কল ও নিষ্কলরূপে এক ও অখণ্ড চৈতন্যকে দুটি রূপে প্রকাশ করে। শক্তিসহকৃত ঈশ্বরের সৃষ্টি করার কর্তৃত্ব থাকে। সৃষ্টির বীজ জীবসংস্কার। সমগ্র প্রাণী ও বস্তুর কারণসংস্কার বীজরূপী প্রকৃতি বা মায়া। প্রকৃতি বা মায়াকে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব বলেছেন 'ন্যাতাকাতার হাঁড়ি'। বৃদ্ধারা (বুড়িরা) যেমন একটি হাঁড়িতে লাউ-বিচি, শশা-বিচি, কুমড়া-বিচি প্রভৃতি গাছের বীজ রেখে দেয় ও সময় হলে সেগুলি মাটিতে পুতে দিলে তা থেকে অঙ্কুর হয়, গাছ হয়, তেমনি কারণসংস্কাররূপ সমষ্টি অজ্ঞান মায়া বা মহামায়া—যিনি ঈশ্বরের সহচারিণী, ও যা থেকে বিশ্ব সৃষ্টি হয়। ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি তখনই সার্থক হয় যখন জীব-জগতের ঐ কারণসংস্কার ব্যক্ত বা প্রকাশিত হয়। বিশ্বসংসার তখনই সৃষ্টি হয়। অদ্বৈতবেদান্তে ঈশ্বর (সগুণ) তাই সৃষ্টির কারণ—নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ। ন্যায়-বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনের দৃষ্টিতে ঈশ্বর নিমিত্তকারণ ও অজ্ঞান বা সংস্কার-বীজ উপাদানকারণ। সৃষ্টির বীজ যখন পরমচৈতন্যে

কারণাকারে থাকে তখন তাকে 'অব্যক্ত' বলে। ঈশ্বরের আর এক নাম তাই অব্যক্ত বা অব্যাকৃত—'তাহি অব্যাকৃতমাসীৎ'। সৃষ্টি বাস্তবরূপে প্রকাশিত (ব্যক্ত) হবার পূর্বে অব্যাকৃত (অব্যক্ত) থাকে। সংস্কারবীজ ব্যক্ত হয় হিরণ্য-গর্ভচৈতন্যে। হিরণ্যগর্ভ কিনা গলিতস্বর্ণাভাযুক্ত চৈতন্যসত্তা। প্রভাতকালীন সূর্যের বর্ণ যেমন তপ্তকাঞ্চনতুল্য, হিরণ্যগর্ভব্রহ্মার বর্ণও তেমনি। এটিই সৃষ্টির প্রাক্‌কাল। অব্যক্তরূপ রাত্রি বা মৃত্যুর অন্ধকারকে দূর ক'রে জীবনস্পন্দনরূপ প্রাণের সম্প্রসারণ হয় সৃষ্টির প্রভাতে। প্রজাপতি-ব্রহ্মাই সৃষ্টির প্রথম প্রজা। তার চতুর্মুখ চারদিক বা দশদিকের প্রকাশক। দশদিক কিনা বিশ্বচরাচর। বিশ্বচরাচরের প্রতীকই প্রজাপতি-ব্রহ্মা—যিনি হিরণ্যগর্ভ-চৈতন্য।

সারদাতিলকতন্ত্রে ও বায়বীয়সংহিতায় বিশ্বসৃষ্টিসম্বন্ধে বলা হয়েছে, সচ্চিদানন্দরূপ পরমেশ্বর থেকে প্রথমে শক্তি, পরে নাদ ও বিন্দুর বিকাশ, সুতরাং শক্তি-নাদ-কলাত্মক পরমেশ্বরই (সদাশিব বা মহাকাল) সচ্চিদানন্দ-গুরু। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। সচ্চিদানন্দময় ও সচ্চিদানন্দময়ী। শক্তি জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়াময়ী। ভক্তিশাস্ত্রে সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি-তিনটির সমন্বিত রূপ হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধা—যিনি প্রেমা-ভক্তির চরমবিকাশ। তন্ত্রশাস্ত্রে সকল শক্তির সমষ্টি 'শক্তিতত্ত্ব' বা আনন্দ-শক্তি। শক্তির ক্রিয়াবস্থা নাদ ও নিষ্ক্রিয়াবস্থা কলা। আবার কলার বহির্বিকাশই শক্তি বা শক্তিতত্ত্ব ও অন্তর্বিকাশ শিব বা শিবতত্ত্ব।

তন্ত্রে বিন্দুকে (পরাবিন্দুকে) গুরু, কিংবা বিন্দুকে গুরুর প্রতিষ্ঠা (আসন) বলা হয়েছে। গুরুমূর্তি অর্ধনারীশ্বররূপে বিন্দুতে অধিষ্ঠিত ও প্রকাশিত, সুতরাং গুরুমূর্তি শিব-শক্তির মিথুনাত্মক রূপ-যাকে সামরস্য বলে। চরকাকারে অবস্থিত পরমকারণ শিব-শক্তির অখণ্ড রূপের উপলব্ধি কিংবা রূপের সঙ্গে মিলনই সামরস্য।

নাদ বা মহানাদই প্রণব বা ওঙ্কার। প্রণবকে বিশ্লেষণ করলে পাই অ + উ + ম + চন্দ্র (সোমকলা) + বিন্দু এই পাঁচটি অক্ষর বা অক্ষরকলা। চন্দ্র ও বিন্দু (ঁ) শক্তি ও শিব—প্রকৃতি ও পুরুষ। চন্দ্র ও বিন্দু-রূপী শক্তি-শিব থেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র-রূপী মহেশ্বরের (অ + উ + ম) বিকাশ। গুরু সচ্চিদানন্দরূপী পরমচৈতন্য। তিনি শক্তিপীঠ চন্দ্রকলায় আসীন থাকেন। কলারই প্রকাশ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র। অর্থাৎ কলাই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপী

বিশ্বচরাচরকে প্রকাশ করে। পদ্মপাদাচার্য তাঁর 'বিজ্ঞানদীপিকা'-গ্রন্থের ২য় শ্লোকে ত্রিমাবিশিষ্ট (অ + উ + ম) ওঙ্কারের উল্লেখ করেছেন এবং 'বিবৃতি'-তে ত্রিমাত্রার বিশ্লেষণ করেছেন সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের ('সচ্চিদানন্দরূপিনঃ')। সত্তাকে পূর্ণরূপে অটুট রেখে। বিজ্ঞানদীপিকার ২য় শ্লোক—

বাচে ব্রহ্মস্বরূপায়ৈ পঞ্চাশদ্বর্ণভেদতঃ।
অনেকরূপমাপ্তায়ৈ নমো মাত্রে ত্রিমূর্তয়ে ॥

'বিবৃতি'-ভাষ্যে বলা হয়েছে: "ত্রিমূর্তয়ে ত্রয়োকারোকারমকারা মূর্তয়ো যস্যাঃ, তদধিষ্ঠাতারো হরিহর-বিধাতারো বা মূর্তয়ো যস্যাঃ, সত্ত্বরজস্তমোগুণা বা মূর্তয়ো উপাধয়ো যস্যাঃ তস্যৈ। যদ্বা ত্রিস্রো ভূরাদ্যা (ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ) ব্যাহৃতয়ো বহ্নিসূর্যসোমকলা বা মূর্তয়োর্যস্যাঃ, ত্রীনি পদানি যস্যাং গায়ত্র্যাং যা মূর্তিযশ্যাঃ * * সন্ধ্যাস্তদধিষ্ঠাত্রো গায়ত্রী-সাবিত্রী-সরস্বত্যো বা মূর্তয়ো যস্যাঃ * * প্রজ্ঞাতৈজসবিশ্ব—মহেশ্বরহিরণ্যগর্ভবৈশ্বানরা বা মূর্তয়ো যস্যাঃ * * বিবিধাকৃত্যা প্রতীয়মানস্যাপি ব্রহ্মণঃ কূটস্থস্বরূপত্বাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপত্বং ন হীয়ত ইতি ভাব"।

বিদগ্ধ অদ্বৈতবেদান্তী মধুসূদন সরস্বতী 'ভক্তিরসায়ণ'-গ্রন্থের তৃতীয় উল্লাসের ২২-২৪ শ্লোক সচ্চিদানন্দস্বরূপ গুরুকে (আত্মাকে) 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর'-রূপ প্রত্যক্ষরসানুভূতি ব'লে বর্ণনা করেছেন। তিনি ৩।২৪ শ্লোকে বলেছেন: 'পরমানন্দ আত্মৈবরস ইত্যাহুরাগমাঃ' এবং এই রস 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরমিত্যাচক্ষতে'। সচ্চিদান্দ-রূপী গুরু অবরোহণক্রমে কারণ থেকে সূক্ষ্মে ও সূক্ষ্ম থেকে স্থূল রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। আমরা ধ্যান করি গুরুকে আজ্ঞাচক্রের ভিতরে দ্বাদশদলবিশিষ্ট গুরুপদ্মে। তিনি শ্বেতবর্ণ বলতে শুদ্ধসত্ত্বগুণের প্রকাশ। প্রথমে স্থূলমূর্তিতে, পরে সূক্ষ্মমূর্তিতে ও পরিশেষে কারণ বা মহাকারণরূপ চিন্মাত্র-সত্তায় মনকে লয় ক'রে শ্রীগুরুর ধ্যান করতে হয়। এ গুরু চিন্ময় বা জ্ঞানময় গুরু। গুরু ব্রহ্ম, এ গুরু মনুষ্যগুরু নন। মনুষ্যগুরু ঐ সচ্চিদানন্দ গুরুকে দেখিয়ে দেন। মনোলয়ের পর সাধক একীভূত হয় শ্রীগুরুমূর্তির সঙ্গে। মনোলয়ে মন চিৎসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয় সেই চিৎসত্তা চিন্মাত্র শ্রীগুরুতে একীভূত হয়।[১] এটি ধ্যানতত্ত্বের রহস্য বা মর্মকথা। ধ্যানসিদ্ধ না হ'লে এই তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় না।

১। তন্ত্রসাহিত্যে নাদ, শক্তি, বীজ, কলা, বিন্দু প্রভৃতির অর্থ ভিন্নভাবেও করা হয়েছে।

এ তত্ত্বটিকে আরও পরিষ্কার ক'রে অন্যভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখি, প্রতীকই পরমতত্ত্বের প্রকাশক। প্রতীক Sign বা Symbol। ঋষি পতঞ্জলি যোগদর্শনে বাক্য-মনের অতীত পুরুষবিশেষ ঈশ্বরকে প্রকাশ করার জন্য ওঙ্কারের উল্লেখ করেছেন। ওঙ্কার বা প্রণব—'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ'। প্রণব নিগুর্ণ-ব্রহ্মের প্রকাশক ব'লে প্রণবকে সগুণ-ব্রহ্ম বলে। 'প্রণব' বা 'ওম্' (ওঙ্কার) এই পরমশব্দটিকে (স্ফোটকে) বিশ্লেষণ করলে পাই ওঁ—অ, উ, ম, চন্দ্র বা সোমকলা ও বিন্দু সেকথা বলেছি। চন্দ্রকলা যা অর্ধচন্দ্রকে 'নাদ'-রূপে কল্পনা করা হয়। নাদ পরাশক্তি প্রকৃতি—নিগুর্ণ-চৈতন্যের প্রকাশক। চন্দ্রকলার উপরে বিন্দু পুরুষ, শিব বা নিগুর্ণ-ব্রহ্ম। তন্ত্রে অমাকলা (চন্দ্র-কলা) ও বিন্দু প্রকৃতি ও পুরুষ—বিমর্শশক্তি ও শিব। শিব-শক্তির অখণ্ড মিথুন রূপই তন্ত্রে নিগুর্ণ-ব্রহ্ম। গুরুগীতায় (৩২শ শ্লোক) এ তত্ত্বটির পরিচয় দেওয়া হয়েছে একটু ভিন্ন ভাবে—

চৈতন্যঃ শাশ্বতং শান্তো ব্যোমাতীতো নিরঞ্জনঃ।
বিন্দুনাদকলাতীতস্তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

এখানে বিন্দু পরাশক্তি কুণ্ডলিনী। নাদ অর্থে পরাবাক প্রণব ও কলা অর্থে শক্তি ও সদাশিব প্রভৃতি তত্ত্বের আধার। গুরু এ সকলের অতীত। তিনি অঞ্জন বা মায়ালেশশূন্য নিরঞ্জন বিশুদ্ধচৈতন্য। তিনি 'দ্বন্দ্বাতীতং গগন-সদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্'। অদ্বৈতবেদান্তে বিন্দু ব্রহ্ম ও স্বরূপচৈতন্য। আবার বিন্দু অর্থে কুণ্ডলিনীশক্তি (তেজস্)। চন্দ্রকলা বা অর্ধচন্দ্র ও বিন্দুকে বিশ্বের বহু সভ্যজাতি প্রতীক রূপে ব্যবহার করে। ইজিপ্টবাসী ও মুসলমানদের ক্রেসেন্ট—চন্দ্র ও বিন্দু (৺) প্রতীকবিশেষ। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এ প্রসঙ্গে *Path of Realization*-গ্রন্থে (পৃঃ ৫৮) বলেছেন : The crescent moon was the symbol of Isis (in Egypt) and emblematic of the Hindu **Yoni**, the productive power of the mother nature. This crescent has now become the symbol of the Mohammedans ; it is placed on the top of mosques and tombs as well as on the banner of the Mohammedans. The five-pointed stars which they place on the top of the crescent, is the Pentacle. This is symbolical of Purusha, the male principle" ; অর্থাৎ ক্রেসেন্ট বা

অর্ধবৃত্তাকার চন্দ্র (সোমকলা) ইজিপ্টবাসীদের দেবী আইসিসের প্রতীক। চন্দ্রই হিন্দুদের সৃষ্টিকারিণী শক্তি। এই সৃষ্টিশক্তির অপর নাম প্রকৃতি বা মহাপ্রকৃতি। ইজিপ্টবাসী ও হিন্দুদের চন্দ্রকলাই মুসলমানদের ক্রেসেন্ট বা প্রতীক। এই প্রতীক মুসলমানদের মসজিদের ও সমাধিস্থানের (কবরের) শীর্ষদেশে স্থাপিত। মুসলমানদের জাতীয় পতাকায় ও অর্ধচন্দ্রের সঙ্গে বিন্দুর সমাবেশ দেখা যায়। অর্ধচন্দ্রের উপর বিন্দু পাঁচটি কোনবিশিষ্ট। এর নাম পেন্টাকেল বা পঞ্চমুখী প্রতীক। বিন্দু পুরুষ ও অর্ধচন্দ্র শক্তি।[২]

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, এক ও অখণ্ড চৈতন্যের দ্বন্দ্বপ্রকাশই সগুণ ও ও নির্গুণ-ব্রহ্ম। সচ্চিদানন্দ গুরু সগুণ, আবার নির্গুণ। সগুণে তাঁর প্রকাশ ও লীলা আর নির্গুণ তিনি স্বরূপ ও নিত্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টিতে যিনি নিত্য তাঁরই লীলা। লীলার সগুণ রূপকেই সচ্চিদানন্দ গুরুরূপে চিন্তা করা হয়। তাতে অস্তি-ভাতিপ্রিয়রূপ গুরুকে চিন্তা করার সুবিধা হয়। সাধারণত আজ্ঞাচক্রের (ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থানে) মধ্যে গুরুচক্রে দ্বাদশদলপদ্মের কল্পনা করা হয়। সেই দ্বাদশদলপদ্মে শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান শ্বেতবর্ণের জ্ঞানময় গুরুকে ধ্যান (চিন্তা) করা হয় সে কথা বলছি। গুরুচক্রে জ্ঞানময় ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ গুরুই ইষ্ট বা ইষ্টদেবতা। ভিন্ন ভিন্ন দেবতা ইষ্ট রূপে কল্পিত হলেও একমাত্র শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান ঈশ্বর বা আত্মাই ইষ্ট—যিনি অভিপ্রেত দেবতা। মানুষ অজ্ঞানের মধ্যে থাকলেও চায় বন্ধনমুক্তি ও জ্ঞান। একমাত্র আত্মজ্ঞানই মানুষকে অজ্ঞানের পারে নিয়ে যেতে পারে। অজ্ঞানের পারে যাওয়ার অর্থ সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ বা সৎ-চিৎ-আনন্দের প্রতিষ্ঠা (অধিষ্ঠান) ব্রহ্মচৈতন্যকে উপলব্ধি করা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "যাঁর এই ভুবন-মোহিনী মায়া তিনিই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন।" সৎ-চিৎ-আনন্দময় গুরু, বা সৎ-চিৎ-আনন্দের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ জ্ঞানময় গুরুরূপী আত্মার উপলব্ধিতে অজ্ঞানের আবরণ দূর হয় ও তখনই মুক্তি, তখনই চিরপ্রশান্তি।

ভুবনমোহিনী অঘটনঘটনপটিয়সী মায়াই আত্মজ্ঞানরূপ মণিকোঠার দ্বার রুদ্ধ করে। এই রুদ্ধ করার পিছনে একটি তাত্ত্বিক রহস্য লুকোনো

২। এ সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ: Path of Realization এবং Word and Cross in Ancient India দ্রষ্টব্য।

রয়েছে। আদ্যাশক্তিরূপিণী মহামায়া জ্ঞানের দ্বার আবৃত করেন জীবের সুখ-দুঃখময় সৃষ্টির খেলাকে সচল ও সার্থক করার জন্য। সৃষ্টির খেলাকে না জানলে স্রষ্টাকে জানা যায় না। এখানে স্রষ্টার অর্থ ঈশ্বর। মায়ালেশহীন ব্রহ্মেও মায়ার মালিন্য কল্পনা করা হয় সৃষ্টির দিক থেকে। মায়াকে আশ্রয় ক'রেই ঈশ্বর সৃষ্টির বীজ রোপণ করেন ও সেই বীজ প্রকাশিত হ'লে তাকে নিয়ে আনন্দময় লীলা করেন ঈশ্বর। অবতারগণের জীবনরহস্যও তাই। চিরমুক্তিময় জীবন নিয়েই অজ্ঞানরূপ বন্ধনকে গ্রহণ করেন তাঁরা সচ্ছন্দ লীলাখেলার (sportive play) জন্য এবং এ লীলার শেষেই ঈশ্বর ও অবতারগণ নিত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।" ভুবনমোহিনী মায়া শক্তিরূপে সৃষ্টিময় বিশ্বে লীলা করেন ও জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশিত হ'লে মায়া তিরোহিত হয় বলতে মায়া চৈতন্যে রূপান্তরিত হয়। তখনই প্রসন্নোজ্জ্বল জ্ঞানমূর্তি গুরুর দর্শন ও উপলব্ধি হয় এবং জীবন কৃতকৃতার্থ হয়। আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের অধ্যাসভাষ্যে তাই মায়াকে বলেছেন অধ্যাস বা মিথ্যাজ্ঞান। মিথ্যা-জ্ঞানকে দূর করে সত্যজ্ঞান। সত্যজ্ঞানের প্রকাশ শ্রীগুরু—যিনি বিশুদ্ধচৈতন্য। মনুষ্যগুরু ঐ চৈতন্যের প্রতীক ও প্রতিনিধি।

আত্মজ্ঞানবিদ্ মানুষই যথার্থ গুরু। তিনিই শিষ্যের অজ্ঞান-অন্ধকাররূপ মিথ্যাজ্ঞান (ভ্রম) দূর করতে পারেন, অজ্ঞানী মানুষ তা পারে না। শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব তাই বলেছেন : "যারা ঈশ্বরলাভ করে নাই, যারা তাঁর (ঈশ্বরের) আদেশ পায় নাই, যারা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান হয় নাই, তাঁদের কি সাধ্য জীবের ভববন্ধন মোচন করে।"

ভববন্ধনই মোহাসক্তি, বাসনাজাল, অজ্ঞান বা অবিদ্যা। 'ভব' বলতে ক্ষয়শীল বিশ্বসংসার—যা আজ আছে কাল নাই—অনিত্য। আবার 'ভব' বলতে কর্মফলকে বোঝায়। গীতায় ও কঠোপনিষদে অনিত্য সংসারকে 'অশ্বত্থ' বলা হয়েছে। সঞ্চরণশীল বা চলমান বলেই সংসার অশ্বত্থ, কিন্তু অজ্ঞানী মানুষ চলমান সংসারকেই নিত্য ও স্থির মনে করে। জ্ঞানীরা বলেন যে, এই মনে করাটাই ভ্রম বা মিথ্যাজ্ঞান—যা সত্যজ্ঞানকে আবৃত করে। তখনই (ভ্রমেই) সংসার হয় গ্রন্থি বা বন্ধনের তুল্য। গ্রন্থি বা বন্ধন বাসনা-কামনার আসক্তি। কামনাই স্বার্থের সংসারে মানুষকে রজ্জু দিয়ে বেঁধে রাখে। তখন বিবেক-বুদ্ধি প্রকাশিত থাকলেও তার আলোক নিষ্প্রভ থাকে।

এর জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব সদ্‌গুরুর কথা বলেছেন। সাধক কবিরও বলেছেন —'সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে'।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "যদি সদ্‌গুরু হয় তাহলে জীবের অহংকার (মায়া বা অজ্ঞানবন্ধন) তিন ডাকে যাবে।" এ'সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজের একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গটি হোল—

"আমি একদিন পঞ্চবটীর কাছ দিয়ে ঝাউতলায় যাচ্ছিলাম। শুনে গেলাম যে, একটা কোলা-ব্যাঙ খুব ডাক্‌ছে। বোধ হোল সাপে ধরেছে। অনেকক্ষণ পরে যখন ফিরে আসছি তখনও দেখি ব্যাঙটা খুব ডাকছে। এক বার উঁকি মেরে দেখলুম—কি হয়েছে। দেখি একটা ঢোঁড়ায় ব্যাঙটাকে ধরেছে; ছাড়তেও পাচ্ছে না, গিলতেও পাচ্ছে না, ব্যাঙটার যন্ত্রণা ঘুচছে না। তখন ভাবলাম, ওরে! যদি জাতসাপে ধরতো, তিন ডাকের পর ব্যাঙটা চুপ হ'য়ে যেত। একটা ঢোঁড়ায় ধরেছে কিনা, তাই সাপটারও যন্ত্রণা, ব্যাঙটারও যন্ত্রণা।"

এখানে ব্যাঙ শিষ্যের ও ঢোঁড়া-সাপ সাধারণ অজ্ঞানী গুরুর উদাহরণ। সাপের মধ্যে বিষযুক্ত জাতসাপ ব্রহ্মজ্ঞানী সদ্‌গুরু, আর বিষহীন ঢোঁড়া-সাপ অজ্ঞানী গুরু। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাতেই বলি: "যদি সদ্‌গুরু হয়, তাহলে জীবের (শিষ্যের) অহংকার (অজ্ঞানবন্ধন) তিন ডাকে ঘুচে (তৎক্ষণাৎ দূর হয়)। গুরু কাঁচা (অজ্ঞানী) হলে গুরুরও (অজ্ঞানী গুরুরও) যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা। তখন শিষ্যের অহংকার (অজ্ঞান বা মায়াবন্ধন) আর কাটে না। কাঁচা (অজ্ঞানী) গুরুর পাল্লায় পড়লে শিষ্য মুক্ত হয় না।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই উপদেশের সূচনা করেছেন এই ব'লে: "মানুষের (সাধারণ বা অজ্ঞানী মানুষের) কি সাধ্য অপরকে বন্ধন (সংসারবন্ধন) থেকে মুক্ত করে। * * তাদের কি সাধ্য জীবের ভববন্ধন মোচন করে।" জীবের ভববন্ধন অহং-অভিমান, অথবা ক্ষুদ্র-আমি-জ্ঞান বা স্বার্থপরতা। ক্ষুদ্র-'আমি'-জ্ঞানরূপ অজ্ঞানমেঘ সরে গেলে জ্ঞানসূর্যের প্রকাশ হয়। তখনই যথার্থ মুক্তি। সর্বজ্ঞাত্মমুনি এবং মণ্ডনমিশ্র এতে আপত্তি করেছেন, তাঁরা বিদেহমুক্তি স্বীকার করেছেন। মুক্তি কিনা আত্মোপলব্ধি।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ঈশ্বরীয় রূপ মানতে হয় ॥

"শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি) 'ঈশ্বরীয় রূপ মানতে হয়। জগদ্ধাত্রী-রূপের মানে জান? —যিনি জগৎকে ধারণ ক'রে আছেন। তিনি না ধরলে, তিনি না পালন করলে জগৎ পড়ে যায়, জগৎ নষ্ট হয়ে যায়। মন-করীকে যে বশ করতে পারে তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন।'

রাখাল। 'মন-মত্ত-করী'।

শ্রীরামকৃষ্ণ। 'সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতীকে জব্দ ক'রে রয়েছে'।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ১ম ভাগ (১৩৬৬), পৃঃ ১১৪

প্রসঙ্গটি আরম্ভ হয়েছে 'সমাধি-মন্দিরে'-পর্যায়ে। "শ্রীরামকৃষ্ণ অহর্নিশ সমাধিস্থ। দিনরাত কোথা দিয়া যাইতেছে! কেবল ভক্তদের সঙ্গে এক-একবার ঈশ্বরীয় কথা বা কীর্তন করেন। * * মা-র (শ্রীশ্রীভবতারিণীর) সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে একবার শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, 'মা, ওকে এককলা দিলি কেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব হাজরার প্রসঙ্গ শেষ ক'রে শ্রীম-র উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত কথা "ঈশ্বরীয় রূপ মানতে হয়" প্রভৃতি বলেছেন। ঈশ্বরীয় রূপের প্রসঙ্গে দেবী জগদ্ধাত্রীর রূপের আলোচনা তাৎপর্যপূর্ণ। ঈশ্বর—যিনি বিশ্বচরাচরের কর্তা, আর জগদ্ধাত্রী—যিনি বিশ্বচরাচরকে ধরে থাকেন। বিশ্বসংসারের প্রতিষ্ঠাই ঈশ্বর ও জগদ্ধাত্রী। সমাধির (অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বিকল্প-সমাধির) অবস্থা ছাড়া এ পরমতত্ত্বময়ী বিশ্বপালিনী জগদ্ধাত্রীর প্রসঙ্গ অর্থহীন। দেবী জগদ্ধাত্রী দুর্গারই অভিন্ন নাম ও রূপ। জগৎকে ধারণ করেন ও পরি-

পালন করেন দু'জনেই। দু'জনেই দুর্গতি নাশ ক'রে মুক্তি দেন। দুর্গতি হোল সংসারবন্ধন। দুই দেবীর বাহন বা প্রতীকও এক রকমের। দেবী দুর্গার বাহন মহিষাসুরমর্দনকারী সিংহ। প্রতীকের সাহায্যেই প্রতিমার স্বরূপ নির্ণিত হয়—যেমন সগুণ-ব্রহ্মরূপী প্রণব বা ওঙ্কারের সাহায্যে নির্গুণ-ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করা হয়—'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ'। সিংহবাহিনী দুর্গা ও সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী মধ্যাহ্ন-সূর্যের প্রতিচ্ছবি। দেবী দুর্গার পাশে যেমন প্রাতঃসূর্য—সরস্বতী ও সায়ংসূর্য—লক্ষ্মীর সমাবেশ থাকে, দেবী জগদ্ধাত্রীর তেমনটি নয়। জগদ্ধাত্রী একক, কিন্তু সাবিত্রীমন্ত্র গায়ত্রীর মতো তিন রূপের তিনি প্রকাশক। দেবীর সিংহ তেজঃ, বীর্য ও জ্ঞানের প্রকাশক। তেজঃ, বীর্য, জ্ঞান ছাড়া জ্ঞানময়ী দেবীর প্রখর ও প্রসন্নোজ্বল স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। কিন্তু এই বল কোন্ 'বল' (শক্তি)? তেজঃ বীর্য ও জ্ঞানই ঐ বল। সদসদ্-বিচাররূপ বিবেকশক্তিই ঐ বল। বিবেকশক্তিই জ্ঞানশক্তি—যা স্বরূপজ্ঞানকে প্রকাশ করে। সদসদ্‌বিচারের সাহায্যে আত্মার স্বরূপ নির্ধারিত হ'লে অপরোক্ষানুভূতির দ্বার উন্মুক্ত হয়। সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী ও সিংহবাহিনী দুর্গা বিশুদ্ধচৈতন্যরূপিণী। তাঁরা দু'জনেই শক্তি ও জ্ঞান দান করেন। আবার শক্তি ও জ্ঞানের তাঁরা স্বরূপ বা প্রতিচ্ছবি। জ্ঞানময়ী বা জ্ঞানরূপিণী বলেই দেবী অজ্ঞান-অসুররূপ মত্ত-মন-করীকে সংযত ও দমন করেন।

দেবী জগদ্ধাত্রীর বাহন (প্রতীক) যে সিংহ সেকথা বলেছি। বাহন সিংহ মন-রূপ অজ্ঞান-হস্তীকে দমন করছে। সিংহ জ্ঞান ও হস্তী অজ্ঞান। রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বলেছেন, করী বা হস্তী 'মন-মত্ত-করী'। 'মন-মত্ত-করী' শব্দগুলির মধ্যে একটি গভীর তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। মনের সাধারণ রূপ সংকল্প ও বিকল্প বৃত্তি—'সংকল্প-বিকল্পাত্মকঃ মনঃ'। মন স্বভাবতই চঞ্চল কিনা মত্ত। বিষয়াসক্ত মত্ত মন মানুষকে সংসারে আবদ্ধ করে। যোগবাশিষ্টে আছে : 'মর্কটো মদিরোন্মত্তঃ'। কঠ-উপনিষদে আছে : 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃনোৎ স্বয়ম্ভূ, পরাং পশ্যতি নান্তরাত্মন্'। মত্ত ও অসংস্কৃত মনই দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আত্মবুদ্ধি করায়। আচার্য শঙ্কর অধ্যাসভাষ্যে তমঃপ্রকাশবৎ বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন বলেছেন অধ্যাসকে। অধ্যাসই প্রকারন্তরে মন বা সংকল্প। অধ্যাস বা অজ্ঞান-আবরণকে মত্ততাও বলা যায়। অসংযত

ও অসংস্কৃত মনকে দমন করে বিচারশক্তি ও জ্ঞান। বিচারশক্তি কিনা সদসদ্‌বিচারশক্তি। বিচারশক্তির ফল জ্ঞান। প্রকাশস্বরূপ জ্ঞানই মন-রূপ অবিদ্যার অন্ধকার দূর করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সহজ ও সরল ভাষায় এ তত্ত্বের উপর আলোকপাত ক'রে বলেছেন: "সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতীকে জব্দ ক'রে রয়েছে"। মত্ত ও চঞ্চল মন জব্দ অর্থাৎ সংযত ও পরিশুদ্ধ না হ'লে জ্ঞানের উদয় হয় না। অথবা বলা যায়, জ্ঞানের উদয় হ'লে বৃত্তিচঞ্চল মনের লয় হয়। মনের লয় বল্‌তে মন বৃত্তিশূন্য হয়। তখনই মন পরিশুদ্ধ ও শান্ত হয়। মন (বা বুদ্ধি) তখন জ্ঞানে (বোধিতে) রূপান্তরিত হয়। মন একটি বস্তু, সুতরাং তাকে একেবারে নাশ করা যায় না—'you cannot kill the mind' বলেছেন স্বামী অভেদানন্দ। তাই তাকে নাশ বা লয় করার অর্থ তার রূপান্তরসাধন করা। মনকে জ্ঞানে রূপান্তরিত করা যায়—যেমন অজ্ঞানের নাশ হ'লে জ্ঞানের প্রকাশ হয়। অজ্ঞানের নাশ অর্থে মিথ্যাজ্ঞান সত্যজ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। অবিদ্যার নাশ হয় জ্ঞানের উদয় হ'লে। বেদান্তে এ তত্ত্বকেই বিভিন্ন যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বোঝানো হয়েছে যে, অবিদ্যা মিথ্যাজ্ঞান, সুতরাং মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হয় সত্যজ্ঞানের উদয় হ'লে। 'নাশ' অর্থে সংশোধন বা correction. মিথ্যাজ্ঞানের নাশ বল্‌তে correction of error বা ভুলের সংশোধন। মনের বিপর্যয়ের জন্য সংশয় ও মিথ্যাজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। আবার মনের নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির যখন প্রকাশ হয় তখনই মন সুসংস্কৃত ও শান্ত হয়। তখনই মন ও বুদ্ধি জ্ঞানে বা বোধিতে রূপান্তরিত হয়। রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) মনকে তাই বলেছেন অপ্রকৃতিস্থ 'মন-মত্ত-করী'। এই মন-করী (হস্তী) শান্ত ও সংযত হয় জ্ঞানরূপী সিংহের আবির্ভাব হ'লে। পরাবিদ্যারূপিণী দেবী জগদ্ধাত্রী অজ্ঞাননাশিনী ও জ্ঞানদায়িনী। সিংহ জ্ঞানের ও হস্তী অজ্ঞানের প্রতীক সেকথা পূর্বে বলেছি। সিংহ হস্তীকে দমন করার অর্থ জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করা। দেবী জগদ্ধাত্রী জ্ঞানের জলন্ত প্রতিমূর্তি। তাই জীবের অজ্ঞানবন্ধন (দ্বৈতজ্ঞান) তিনি দূর করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ গূঢ় রহস্যের আভাস দিয়েছেন এই ব'লে—"মন-করীকে যে বশ করতে পারে তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন"। মন জ্ঞানে রূপান্তরিত হ'লে জ্ঞানরূপিণী দেবী জগদ্ধাত্রীর আবির্ভাব হয়। মন

অন্তঃকরণের একটি বৃত্তি বা কার্য হলেও মন চৈতন্যেরই অভিন্ন রূপ বা প্রকাশ।

আসলে মন সংযত, শান্ত ও ধ্যানমুখী না হ'লে শুদ্ধসত্ত্বের (শুদ্ধ-জ্ঞানের) প্রকাশ হয় না। তাই হৃদয়ে জগন্মাতা জগদ্ধাত্রীর আবির্ভাবকে সার্থক ও সফল করতে হ'লে হৃদয় বা মনকে পরিশুদ্ধ করতে হয়। মনকে বৃত্তিশূন্য ক'রে শান্ত করতে হয়। মন শান্ত হ'লে শান্তিময়ী মার (বিশ্বপরি-পালিনী জগদ্ধাত্রীর) আবির্ভাব হয় অন্তরে। সাধক তখন পূর্ণশান্তি লাভ করেন।

এবার. জগদ্ধাত্রী-সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাই বলি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "জগদ্ধাত্রী-রূপের মানে জান? যিনি জগৎকে ধারণ ক'রে আছেন। তিনি না ধরলে, তিনি পালন না করলে জগৎ পড়ে যায়, নষ্ট হ'য়ে যায়।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পুরাণ ও বেদান্তাদি-বর্ণিত মায়া-লেশহীন শুদ্ধব্রহ্মেরই প্রকাশক। শুদ্ধব্রহ্মে সৃষ্টির কল্পনা নাই, তিনি মায়াবিরহী। মায়াই সৃষ্টিবীজ, সুতরাং মায়া না থাকলে সৃষ্টি হবে কী ক'রে। সৃষ্টির কল্পনা ও কর্ম মায়াযুক্ত ব্রহ্মচৈতন্য ঈশ্বরে (অব্যক্তে) ও হিরণ্যগর্ভেই (ব্যক্তে) দেখি। ঈশ্বরেও মায়ার সমাবেশ থাকে, তবে ঈশ্বর মায়াধীশ। কারণবীজরূপিণী মায়া ঈশ্বরকে স্পর্শ করতে পারে না। ঈশ্বরের আর এক নাম অব্যক্ত। অব্যক্ত কিনা কারণাকারে সুপ্ত। কারণাকার প্রকৃতিতে সৃষ্টিকর্মের উন্মুখতা থাকে, কিন্তু সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টি সার্থক হয় কার্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভে। হিরণ্যগর্ভ নাম-রূপ নিয়ে ব্যক্ত (জাগ্রত) হন। ব্যক্তব্রহ্মে কারণরূপিণী প্রকৃতি সৃষ্টিকর্মের রূপ ধারণ করেন। এই রূপকে সৃষ্টির সূক্ষ্মরূপ বলে। সূক্ষ্মপ্রকাশ পরে স্থূলবিশ্বচরাচররূপে প্রকাশ পায়। এই স্থূলপ্রকাশের নাম বিরাট বা বিরাটচৈতন্য। কারণ ও সূক্ষ্ম রূপের সমষ্টি-মূর্তিই সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী ও দুর্গা। জগদ্ধাত্রী বিশ্বচরাচরকে ধারণ ও পালন করেন। ধারণ করেন বলতে তিনি সৃষ্টির আধার বা অধিষ্ঠান তিনি কারণ, আবার আধার। অদ্বৈতবেদান্তে সগুণ-ব্রহ্মকে বিশ্বচরাচরের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ এবং আধারও বলা হয়েছে। আসলে তিনি (দেবী জগদ্ধাত্রী ও দেবী দুর্গা) শুদ্ধচৈতন্যরূপিণী। কিন্তু এ চৈতন্যদৃষ্টিতে তিনি কারণও নন. আধারও নন। কারণ ও আধার কল্পনা করা হয় সৃষ্টি ও

মায়া-বিকাশের দিক থেকে। সৃষ্টিকে যতক্ষণ স্বীকার করা হয় ততক্ষণই জগদ্ধাত্রী ও দুর্গা সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-কার্যের কারণ ও আধার দুইই। কারণ ও আধারের অর্থ তিনি মহামায়ারূপে বা জগৎকে সৃষ্টি করেন, পালন করেন ও নাশ করেন। কারণরূপিণী মহামায়া জগদ্ধাত্রী ও দুর্গা তাই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ। কারণকে বাদ দিলে কার্য থাকে না, কেননা কারণই কার্যের (সৃষ্টির) আকারে প্রকাশ পায়। আবার সৃষ্টির নাশ মানেই স্থূল সৃষ্টিকার্য তার কারণরূপে ফিরে যায়। এটি সাংখ্যের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব তাই বলেছেন : "তিনি (জগদ্ধাত্রী) ধারণ না করলে, তিনি পালন না করলে জগৎ পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়।" পড়ে যাওয়ার বা নষ্ট হওয়ার অর্থ কারণকে স্বীকার না করলে কার্যের (সৃষ্টিকার্যের) অর্থ ও সার্থকতা থাকে না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহির্জগতের পরিচয় দেবার পর অন্তর্জগৎ বা অধ্যাত্মজগতের পরিচয় দিয়ে বলেছেন : "মন-করীকে যে বশ করতে পারে তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন।"

কথাই তাই যে, কার্যে (সংসারে) শান্তি ও মুক্তি নাই। অধ্যাত্মকামী সাধক তাই কারণের, কেন্দ্রের বা প্রকৃততত্ত্বের অনুসন্ধান করেন শান্তি লাভ করার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই প্রতিটি মানুষকে দিব্যচৈতন্যের সন্ধান দিয়েছেন ও বলেছেন, জ্ঞান ও মহামুক্তিরূপিণী জগদ্ধাত্রীর আবির্ভাব হয় তখন —যখনি হৃদয় থেকে মন-করী-রূপ অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয়।

পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, বৃত্তিবিক্ষুব্ধ মনই মানুষকে প্রবৃত্তির জালে আবদ্ধ করে। আবদ্ধ করে বলতে ভ্রমের কুয়াসা সৃষ্টি ক'রে মনে। এই কুয়াসার জাল কাটে না মনোলয় না হ'লে। মনোলয় হয় তখনই যখন 'মন-মত্ত-করী' বৃত্তিশূন্য হয়ে শান্ত হয় ও স্বরূপে স্থিতি লাভ করে। স্বরূপে মন স্থির হওয়ার নামই মন চৈতন্যে রূপান্তরিত হয়। রজ্জুতে (দড়িতে) সর্প-ভ্রম হয় ও সেই সর্পভ্রম দূর হ'লে যেমন রজ্জুই থাকে, তেমনি বৃত্তিবিক্ষুব্ধ মনঃ-সমুদ্র যখন তরঙ্গহীন ও শান্ত হয় তখন তা শুদ্ধচৈতন্যরূপে প্রকাশ পায়। এ প্রকাশই চৈতন্যরূপিণী সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী। সুতরাং জ্ঞানোপলব্ধির আশীর্বাদ যখন সাধকের জীবনকে সার্থক ও আনন্দায়িত করে তখনই জ্ঞান-রূপিণী জগদ্ধাত্রী ও দুর্গা সাধকের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হন। হৃদয়ে দেবিপ্রতিষ্ঠার নামই আত্মোপলব্ধি বা অপরোক্ষানুভূতি। এই উপলব্ধি বা পরানুভূতি লাভ

হ'লে সাধক অজ্ঞান ও সংসারপাশ থেকে মুক্ত হন। একেই উপনিষৎ 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ, ক্ষিয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে' ব'লে বর্ণনা করেছে। মুক্তিই সকল মানুষের কাম্য। এজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগদ্ধাত্রীর রূপকে সার্থক দৃষ্টি নিয়ে দেখার জন্য দেবীপ্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। যোগদর্শনের নির্বিকল্পসমাধি ও বেদান্তদর্শনের আত্মোপলব্ধি এবং চৈতন্যরূপিণী দেবীর সার্থক দর্শন প্রায় একই পর্যায়ের।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীকথামৃতে (১ম ভাগ) ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সমাধি ও জ্ঞান-লাভের প্রসঙ্গে পুনরায় বলেছেন: "জ্ঞান লাভ হলে সমাধিস্থ হয়। সমাধিস্থ হ'লে তবে অহং যায়। সে জ্ঞানলাভ বড় কঠিন।" যোগদর্শনের বিচিত্র ভূমি ও সে'সকল ভূমির ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতির কথাও তিনি আলোচনা করছেন। তিনি বলেছেন: "জাহাজ একবার কালাপানীতে (গভীর সমুদ্রে) গেলে আর ফিরে না। * * নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছিল, কিন্তু যাই নেমেছে, অমনি গলে গেছে! সমুদ্র কত গভীর কে খবর দিবেক! যে দিবেক, সে মিশে গেছে। সপ্তমভূমিতে মনের নাশ হয়, সমাধি হয়। তখন কি বোধ হয় মুখে বলা যায় না।" যোগের সেই সপ্তম ভূমির নাম সহস্রার বা সহস্রদলপদ্ম। সহস্রারে জীবাত্মারূপী কুণ্ডলিনীশক্তি পরমজ্ঞানরূপী শিবের সঙ্গে একীভূত হয়। এরই নাম প্রকৃতি-পুরুষের—শক্তি শিবের অভিন্নমিলন বা সামরস্য। সামরহস্যের অনুভূতিক্ষেত্রে মনের লয় হয়—যেমন নুনের পুতুল তার আপন সত্তা হারিয়ে সমুদ্রের জলের সঙ্গে একাকার হয়। মনের লয় ও মন-মত্ত-করীর পরাজয় একই কথা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতীকে জব্দ ক'রে রয়েছে।" মন-মত্ত-করী-রূপ হস্তীকে জব্দ করতে হ'লে প্রথমে বাহন বা প্রতীক সিংহের ও পরে সিংহবাহিনী দেবীর শরণাপন্ন হতে হয়। দেবীর প্রসন্নতারূপ সিদ্ধি ও জ্ঞানের আশীর্বাদ লাভ করার জন্যই দেবী জগদ্ধাত্রী ও দুর্গার আরাধনা করা। এই আরাধনা সার্থক হয় জ্ঞানময়ী দেবীর স্বরূপকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করলে।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ একটাতে দৃঢ় হও ॥

"শ্রীরামকৃষ্ণদেব (ভাবস্থ) 'এরা ব্রহ্মজ্ঞানী, নিরাকারবাদী। তা বেশ।

(ব্রাহ্মভক্তদের প্রতি)—'একটাতে দৃঢ় হও, হয় সাকারে, নয় নিরাকারে, তবে ঈশ্বর লাভ হয়, নচেৎ হয় না। দৃঢ় হ'লে সাকারবাদীও ঈশ্বর লাভ করবে, নিরাকারবাদীও করবে। মিছরির রুটি সিধে ক'রে খাও, আর আড় ক'রে খাও, মিষ্টি লাগ্‌বে (সকলের হাস্য)।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ (১৩৬৬), পৃঃ ১৮৬

এই আলোচনার পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেব হরিকথাপ্রসঙ্গে (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, প্রথম ভাগ) বলেছেন : "ঈশ্বরীয় অবস্থার ইতি করা যায় না ; তারে বাড়া ; তারে বাড়া আছে।" একথার অর্থ ঈশ্বরের রূপ যেমন আছে, তেমনি একমেবাদ্বিতীয়ম্, তেমনি আবার অনেক—'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব'। পরমতত্ত্ব এক, আবার অনেক—একথা অসম্ভব ব'লে মনে হয় অনেক সময়ে। ঈশ-উপনিষদে আছে : 'অনেজদেকং মনসো জবীয়ো' (১।৪), 'তদেজতি তন্নৈজতি, তদ্দূরে তদ্বন্তিকে, তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ' (১।৫)—অর্থাৎ তিনি (ঈশ্বর বা আত্মা) এক, অদ্বিতীয় ও কূটস্থ—স্থির, ধীর, আবার অনেক। তিনি মনের চেয়েও বেগমান—চঞ্চল। আবার তিনি (ঈশ্বর বা আত্মা) অচল বটে, নিশ্চলও বটে ; তিনি অতিদূরে, আবার অতিনিকটে ; তিনি সকলের অন্তরে, আবার বাইরে। আচার্য শঙ্কর এই পরস্পরবিরোধী ভাবের সমন্বয় করার জন্য বলেছেন : "নৈষ দোষঃ, নিরুপাধ্যুপাধিমত্ত্বেনোপপত্তেঃ"—এতে দোষ নাই, কেননা ঈশ্বর বা

আত্মা উপাধিশূন্য, আবার উপাধিযুক্ত। এই বিরুদ্ধ কথা বা ভাব-দুটির মীমাংসা হ'তে পারে এ'দিক থেকে : উপাধিযুক্ত তাঁর একটি রূপ, আবার উপাধিশূন্য তাঁর আর একটি রূপ। একই ব্যক্তি বা বস্তু, কিন্তু উপাধিভেদমাত্র। মোটকথা উভয় রূপে প্রকাশ পাওয়া ঈশ্বর বা আত্মার পক্ষে সম্ভব। ঈশ্বর বা আত্মা অন্তঃকরণ বা মন-রূপ উপাধির সঙ্গে যখন সম্পর্কিত তখন তাঁকে সোপাধিক অর্থাৎ উপাধিরূপ গুণযুক্ত বলা হয়। আবার সৎ, চিৎ ও আনন্দ —সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ (অস্তি ভীতি ও প্রিয়) এই আপন সত্তায় বা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত যখন, তখন তিনি নিরুপাধিক কিনা উপাধি ও গুণশূন্য। নিরুপাধিক ঈশ্বর বা আত্মা অনেজৎ কিনা অচঞ্চল ও এক, আর উপাধি বা গুণযুক্ত সোপাধিক অবস্থায় 'মনসো জবীয়ো'—মনের অপেক্ষাও তিনি চঞ্চল ও বহু। এভাবে আকাশের মতো তিনি ব্যাপক, আবার প্রাণীগণের অন্তরে তিনি অন্তর্যামীরূপে এক এবং জীবজগদ্‌রূপে অনেক।

মন যে চঞ্চল একথা সকলেই জানে। যোগবাশিষ্ঠে বশিষ্টদেব মনকে বলেছেন : 'মর্কটঃ মদিরোন্মত্তঃ বৃশ্চিকেন হি দংশিতঃ' প্রভৃতি ; অর্থাৎ মর্কট বা বানর স্বভাবতই চঞ্চল স্বভাব। তারপর তাকে মদ খাওয়ানো হয়েছে, বৃশ্চিকে কামড়েছে ও ভূতে পেয়েছে, সুতরাং বানরের তাণ্ডব সভাবের কথা সকলের কাছেই বিদিত। ঈশোপনিষদে মনকে বেগবান বলা হলেও মনের চেয়ে বেগবান আত্মা এ'কথাও বলা হয়েছে। অখণ্ড আকাশের মতো আত্মা ব্যাপক। আবার অন্তর্যামী ব'লে আত্মা এক, আবার বিশ্বচরাচর-রূপে বা বিশ্বচরাচরের আত্মা বা জীবাত্মা রূপে অনেক। কেবল ব্যষ্টি ও সমষ্টি-ভেদ মাত্র। সুতরাং একই আত্মায় বিপরীত বা অনেক গুণ থাকে একথা বলে অজ্ঞানী, আর জ্ঞানীর চক্ষে আত্মা এক ও সর্ববিরোধশূন্য ও সর্ব-উপাধিশূন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, ঈশ্বরীয় রূপের ইতি করা যায় না। তিনি কখনও সাকার, কখনও নিরাকার ; কখনও সগুণ, কখনও নির্গুণ। সাকার, কেননা দুর্গা, কালী, শিব প্রভৃতি দেবদেবীরূপে একই ঈশ্বর নানা মূর্তিতে প্রকাশ পান আবার সকলের মধ্যে অনুস্যূত চৈতন্য রূপে এক ও অখণ্ড। তাই কখনও সাকার, কখনও নিরাকার। বাতাসকে নিরূপ ও নিরাকার বলি চোখে দেখি না ব'লে, কিন্তু বাতাসকে স্পর্শ করি, বাতাস গন্ধবাহী,

বাতাসের সাহায্যে বস্তু গতিশীল হয়, সে'জন্য তাকে আবার সরূপ ও সাকার বলি। ঈশ্বর স্বরূপে আকারশূন্য নিরাকার, কিন্তু তাই ব'লে ঈশ্বরকে যে দর্শন করা যায় না, বা আত্মাকে যে অনুভব করা যায় না—তা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একই জলের তিন রকম রূপের কথা বলেছেন—জল, বাষ্প ও বরফ। জল দেখা যায়, আবার বরফের আকারে জলকে আরও স্থূল আকারে দেখা ও স্পর্শ করা যায়, কিন্তু বাষ্পকে দেখা যায় না। তবে অত্যন্ত ঠাণ্ডায় বাষ্প যখন জল হয় ও জল বরফ হয়, তখন বাষ্পকে বরফের আকারে দেখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, ভক্তিহিমে নিরাকার ঈশ্বর সাকার দেবদেবী ও ইষ্টরূপে দেখা দেন। তাই নিরাকাররূপে ঈশ্বর এক, আবার সাকাররূপে ঈশ্বর অনেক। উপনিষদে পাই—একই চৈতন্য বিশ্ব-চরাচর (সৃষ্টি) রূপে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করেন: 'একোঽহং বহু স্যাম,' —'আমি এক, সৃষ্টি বা জীবজগৎ-রূপে বহু হব'। বহুর ইচ্ছাই এক আত্মাকে বহুতে পরিণত করে। সুতরাং আত্মকাম যিনি, তিনি ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে নিজেকে এক, আবার বহুতে রূপায়িত করেন। তন্ত্র বলে, ইচ্ছাময়ী কালী দিব্যইচ্ছার বলে সকল-কিছু করেন, সকল-কিছু হন, আবার বিশ্বের সকল-কিছু ভাঙেন। ভাঙ-গড়া তাঁরই ইচ্ছা—'সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি'। তাই লোকের সসীম আমি (ভূমি) ও ঈশ্বরের অসীম আমিতে (ভূমাতে) পার্থক্য অনেক। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, একটি কাঁচা-আমি ও অপরটি পাকা-আমি। তবে উভয় আমিতে অখণ্ডদৃষ্টির নাম আত্মদর্শন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'ঈশ্বরীয় অবস্থার রূপের ইতি করা যায় না'।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবস্থ হ'য়ে বলেছেন: "এরা ব্রহ্মজ্ঞানী, নিরাকারবাদী, **তা বেশ**"। ব্রহ্মজ্ঞানী উপলব্ধি করেন যে, ব্রহ্ম চৈতন্যরূপে এক ও ব্যাপক। এই ব্যাপকচৈতন্যই ব্রহ্ম নামে অভিহিত—'ব্যাপকত্বাদ্ ব্রহ্ম'। কিন্তু দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছন্ন হ'লে ব্রহ্মচৈতন্য (পরমাত্মা) জীবাত্মা নামে পরিচিত হন। দেশ ও কালই সীমা। সীমা কিনা সীমিত জ্ঞান—যাকে অজ্ঞান বলে। অজ্ঞান ঈশ্বর বা আত্মচৈতন্যের জ্ঞানকে খণ্ড খণ্ড ক'রে বিচ্ছিন্ন করে। ব্যাপক ব্রহ্মচৈতন্যের বিচ্ছিন্ন (খণ্ড খণ্ড) রূপই জীবাত্মা। দেশ ও কাল ব্রহ্মের ব্যাপক রূপকে জানতে দেয় না, অখণ্ডকে খণ্ড করে। অখণ্ডকে খণ্ড

বলে ভাবা ও দেখাই অজ্ঞান। মনে রাখার বিষয় যে, অজ্ঞান একেবারে অবস্তু বা সত্তাহীন জ্ঞান নয়, তার অনির্বচনীয় একটি সত্তা আছে। বেদান্ত বলে, অজ্ঞানও জ্ঞান, তবে ভুলজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান। তাই অজ্ঞান যথার্থ-জ্ঞান নয়, কিন্তু খণ্ডজ্ঞান। এই খণ্ডজ্ঞান-রূপ মিথ্যা বা ভুলজ্ঞানই ঈশ্বরের অসীম রূপকে সসীম করে। অজ্ঞান ভ্রমজ্ঞান, যেমন দড়িকে সাপ ব'লে ভ্রম করা, কিন্তু দড়ি সাপ নয়। দড়ি সাপ নয় এটা জ্ঞান হলেই দড়িতে সাপের জ্ঞান (সর্পভ্রম) দূর হয়। তেমনি এক ও অখণ্ড ব্যাপকচৈতন্য অনেক, খণ্ড নয়, বরং খণ্ড ব'লে মনে করা বা করানোটাই ভুলজ্ঞান। অদ্বৈতবাদীরা স্বরূপে সকল জিনিসকে দেখার চেষ্টা করেন ও ব্যাখ্যা করেন। স্বরূপে দেখেন বলতে ব্রহ্মচৈতন্য স্বভাবত যা সে রূপেই দেখেন ও অনুভব করেন। জ্ঞানীরা সে'জন্য অসীমকে সীমার মধ্যে দেখতে চান না, আবার দেখেনও তাঁর অসীম সত্তাকে অনুভব বা স্মরণ ক'রে। মোটকথা যা 'দিবীব চক্ষুরাততম্—আকাশের মতো যাঁর চক্ষু আতত বা বিস্তৃত, তাঁকে সীমাযুক্ত ও খণ্ড করলে (ক্ষুদ্র ভাবলে) এক নানায় বা বৈচিত্র্যে পরিণত হয়। তাই জ্ঞানী যাঁরা বা যথার্থজ্ঞান যাঁদের হয়েছে তাঁরা অসীম সত্তাকে সীমা দিয়ে, গুণ দিয়ে, উপাধি দিয়ে খণ্ড করতে চান না।

পূর্বেই বলেছি, গুণ বা উপাধির স্বভাব অসীমকে সীমাতে পরিণত করা। উপনিষদে আছে, অসীম ও সর্বব্যাপক ব্রহ্মচৈতন্য সৃষ্টির আকুলতায় বহু হন, বা পৃথক পৃথক রূপ ('রূপং রূপং প্রতিরূপো') ধারণ করেন, কিন্তু এ'কথার অর্থ এ নয় যে, অখণ্ডচৈতন্য খণ্ডচৈতন্যে পরিণত হন। একথার অর্থ—আপাতত পৃথক ব'লে মনে হলেও সৃষ্টিবৈচিত্র্যেও তিনি, বা তাঁরই রূপ—'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ'। সৃষ্টি ভাবলেই স্রষ্টার কল্পনা আসে, আর এ কল্পনাই দ্বৈতজ্ঞান সৃষ্টি করে। তাই সিদ্ধান্তে বা স্বরূপদৃষ্টিতে সৃষ্টি যাঁর, স্রষ্টা তিনিই—যেমন শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, নিত্যই লীলায় পরিণত হয়। যিনি নিত্য, তাঁরই লীলা।

বেদান্তের বিচারেও সৃষ্টি বা বৈচিত্র্য স্বীকার করা হয় বহুকে একের বিকাশ ব'লে উপলব্ধি করার জন্য। আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (প্রথম অধ্যায়, চতুর্থ সূত্রভাষ্যে) বলেছেন, ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত দ্বৈতবুদ্ধি বা ভেদজ্ঞান থাকে, তাই ভেদজ্ঞানী মানুষের কাছে সৃষ্টি থাকে, আর

ব্যবহারিকভাবে সৃষ্টির সার্থকতাও থাকে। এখন প্রশ্ন এই যে. সৃষ্টি সৃষ্টি-কর্তা থেকে ভিন্ন—কি অভিন্ন ? সৃষ্টি ও স্রষ্টা উভয়ই এক ও অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্য থেকে পৃথক—কি অপৃথক ? উপনিষৎ বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, ব্রহ্মচৈতন্য থেকে কি সৃষ্টি ও কি স্রষ্টা মোটেই ভিন্ন নয়। 'বিশ্ব সৃষ্টি ক'রে তিনি (সগুণ-ব্রহ্ম) সৃষ্টিতে প্রবেশ করেন'। 'সৃষ্টিতে প্রবেশ করেন' বলতে এক ও অখণ্ড চৈতন্য সৃষ্টিরূপ ধারণ করেন। ছিলেন এক, হন বহু বা অনেক। সমষ্টিচৈতন্য ব্যষ্টিচৈতন্য রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাতে ক'রে দ্বৈতজ্ঞানসেবী সাধারণ মানুষের কাছে এ' তত্ত্বই প্রকাশিত হোল যে, স্বরূপ-দৃষ্টিতে সৃষ্টি ও স্রষ্টা ভিন্ন নয় এবং ঈশ্বর এক ও বহুর অতীত অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-চৈতন্যই। সৃষ্টিতে পৃথক রূপে প্রকাশ পান অজ্ঞানের আবেশ থাকার জন্য।

আসলে ব্রহ্মবস্তুই সৃষ্টির অণু-পরমাণুতে অনুস্যূত—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। সমগ্র বিশ্ব যে ব্রহ্মস্বরূপ এ জ্ঞানদৃষ্টি না থাকার জন্য সৃষ্টিকে আমরা ব্রহ্মচৈতন্য থেকে পৃথক ব'লে ভাবি। জ্ঞানদৃষ্টি না থাকার নাম অজ্ঞান। অ-জ্ঞান কিনা অযথার্থ জ্ঞান। সুতরাং উপনিষদে (শ্রুতিতে) সৃষ্টিরপর বাক্যগুলি এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক—এ'কথা বলেছেন আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "ব্যাকুলতা ও ঈশ্বর লাভ। দৃঢ় হও।" ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয় বিরহ ও বিচ্ছেদ থেকে। এই আকুল-আকুতির কথা কাব্যসৌন্দর্য নিয়ে বলেছেন কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৌতুকময় অন্তর্যামী বা জীবনদেবতার উদ্দেশ্যে রচিত কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে আরম্ভ ক'রে 'মানসী' ও 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'কল্পনা' কবিতায় ঐ পরমরহস্যময় ভাবতত্ত্ব ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছে এবং 'খেয়া'-কবিতায় তা আরও স্পষ্টতর হয়েছে। 'গীতাঞ্জলি'-তে এই মিলন-বিরহ ভাব বাস্তব রূপ নিয়েছে—'আমার মিলন লাগি তুমি, আসছ কবে থেকে'। তাই দেখি, বিচ্ছেদ-ভাবকে মুছে ফেলার জন্য ব্যাকুলতার পদক্ষেপ এবং ব্যাকুলতার সমাপ্তি হয় অভিন্নতা রূপ মিলনে। এই মিলনের নাম ঈশ্বরলাভ।

'ঈশ্বর'-শব্দ এখানে সর্বব্যাপক চৈতন্য—'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্'। বেদান্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বরলাভ ঈশ্বরচৈতন্যেরই উপলব্ধি। এ অনুভূতির নাম দর্শন। 'দর্শন' অর্থে দর্শনক্রিয়া, সুতরাং ক্রিয়ার একজন কর্তাও চিন্তা করতে হয়। কিন্তু ঈশ্বরদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন ক্রিয়া-কর্তা-রূপ উপাধি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আচার্য শঙ্কর 'তত্তু সমন্বয়াৎ' এই চতুর্থ সূত্র ব্যাখ্যা করার সময়ে স্পষ্টভাবে বলেছেন: 'বস্তুতন্ত্রত্বাৎ, ন পুরুষতন্ত্রঃ'।[১] 'বস্তুতন্ত্র' শব্দের অর্থ সর্বকালিক সত্যসত্তা, অর্থাৎ যিনি সর্বদাই আছেন। ব্রহ্মবস্তু আছেনই, সুতরাং তাঁকে লাভ করার জন্য কোন কর্মসাধনের প্রয়োজন হয় না। কর্ম বা সাধনের প্রয়োজন হ'লে ব্রহ্মবস্তু পুরুষতন্ত্র হয়। 'পুরুষতন্ত্র' শব্দের অর্থ মানুষের কর্ম ও চেষ্টার জন্য বস্তুলাভ। অর্থাৎ পুরুষ (মানুষ) যখন নিজের চেষ্টার বিনিময়ে কোন-কিছু লাভ করে বা বস্তুকে নিজের অধিকারে আনে তখনই তাকে কোন ব্যক্তি বা পুরুষের চেষ্টার ও সাধন করার জন্য পাওয়া ও পুরুষতন্ত্র বলে।

কিন্তু সর্বপ্রকাশক, সর্বদা প্রকাশশীল ও নিত্যসত্তাস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্য অনুভূতিস্বরূপ। ইনি যে আছেন ও চিরদিন থাকেন এই যথার্থজ্ঞানের উপলব্ধি করতে হয়। এ উপলব্ধিকে অনেকে রিকগ্‌নিশন্ (recognition) বা পুনর্জ্ঞান বলেন। পুনর্জ্ঞান বা রিকগ্‌নিশনের অর্থ আমি জ্ঞানস্বরূপ ও এই জ্ঞান থেকে আমি বঞ্চিত নই, কেবল অজ্ঞানের আবরণের জন্য আত্মবিস্মৃত ও স্বরূপজ্ঞানবিরোহী। কিন্তু সদসদ্‌বিচারের পর আবার সেই স্বরূপপ্রত্যয় ফিরে আসে ও তখনই তাকে বলে পুনর্জ্ঞান, পুনঃপ্রতীতি বা রিকগ্‌নিশন। থিওরি-অব-রিকগ্‌নিশনের অর্থই তাই। ভুলে যাওয়া জ্ঞানের প্রকাশ হলেই তা পুনরায় জানা-রূপ রিকগ্‌নিশন।

অজ্ঞানের আবরণের জন্য স্বরূপচৈতন্যকে মানুষ জানতে পারে না। সাধন-ভজন ও ধর্মকর্ম চিত্তশুদ্ধির জন্য। চিত্তশুদ্ধি হ'লে ব্রহ্মসম্বন্ধে ভুলজ্ঞান দূর হয়। তাই অজ্ঞানের অপসারণ যা, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশও তাই। একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে প্রদীপ নিয়ে গেলে যেমন সেই গৃহের অন্ধকার দূর হ'য়ে গৃহ আলোকিত হয় ও গৃহের সকল জিনিসের জ্ঞান হয়, কিংবা আকাশ মেঘে ঢেকে থাকলে সূর্যকে দেখা যায় না, কিন্তু মেঘ সরে

১। শুধু ব্রহ্মজ্ঞান কেন, জ্ঞানমাত্রেই বস্তুতন্ত্র, আর ক্রিয়ামাত্রেই পুরুষতন্ত্র বা কর্তার অধীন। বস্তুতন্ত্র কাছের বা দূরের কোন বস্তু বা পদার্থের সঙ্গে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের যোগা-যোগ হলেই বস্তু বা পদার্থ-সম্বন্ধে সত্য বা মিথ্যা জ্ঞান হয়। ক্রিয়াসম্বন্ধে এই নিয়ম খাটে না, কেননা পুরুষ বা কর্তা ইচ্ছা করলে করতে পারে, বা না করতে পারে, কিংবা অন্যরকমও করতে পারে, সুতরাং ক্রিয়াকে কর্তৃতন্ত্র বা পুরুষতন্ত্র বলে। পুরুষতন্ত্র অর্থে পুরুষের চেষ্টার অধীন।

গেলে সূর্যকে দেখা যায়, তেমনি অজ্ঞান (মিথ্যাজ্ঞান) দূর হ'লে সত্যজ্ঞানরূপ ব্রহ্মচৈতন্যের প্রকাশ হয়। এই প্রকাশ স্বতঃসিদ্ধ ও অনন্তকালস্থায়ী শাশ্বত। সদানন্দ যতি 'বেদান্তসার'-গ্রন্থে এ তত্ত্বটি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়েছেন। আসলে জীব ব্রহ্মচৈতন্য ছাড়া অন্য-কিছু নয়, কেবল মায়ার আবরণের জন্য ব্রহ্মচৈতন্য থেকে নিজেকে পৃথকভাবে চিন্তা করে। অথচ এ' চিন্তাটি নিছক মিথ্যা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈশ্বর-লাভের কথা বলেছেন। পূর্বেই বলেছি যে, ঈশ্বর-লাভ ও ঈশ্বরদর্শন এক কথা। তিনি বলেছেন: "ঈশ্বরকে ব্যাকুল হ'য়ে খুঁজলে তাঁকে দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়, যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি। **সত্য বলছি দর্শন হয়।**" শ্রীরামকৃষ্ণদেব জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রসঙ্গেও বলেছেন, ঈশ্বরকে দর্শন হ'লে জ্ঞান, আর তাঁর সঙ্গে আলাপ হলে বিজ্ঞান। জ্ঞান ও বিজ্ঞান স্বরূপত একই, উভয়ের মধ্যে প্রার্থক্য—একটি বিশেষ বা ব্যষ্টিজ্ঞান ও অপরটি সামান্য বা সমষ্টিজ্ঞান।

এ দর্শন সত্য, কিন্তু দ্বৈতবুদ্ধিরূপ অজ্ঞান অঞ্জন চোখে মাখানো থাকে ব'লে দর্শন বা প্রত্যক্ষ হয় না। প্রত্যক্ষ হয় জ্ঞানচক্ষে,—যেমন ত্রিনয়নী মা দুর্গা জ্ঞানচক্ষুরূপ তৃতীয় চক্ষে (Third Eye) বিশ্বের সকল প্রাণী ও বস্তুকে আপন স্বরূপচৈতন্যের স্ফুরণ ব'লে দর্শন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে মৃন্ময়ী শ্রীশ্রীভবতারিণীকে চিন্ময়ী জগন্মাতারূপে ও এমনকি পূজার কোশাকুশি ও মন্দিরের চৌকাট ও দরজা-জানালাকেও চৈতন্য-রূপে দর্শন করেছিলেন। খালি চোখেও দেখা যায়—যদি চোখে জ্ঞানানুরাগের অঞ্জন মাখানো থাকে। সাধক রামপ্রসাদ আরাধ্য জগদীশ্বরীকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতেন; দেবীর সঙ্গে কথা কইতেন এবং বেড়াও বেঁধেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের কথাও তাই। সে'জন্য ভারতের জ্ঞানদর্শীগণ বেদান্তদর্শন, ন্যায়দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রকাশক 'দর্শন'-শব্দটির অর্থ করেছেন প্রত্যাক্ষানুভূতি—যাকে ইংরেজীতে বলে direct knowledge বা immediate awareness, বা to see God face to face। অধ্যাত্মজ্ঞানভূমি ভারতবর্ষে 'দর্শন'-শব্দটির অর্থ তাই,—যদিও পাশ্চাত্যদেশে দর্শনকে বলা হয়েছে love for wisdom, অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা ও জ্ঞানের প্রতি ভালবাসা। জ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা ও ভাল-বাসায় দ্বৈতবুদ্ধি থাকে, কিন্তু অদ্বৈতজ্ঞানের অনুভূতিতে দ্বৈতবুদ্ধি থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—দৃঢ় হও। "(ব্রাহ্ম-ভক্তদের প্রতি) একটাতে

দৃঢ় হও—হয় সাকারে, নয় নিরাকারে। তবে ঈশ্বর লাভ হয়, নচেৎ হয় না। দৃঢ় হ'লে সাকারবাদীও ঈশ্বর লাভ করবে, নিরাকারবাদীও করবে।" এ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন "তা বেশ" এবং সাকার বা জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর-লাভের প্রসঙ্গে বলেছেন—"দৃঢ় হও"। (১) 'তা বেশ'-শব্দটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সমদর্শনের এবং সঙ্গে সঙ্গে সমন্বয়দর্শনের ভাবও প্রকাশ পায়। সমদর্শনের প্রকাশ নিয়ে তিনি বলেছেন,

(ক) কিন্তু বস্তুত ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যিনি সচ্চিদানন্দ, তিনিই সচ্চিদানন্দময়ী। যেমন মণির জ্যোতিঃ ও মণি। মণির জ্যোতিঃ বল্‌লেই মণি বুঝায়, মণি বল্‌লেই জ্যোতিঃ বুঝায়।

(খ) যিনিই নিত্য, তাঁরই লীলা।

(গ) এক সচ্চিদানন্দ, শক্তিভেদে উপাধিভেদ। তাই নানা রূপ—'সে তো তুমিই গো তারা'। যেখানে সৃষ্টি (সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়), সেখানেই শক্তি। তেমনি জল স্থির থাকলেও জল, আর তরঙ্গ, ভুডভুড়ি হলেও জল। সেই সচ্চিদানন্দই আদ্যাশক্তি—যিনি সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় করেন।

(ঘ) যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী—মা আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়—তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই, যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলচে-দুলচে—শক্তি বা কালীর উপমা। কালী কিনা যিনি মহাকালের (ব্রহ্মের) সহিত রমণ (বিহার) করেন। কালী সাকার, আবার নিরাকার—'সাকারা মা নিরাকারা'।

সুতরাং 'তা বেশ' বল্‌তে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ইঙ্গিত হোল সাকার যিনি, নিরাকার তিনিই; সগুণ যিনি, নির্গুণও তিনিই এবং তিনি আরও কতকি! শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টি সর্বাত্মক ও সর্বগ্রাসী। এ'দৃষ্টিতে আমি-তুমি-ভেদ নাই, স্রষ্টা-সৃষ্টি-ভেদ নাই, ব্রহ্ম-জীব-ভেদ নাই, সমস্তই একাকার—"যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে" (গীতা ২।৪৬); মহাপ্লাবনে খাল, বিল, পুষ্করিণী সমস্তই জলে একাকার হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—'দৃঢ় হও'। 'একটাতে দৃঢ় হও'—হয় সাকারে, নয় নিরাকারে, কেননা একই সত্য, এক থেকেই দুই বা বিচিত্রতার সৃষ্টি ও বিভেদ।

তত্ত্ববস্তু সাকার, আবার নিরাকার; নিত্য, আবার লীলা। দৃঢ়

হওয়ার অর্থ তাই যে, যথার্থ স্বরূপ যা, যথার্থ তত্ত্ব ও সত্য যা, তাতে বুদ্ধি ও লক্ষ্য স্থির করলে একত্বানুভূতি লাভ হয়। ঈশ্বরই সত্য ও তত্ত্ব, সুতরাং প্রত্যয় ও দৃষ্টি যদি অখণ্ড একটি সত্যে ও তত্ত্বে স্থির হয়, তবে উপাধি, গুণ ও প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন হলেও যথার্থ বস্তুরই অনুভূতি হয়। "মিছরীর রুটি সিদে ক'রে খাও, আর আড় ক'রে খাও, মিষ্টি লাগবে"। মিছরীর রুটির সর্বত্রই মিছরী, সুতরাং মিষ্টত্ব তার সকল দিকেই। ব্রহ্মবস্তু সকলের আধার ও স্বরূপ, সুতরাং সকল-কিছু বিকাশ বৈচিত্র্যপূর্ণ হলেও এক ব্রহ্মচৈতন্যই সকলের কেন্দ্র, উৎস ও প্রাণ—যাকে বলে প্রতিষ্ঠা বা অধিষ্ঠান। ব্রহ্মতত্ত্বের অনুভূতি হ'লে বিচিত্র বস্তুতে অনুস্যূত অখণ্ড ব্রহ্মেরই জ্ঞান হয়। ব্রহ্মের জ্ঞান বল্‌তে ব্রহ্মই জ্ঞানস্বরূপ, তার অনুভূতিতে আধার-আধেয়সম্বন্ধ নাই—সামানাধিকরণ্যই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, যখন সানাই বাজে তখন অপরে একটা মূলসুর ধরে থাকে, আর মূলবাদক সেই মূলসুরের উপর বিচিত্র রাগ-রাগিণীর তরঙ্গ সৃষ্টি করে। অথবা সমুদ্র একটাই, কিন্তু সমুদ্র বিক্ষুব্ধ বা বিচলিত হলে অসংখ্য ঢেউ বা তরঙ্গ সে' একই সমুদ্রের বুকে খেলা করে: খেলা বা লীলা অসংখ্য ও বিচিত্র রূপে হয়, কিন্তু খেলেন একজনই। ভগবানের লীলাখেলার অন্ত নাই, কিন্তু ভগবান একজন—এক ও অদ্বিতীয়. তাই জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন সাধক যদি স্বরূপতত্ত্বে স্থির থাকেন, তবে সাকার ও নিরাকার দুইই তার কাছে সমান বোধ হয়। বোধ কিনা জ্ঞান। সাধক তখন দেখেন—নিত্যেরই লীলা ও লীলাময়ই নিত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলেছেন: "কিন্তু দৃঢ় হতে হবে। ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাকৃতে হাব।" এখানে দৃঢ় হওয়া ও ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হওয়া মনের বৃত্তি বা মনের কর্ম হলেও একটি অন্যের পরিপূরক; মন বা বুদ্ধি যদি বোঝে যে, সাকার ও নিরাকার একেরই বিকাশ এবং একের জ্ঞানলাভই জীবনে প্রয়োজন, তবেই মন ব্যাকুল হয় তাঁকে পাবার জন্য, আর পাবার সাহায়ক-রূপে প্রয়োজন হয় তখন ডাকার বা প্রার্থনার। ডাকা বা প্রার্থনা সত্যবস্তুকে জানার জন্য। এ' জন্য একমুখী ধ্যানঘন মনোবৃত্তির প্রয়োজন। মনোবৃত্তিতে প্রার্থনার আঘাত করলে বৃত্তি কেন্দ্রায়িত হয় সত্যে বা তত্ত্বে। কেন্দ্রায়িত হওয়ার অর্থ স্থির হওয়া। সত্যের বা তত্ত্বের আকারে তখন মনের বৃত্তি আকারিত হয়। উপলব্ধির অর্থ তাই—তদাকারে

আকারিত হওয়া। তার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "ডুব দাও। ডুব না দিলে সমুদ্রের ভিতর রত্ন পাওয়া যায় না।" ডুবুরি সমুদ্রে ডুব দেয় সমুদ্রের তলায় রত্ন পাবার জন্য। সাধককে তাই সাধনসমুদ্রে প্রথমে, তারপর অনুভূতির অতলতলে ডুব দিতে হয়। তখন কেবলই জল। জলের অতলতলে ডুবুরি রত্ন লাভ ক'রে আত্মহারা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে (১ম ভাগ) অন্যত্র (পৃঃ ১৭৪) শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ তত্ত্বটি গানের সাহায্যে অতিসুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "তাই বল্‌ছি, ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও।" এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগন্মাতার পাদপদ্মরূপ সাগরে শুধু ডুব দিতে বলেন নি, বলেছেন 'মগ্ন হও',—একে তলিয়ে এক হয়ে যাও। "এই কথা বলিয়া ঠাকুর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গান গাহিতেছেন—

ডুব ডুব ডুব রূপ সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে, পাবি রে প্রেম-রত্নধন।
খুঁজ খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি,
হৃদয়-মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি,
জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ।"

এটি কবিরের (সাধক কবিরের রচিত) গান। কবির গুরুর শ্রীচরণকে আশ্রয় ক'রে ইষ্টে ডুব দিতে বলেছেন। গুরু ও ইষ্ট এক ও অভিন্ন। শ্রীগুরু ও শ্রীজগন্মাতা এক ও অভিন্ন। অমৃতের সাগর শ্রীজগন্মাতা ও শ্রীগুরু। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "এ'সাগরে ডুবলে মরে না; ঐ সে অমৃতের সাগর।"

অমৃতের সাগরে স্নান করলে বা ডুবলে মৃত্যু হয় না, বরং অমৃত লাভ হয়, জীবন মৃত্যুকে জয় করে। যেমন শিব মৃত্যুঞ্জয়। এ'প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলাম—'ঈশ্বর রসের সমুদ্র। তুই এ' সমুদ্রে ডুব দিবি কিনা বল্। আচ্ছা, মনে কর্—খুলিতে এক খুলি রস রয়েছে, আর তুই মাছি হয়েছিস। কোথা বসে রস খাবি বল্? নরেন্দ্র বল্‌লে, 'আমি খুলির আড়ায় বসে মুখ বাড়িয়ে খাবো। কেননা বেশী দূরে গেলে ডুবে যাব'। তখন আমি বললাম, 'বাবা, এ'সচ্চিদানন্দ-সাগর, এতে

মরণের ভয় নাই। এ' সাগর অমৃতের সাগর। যারা অজ্ঞানী, তারাই বলে যে, ভক্তি-প্রেমের বাড়াবাড়ি করতে নাই। ঈশ্বরপ্রেমের কি বাড়াবাড়ি আছে? তাই তোমায় বলি সচ্চিদানন্দ-সাগরে মগ্ন হও।"

এখানে পূর্ব-আলোচনার সঙ্গে শেষ আলোচনার যোগ ও সামঞ্জস্য রক্ষা করলে দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'একটাতে দৃঢ় হও' ও 'ডুব দাও' বা 'সচ্চিদানন্দ-সাগরে মগ্ন হও' এ'সব এককথা। ইষ্ট বা লক্ষ্যের সঙ্গে মনের ব্যাকুল ইচ্ছাকে এক না করলে দিব্যানুভূতির দ্বার উন্মুক্ত হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলেছেন : "জলের উপর কেবল ভাসলে (ঈশ্বরকে) পাওয়া যায় না।" মনে ঈশ্বরলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগানো, আর আকাঙ্ক্ষাকে দৃঢ় বা তীব্র ক'রে ঈশ্বরে তন্ময় হয়ে যাওয়া ঠিক এককথা নয়। বরং একটি অপরটির পরিপূরক। মন ও মুখ এক ক'রে লক্ষ্যে পৌঁছানোই দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রতিটি মানুষকে বৈচিত্র্যের মাঝে একত্বকে খুঁজে বার করার কথা বলেছেন। দ্বন্দ্ব, কলহ ও বিচার ইহবাহ্য, সত্যানুসন্ধান ও তত্ত্বোপলব্ধি সারকথা।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

॥ বিষয়বুদ্ধিতে ঈশ্বরের দর্শন হয় না ॥

"রামকৃষ্ণ। * * বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে তাঁকে দর্শন হয় না। দেশালয়ের কাঠি যদি ভিজে থাকে, হাজার ঘসো, কোন রকমেই জ্বলবে না, কেবল একরাশ কাঠি লোকসান হয়। বিষয়াসক্ত মন ভিজে দেশলাই।

শ্রীমতী (রাধিকা) যখন বললেন, আমি কৃষ্ণময় দেখছি, সখীরা বললে, কৈ, আমরা তো তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি কি প্রলাপ বক্‌চো? শ্রীমতী বললেন, 'সখি, অনুরাগ-অঞ্জন চক্ষে মাখো, তাঁকে দেখতে পাবে'। (বিজয়ের প্রতি) শ্রীরামকৃষ্ণ: "তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের গানে আছে—

প্রভু বিনে অনুরাগ. ক'রে যজ্ঞ যাগ,
তোমারে কি যায় জানা!

এই অনুরাগ, এই প্রেম, এই পাকাভক্তি, এই ভালবাসা যদি একবার হয় তাহলে সাকার নিরাকার দুই সাক্ষাৎকার হয়।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ১ম ভাগ (১৩৬৬), পৃঃ ১০১

'বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে তাঁকে (ঈশ্বরকে) দর্শন হয় না'— শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এ' কথা অদ্বৈতবেদান্তবিচারীদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে বেশ মিল আছে। অদ্বৈতবাদীরাও (আচার্য শঙ্কর প্রভৃতি) বলেন, অজ্ঞানের লেশমাত্র থাকলে আত্মোপলব্ধি হয় না। গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলেছেন: "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মানি ভস্মাৎ কুরূতেঽর্জুন:"—আত্মজ্ঞানরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি মানুষের সকল কর্ম ভস্ম ক'রে দেয়। এর উদাহরণ দিয়েছেন তাঁরা জীবন্মুক্ত

জ্ঞানীর। পৃথিবীতে বেঁচে থাকাকালে যে মহামানবেরা মিথ্যাজ্ঞানের পারে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন, অথচ সাধারণ মানুষের মতোই সংসারের সকল কাজ করেন, তাঁদের স্বার্থদুষ্ট সকল কর্ম তখন ধ্বংস হয় বলতে তাঁরা বিশ্বকল্যাণের জন্যই কেবল কাজ করেন নিরাসক্তভাবে, স্বার্থকেন্দ্রিক কর্মচেষ্টা তাঁদের আর থাকে না। বেদান্তীরা প্রশ্ন করেছেন, 'কেন, জীবন্মুক্ত মহা-মানবদের তো শরীর থাকে, শরীর কর্মফলরূপ অজ্ঞানের জন্য, তাই জীবন্মুক্তির আশীর্বাদ পেলেও শরীররূপ অজ্ঞানলেশ থাকে, সুতরাং গীতার 'আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নি জ্ঞানীর সকল কর্ম ধ্বংস ক'রে এ'বাণীর সার্থকতা থাকে কোথায়? তাতে 'জীবন্মুক্তিবিবেক', 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি' ও অন্যান্য অদ্বৈতবেদান্তের গ্রন্থে যুক্তিপূর্ণ বিচার ক'রে প্রমাণ করা হয়েছে যে, কথাটি সত্য যে, অজ্ঞানলেশ বা এতটুকু অজ্ঞান থাকতে জ্ঞানালোকের প্রকাশ হয় না, অথচ জ্ঞানালোকের প্রকাশে সকল অন্ধকার বিনষ্ট হয়। কিন্তু শরীর থাকলে বা না থাকলেই কি, জীবন্মুক্ত জ্ঞানীর তাতে কোন ক্ষতি হয় না, প্রারব্ধভোগ দূরে হ'লে অজ্ঞান-লেশরূপ শরীর আপনিই নষ্ট হ'য়ে যায়। আচার্য শঙ্কর বেদান্তদর্শনের 'তত্তু সমন্বয়াৎ' এ চতুর্থ সূত্রের ভাষ্যে সকল সন্দেহ দূর ক'রে বলেছেন, জীবন্মুক্ত আত্মজ্ঞানীর কাছে শরীর অশরীর ব'লে মনে হয়, কেননা নিরাসক্ত তার জীবন এবং ব্রহ্মজ্ঞানে চিরপ্রদীপ্ত থাকার জন্য শরীরজ্ঞান তখন নগন্য ব'লে মনে হয়। ব্রহ্মজ্ঞান না হ'লে সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে এ'তত্ত্ব অনুভব করা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ'সব কথা বলেছেন সাধারণ স্বার্থজ্ঞানবিলাসী দ্বৈতবুদ্ধি মানুষকে লক্ষ্য ক'রে, জীবন্মুক্তকে লক্ষ্য ক'রে নয়। মায়িক বিষয়কে যারা জীবনের লক্ষ্যবস্তু বলে মনে ক'রে সমগ্র জীবনে বিষয়দৃষ্টি নিয়ে বাস করে, তাদের পক্ষে ঈশ্বরদর্শনের (মুক্তির) তাহলে উপায় কি? বাসনা-কামনার আসক্তি থাকবে, অজ্ঞানের বন্ধনও থাকবে, অর্থাৎ নিরাসক্তি ও আসক্তি—আলো ও ছায়া পাশাপাশি থাকবে এ'রকম হয় না। ভোগের আসক্তি যতক্ষণ না ত্যাগরূপ নিরাসক্তির আগুনে পুড়ে ছাই হয় ততক্ষণ মুক্তির আলোক সুদূরপরাহত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীর সারমর্ম এই যে, ভাঙাগড়ার সংসারে সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী—আজ আছে, কাল নাই। গীতায় ও উপনিষদে একেই অশ্বত্থবৃক্ষ বলা হয়েছে। অশ্বত্থ কিনা যা আজ আছে—কাল নাই। প্রতিটি

মানুষের বিবেক-বুদ্ধি আছে পরমতত্ত্ব বুঝার জন্য, কিন্তু ভোগের মোহ ও আসক্তি তাড়না এমনই প্রবল যে, বিবেকপ্রসূত বিচার তখন আর ক্রিয়াশীল হয় না। তার জন্য মানুষ অনিত্যকে নিত্য ভেবে সংসারের বিষয়ের প্রতি আসক্ত হয় ও ভোগেই আনন্দ পায়। কিন্তু সেই ভোগের আনন্দ ক্ষণিক। তাই কিছুদিন পরে আবার নিরাশার সাগরে ডুবে সে দুঃখে মুহ্যমান হয়। আনন্দ ও নিরানন্দ—সুখ ও দুঃখ পার্থিব সংসারের ধর্ম; এরা স্রোতধারার বা আলোক ও ছায়ার মতো আসে, আবার যায়। এদের সৃষ্টি হয়, আবার নাশ হয়। গ্রীসীয় দার্শনিক হেরাক্লিটাসের কথা: 'We cannot bathe twice in the same river'—'একই নদীর জলে আমরা দু'বার স্নান করি না', কেননা গতিরুচ্ছল নদী অবিরত ছুটে চলে, চলাই তার স্বভাব। তেমনি চলমান সংসার ও বিষয়কেই বাসনাবিলাসী মানুষ স্থির, ধীর, নিত্য ও সার ভাবে—যে ভাবটা তার ঠিক নয়। ঈশ্বরদর্শনই তার জীবনের লক্ষ্য, নিরাসক্তিময় মুক্তিই তার জীবনে কাম্য, কিন্তু এ' সকল তত্ত্বের কথা সে ভুলে যায়। আসল তত্ত্ব সে ভুলে যায় বিষয়বুদ্ধির জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, "বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে তাঁর (ঈশ্বরের) দর্শন হয় না।" এ' দর্শনই প্রত্যক্ষদর্শন বা প্রত্যক্ষানুভূতি। আত্মার প্রত্যক্ষানুভূতির আশীর্বাদ মানুষের সকল বন্ধন ও আসক্তি দূর করে; আবার বিষয়াসক্তই মানুষকে দিব্যানুভূতি থেকে বঞ্চিত করে।

বিষয় ও বিষয়ীকে নিয়েই সংসার। বিষয়কে যিনি গ্রহণ ও ভোগ করেন তিনি বিষয়ী। বিষয়ীকে সাহায্য করে তার ইন্দ্রিয়। বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এ' পাঁচটি ইন্দ্রিয়। এ'পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের নাম কর্মেন্দ্রিয়। এরা মানুষকে ব্যবহারিক জীবনে কর্মে নিয়োজিত করে। পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ছাড়া পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ। তা ছাড়া প্রাণাদি পঞ্চ প্রাণ আছে, আর আছে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার চারটি অন্তঃকরণের বৃত্তি। সাংখ্যদর্শনে এদের পরিচয় দিয়েছেন মুনি কপিল। সদানন্দ যতি 'বেদান্তসার'-গ্রন্থেও এদের সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। ইন্দ্রিয় করণ বা যন্ত্র, যন্ত্রী মানুষ এদের সাহায্য নিয়ে রূপ-রস-গন্ধময় পৃথিবীর সকল বস্তু ও বিষয় ভোগ করে। ভোগের পিছনে থাকে তৃষ্ণা, ইচ্ছা বা আসক্তি। তৃষ্ণা, ইচ্ছা বা আসক্তির আধার মন। অথবা বলা যায়, মনই তৃষ্ণা বা

আসক্তি প্রভৃতি সৃষ্টি করে। বাসনা, তৃষ্ণা ও আসক্তি একই কথা। আসক্তিই আকর্ষণ। আসক্তিই মোহের ও ভোগের আকর্ষণস্বরূপ। মানুষের মধ্যে ভোগের আসক্তি থাকেই, আর আসক্তি থাকার জন্য মানুষ বিষয় ভোগ করে।

স্বার্থময় ভোগ ও নিঃস্বার্থময় ত্যাগ আলোক ও অন্ধকারের মতো পরস্পর-বিরুদ্ধ। একটিতে আসক্তির বন্ধন ও অপরটিতে নিরাসক্তির মুক্তি ও আনন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "দেশলাইয়ের কাঠি যদি ভিজে থাকে, হাজার ঘসো, কোন রকমেই জ্বলবে না, কেবল একরাশ কাঠি লোকসান হয়। বিষয়াসক্ত মন ভিজে-দেশলাই।" বিষয় দু'রকম—ভালো ও মন্দ। ভালো বিষয়—যেমন ঈশ্বরচিন্তা, ইষ্টের ধ্যান ও ইষ্টদেবতায় মনকে স্থির করা, লোককল্যাণ করা প্রভৃতি। ভালো বিষয় মনে সচ্ছতা ও উদারতা সৃষ্টি করে। মনকে পরিশুদ্ধ করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'হিংচে শাকের মধ্যে নয় ও মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়'। এর অর্থ হিংচে ও মিছরি বিষয়বস্তু হ'লেও সর্দি নষ্ট করে, মানুষের উপকারসাধন করে।

মন কোন-না-কোন বিষয়কে গ্রহণ করেই। মন যদি পবিত্র ও কল্যাণকর বিষয়কে আশ্রয় করে, তবে তার স্বরূপ ও স্বভাব হয় পরিশুদ্ধ। মন যদি কোন মন্দ বিষয়কে গ্রহণ করে, তবে তা হয় অপবিত্র। তাছাড়া মনের স্বভাবই চঞ্চল ও তরঙ্গময়। তাই একটিকে ত্যাগ করলেও মন কোন-না-কোন আর একটি বিষয় বা বস্তুকে আশ্রয় করে। আত্মাকে উপলব্ধি করতে গেলে মনকে আত্মাতে স্থির বা কেন্দ্রিভূত করতে হয়। আত্মা তখন মনের বিষয় হয়। বিষয়কে নিয়েই মনের বৃত্তি। কিন্তু আত্মাকে নিয়ে মনের আত্মবিষয়ক বৃত্তি হ'লে মনে অন্য বৃত্তি আর থাকে না। মনের পরিশুদ্ধ রূপই চৈতন্য। মন স্বরূপে স্থিত হলে তা চৈতন্যরূপে প্রকাশ পায়।

বিষয়বুদ্ধিই মায়া। বিষয়বুদ্ধি দেহকেন্দ্রিক ও ভেদকেন্দ্রিক। পূর্বেই বলেছি যে, আত্মাবিষয়ক বুদ্ধি চৈতন্যকেন্দ্রিক, সুতরাং তা মায়া নয়, তা বন্ধনের কারণ নয়। তাই আত্মা মন ও বুদ্ধির বিষয় হলেও অবিষয় বলতে আত্মা মায়ার বিষয় নয়।

আত্মা থেকে জীব ও জগৎ ভিন্ন এই প্রত্যয় ও বুদ্ধিই মায়া বা মিথ্যাজ্ঞান। পার্থক্যবোধই অজ্ঞান। অজ্ঞান ভুলজ্ঞান। ব্রহ্মসত্তা থেকে

যখনই জীবসত্তা ও বিশ্বসত্তাকে আমরা পৃথক ব'লে ভাবি তখনই সে ভাবনা আমাদের যথার্থ হয় না। বেদান্ত বলে, ব্রহ্মই একমাত্র বিষয়, আর সব অবিষয়। এখানে বিষয় বলতে জীবনের পরমলক্ষ্য ও সারবস্তু, আর সব অবিষয় কিনা ভেদজ্ঞানের বস্তু বা মিথ্যাবস্তু। ঈশ্বর, আত্মা বা ব্রহ্মের চিন্তাকে বাদ দিয়ে, কিংবা ঈশ্বর, আত্মা বা ব্রহ্মবস্তু থেকে জীব ও জগৎকে পৃথক ভেবে কেবল সাংসারিক বস্তু নিয়ে ব্যবহার করলে বিষয়বুদ্ধির অধীন হ'তে হয়। এ বিষয়বুদ্ধি দেহী (আত্মা) থেকে দেহকে আলাদা ব'লে চিন্তা করায়। এরূপ চিন্তা করার নাম অজ্ঞান, ভুলজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান। এ' চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের ব্যবহার বা কর্মও সে'রকম হয়। তাছাড়া কর্মের পিছনে থাকে কর্মের ফলচিন্তা। কর্ম তখন নিষ্কাম হয় না। ফলচিন্তা সৃষ্টি করে স্বার্থযুক্ত ভোগের আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিও কোনদিন হয় না—'হবিষা কৃষ্ণবর্ণের ভূয়ো এবাভিবর্ধতে'—অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে অগ্নিশিখা বাড়তেই থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ দেহি দেহি কামনাকেই বিষয়বুদ্ধি বলেছেন। এই বিষয়বুদ্ধি মনকে মলিন ক'রে এবং বুদ্ধিতে ভেদ সৃষ্টি ক'রে; বুদ্ধি নাশ করে। বুদ্ধি কিনা সদসদ্‌বিচারবুদ্ধি। বুদ্ধির নাশ হলেই মৃত্যু—"বুদ্ধিনাশাৎ প্রনশ্যতি"।

বুদ্ধিনাশের পর মৃত্যু। এ' মৃত্যু কি? এ' কি দেহের মৃত্যু? এ' মৃত্যুর নাম যথার্থজ্ঞান থেকে বিচ্যুত হ'য়ে মিথ্যাজ্ঞানের অধীন হওয়া। যে মানুষ তার যথার্থ স্বরূপ (আত্মস্বরূপকে) না জেনে সংসারে ভুলজ্ঞান নিয়ে বাস করে সে মানুষ দেহ নিয়ে বেঁচে থাকলেও সংসারে মৃত। ভুলজ্ঞানের বেসাতি করতে করতে মানুষের বিবেকবুদ্ধি এমনই অসাড় হয় যে, সে সত্যবস্তুর আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হয়। জীব যে শিব, নর যে নরনারায়ণ—এ' জ্ঞানদীপ আর তার হৃদয়মন্দিরে প্রজ্জ্বলিত হয় না। না-জ্বলার অন্ধকারই বিষয়বুদ্ধি। তার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, বিষয়বুদ্ধি তো পরের কথা, বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে ঈশ্বরদর্শন হয় না, আর দর্শনের ফলশ্রুতিস্বরূপ মুক্তিলাভও হয় না। মুক্তি কিনা সংসারের মায়াবন্ধন থেকে নিষ্কৃতি লাভ। মুক্তি ভুলজ্ঞান দূর হয়ে সত্যজ্ঞানের প্রকাশ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এ'কথা বলার উদ্দেশ্য—সংসারে মানুষের যাত্রা যখন শুরু হয়েছে তার লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য, তখন সে যাত্রা একদিন পূর্ণ হবে

জীবনে। মোটকথা জীবন যে সত্যকার ভাবে মহাভাগবত জীবন এ' তত্ত্ব নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করা উচিত। আত্মার উপলব্ধি লাভ করার চেষ্টার নাম সাধনা। চেষ্টার নামই যত্ন বা অভ্যাস। এই অভ্যাসের সঙ্গে থাকে বৈরাগ্য। স্বার্থদুষ্ট দেহ ও ভোগ-কেন্দ্রিক কামনায় বিতৃষ্ণা ও স্বরূপজ্ঞানের প্রতি আসক্তির নাম বৈরাগ্য। জ্ঞানতৃষ্ণাই ভেদবুদ্ধির অবসান ঘটায়, আর পার্থিব বিষয়ভোগের প্রতি তৃষ্ণাই জীবনে অনর্থ ঘটায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিষয় ভোগতৃষ্ণাকেই ভিজে দেশলাই বলেছেন। ভিজে দেশলাই যেমন জ্বলে না, বা আগুন সৃষ্টি করে না, পার্থিব বিষয়াসক্তি তেমনি মানুষের মনে ঈশ্বর দর্শন করার উদ্দীপনা জাগায় না। উদ্দীপনার দীপশিখা না জ্বলুলে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখা যায় না। ঈশ্বরদর্শন ও আত্মানুভূতি এককথা। ভারতীয় দৃষ্টিতে দর্শন ও অনুভূতি সমপর্যায়ভুক্ত।

মহাত্মা বিজকৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "দর্শন কেমন ক'রে হয়?" শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন: "চিত্তশুদ্ধি না হ'লে (ঈশ্বরদর্শন) হয় না। কামিনী-কাঞ্চনে মন মলিন হ'য়ে আছে, মনে ময়লা পড়ে আছে।" মন ও চিত্তশুদ্ধি কাকে বলে? বেদান্ত মনকে অন্তঃকরণের একটি বৃত্তি বলেছে। বৃত্তি মনঃসমুদ্রের তরঙ্গ। সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ বুকে যেমন অসংখ্য তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, মনোসমুদ্রেও তেমনি। বৃত্তি সৃষ্টি হবার কারণ বিষয়। বিচিত্র বিষয়ের উপকরণ দিয়ে বিশ্বসংসার সাজিয়েছেন ঈশ্বর বা মহামায়া। ইন্দ্রিয়ের পথে মানুষ বিশ্বের ঐ বিচিত্র বিষয়ের সৌন্দর্য গ্রহণ করে ও ভোগ করে। ভোগ করে সুখ ও আনন্দ পাবার জন্য। কিন্তু বিচারের দৃষ্টিতে ঐ সুখ ও আনন্দভোগ ক্ষণিকের জন্য। ক্ষণিকের আনন্দকেই সাধারণ মানুষ শাশ্বত মনে ক'রে ভুল করে। এ' ভুলই ভ্রান্তি। ভ্রান্তির অপর নাম ভুলজ্ঞান—সেকথা বলেছি। তাই বিচারপথের যারা পথচারী তারা মনের ভ্রান্তিকে দূর করার চেষ্টা করে। মনের ভ্রান্তিকে দূর করতে হ'লে বিক্ষিপ্ত বা চারদিকে ছাড়ানো মনকে একটি বিষয়ে স্থির করতে হয়। এ একটি বিষয় হলো ঈশ্বর বা আত্মবস্তু। ঈশ্বরে বা আত্মায়, অথবা অভিপ্রেত ইষ্ট-দেবতায় মনকে স্থির করলে মনের সকল বৃত্তির অবসান হয়। তখন মন শান্ত হয়। মনের শান্ত অবস্থার নাম চিত্তশুদ্ধি। শুদ্ধ চিত্তে বৃত্তিচাঞ্চল্য থাকে না। নিবাত নিষ্কম্প স্থানে প্রদীপের শিখা যেমন স্থির ও অচঞ্চল থাকে,

বৃত্তিহীন মনের অবস্থাও তেমনি। মন তখন ইষ্টদেবতাকে আশ্রয় ক'রে তদকারকারিত কিনা সেই ইষ্টদেবতার আকার ধারণ করে। মন তখন ইষ্টদেবতায় রূপান্তরিত হয়। মনচৈতন্য ও ইষ্টদেবতাচৈতন্যের সাগর তখন একাকার। এই অবস্থায় ইষ্ট দর্শন হয়। এ' দর্শনকে ব্রহ্মানুভূতিও বলা যায়। বৃত্তিহীন মনে বা অন্তঃকরণে শুদ্ধচৈতন্যবৃত্তিরই প্রকাশ দেখা যায়। শুদ্ধচৈতন্যবৃত্তি নামে মাত্র বৃত্তি। শুদ্ধচৈতন্যরই তখন প্রকাশ ও স্থিতি। এ' স্থিতির নাম ব্রাহ্মীস্থিতি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এ' স্থিতির কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।

*　　*　　*

এষা বাহ্মীস্থিতিঃ * * ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥

—গীতা ২।৭১-৭২

শ্রীধর স্বামী বলেছেন, ঈশ্বরের আরাধনা ক'রে শুদ্ধান্তঃকরণ পুরুষ ব্রহ্ম-জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করেন। 'বিহায় কামান্'—পার্থিব বিষয়ের উপর থেকে তাই সকল কামনা ও আসক্তিকে সরিয়ে নিতে হয়। মন যখন শান্ত হয়। তখনই শান্তি। কামকামীরা অর্থাৎ কামনার ও ভোগবাসনার দাস যারা তারা জীবনে শান্তি পায় না।

মনের শুদ্ধিকেই চিত্তশুদ্ধি বলে। বেদান্তে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার এ' চারটিকে অন্তঃকরণের বৃত্তি বলে। অন্তঃকরণের বৃত্তি চারটি, সুতরাং মন ও চিত্ত দুটি পৃথক বৃত্তি, বা দুটি অন্তঃকরণের কর্ম। তাহলেও মন ও চিত্ত, অথবা মন ও বুদ্ধি এ'দুটি বৃত্তিকে অনেক ক্ষেত্রে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। আচার্য শঙ্কর কেনোপনিষদের ভাষ্যে মন-সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন : "মন ইত্যন্তঃ-করণং বুদ্ধিমনসোরেকত্বেন গৃহ্যতে" ; কিংবা "মনঃ সর্বকরণসাধারণম্ সর্ববিষয়-ব্যাপকত্বাৎ * *" প্রভৃতি। মন বা চিত্ত বা বুদ্ধি কেন মলিন হয় সে সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'কামিনী-কাঞ্চনে মন মলিন হয়'। কামিনীর অর্থ আসক্তি বা কামনা। কামনা ও আসক্তি এক কথা। আবার আসক্তি ও ইচ্ছা সমানার্থক। ইচ্ছার জন্যই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্য অর্ধনারীশ্বর রূপ ধারণ করেছিলেন : "একোহহং বহু স্যাম", অর্থাৎ তিনি (সগুণব্রহ্ম) ইচ্ছা করলেন—'আমার সৃষ্টির সহচারিণী হোক', 'আমি এক আছি

(স্বরূপে), কিন্তু (সৃষ্টির জন্য) বহু হব'। সহচারিণী ও বহু সৃষ্টি। শুদ্ধব্রহ্মে মায়ার (ইচ্ছার) লেশমাত্র নাই; মায়ার বিকাশ সগুণব্রহ্ম ঈশ্বরে। দ্বৈতকল্প নাই সৃষ্টি। আচার্য শঙ্কর সৃষ্টিকে ব্যবহারিকভাবে স্বীকার করেছেন ও বলেছেন, ত্রিকালস্থায়ী পারমার্থিক-সত্তা সৃষ্টির নাই, কিন্তু ব্যবহারিক-সত্তা সৃষ্টির আছে। তখন স্রষ্টাও আছে। তবে ঔপনিষদিক দৃষ্টিতে এ'দুয়ের প্রাণবিন্দু এক। একই চৈতন্যসত্তা দেশকালের অতীত হয়েও দেশ ও কালের মধ্যে অনুস্যূত। অনুস্যূত-চৈতন্যই ব্যাপকচৈতন্য ব্রহ্ম। ব্যপকচৈনন্যই সকল-কিছুর আধারসত্তা। আধারসত্তার অপর নাম স্বরূপসত্তা। স্বরূপসত্তার উপলব্ধি না হ'লে, অথবা এক ও অখণ্ড স্বরূপসত্তাকে প্রাণে প্রাণে ও বোধে বোধ বলে না বুঝলে বিষয়বুদ্ধি ও সংস্কারের নাশ হয় না। সংস্কারের রূপান্তর ও পরিশুদ্ধি হলেই ঈশ্বরদর্শন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে তাঁকে (ঈশ্বরকে, বা আত্মাকে) দর্শন (উপলব্ধি) হয় না।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আরও বলেছেন: "ভক্তির দ্বারাই তাঁকে (ঈশ্বরকে) দর্শন হয়। কিন্তু পাকাভক্তি, প্রেমাভক্তি, রাগভক্তি চাই। সেই (পাকা) ভক্তি হলেই তাঁর উপর ভালবাসা আসে; যেমন ছেলের মার উপর ভালবাসা, মার ছেলের উপর ভালবাসা, স্ত্রীর স্বামীর উপর ভালবাসা" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ১০০)। পাকাভক্তি, প্রেমাভক্তি বা রাগভক্তির নাম ঈশ্বরের উপর নিবিড় ভালবাসা ও আকর্ষণ। এই প্রেম বা ভালবাসার উদাহরণ দিতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীমতী রাধিকা ও তাঁর সখীদের কথা বলেছেন: "শ্রীমতী যখন বললেন, 'আমি কৃষ্ণময় দেখছি,' সখীরা বললে, 'কৈ, আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না। তুমি প্রলাপ বকচো ? শ্রীমতী বললেন, 'সখি, অনুরাগ-অঞ্জন চক্ষে মাখো, তাঁকে (শ্রীকৃষ্ণকে) দেখতে পাবে'।"

অনুরাগ-অঞ্জন বলতে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমাভক্তি—যে প্রেমাভক্তি ঈশ্বর-দর্শনকে সচল ও সুগম করে। অথবা আপনাকে স্বরূপত উপলব্ধি করার ইচ্ছা ও আকুলতার নাম অনুরাগ-অঞ্জন। ইচ্ছা ও আকুলতা না থাকলে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গকে প্রলাপ ব'লে মনে হয়। শ্রীমতী রাধিকা বললেন, 'আমি সব কৃষ্ণময় দেখছি।' কৃষ্ণময় ও ব্রহ্মময় এককথা। ঈশ্বরদর্শন হ'লে সর্বত্র ঈশ্বরের সত্তা ও মহিমা উপলব্ধি হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, নিত্যই (ঈশ্বরই) আপন

মাধুর্যরস উপভোগ করার জন্য লীলায় অবতীর্ণ হন। তাই নিত্যে যিনি, লীলারূপী তিনিই। লীলার প্রতিটি উপকরণে তাই নিত্যের মাধুর্যরস মাখানো থাকে। ভক্ত বা সাধক সেই মাধুর্যরস উপভোগ ক'রে আনন্দে আপ্লুত হন। শ্রীমতী রাধিকারও তাই হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবানের ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে সমগ্র বিশ্বের অণু-পরমাণুতে প্রেমদীপ্ত সাধক তাই শ্রীকৃষ্ণভগবানের সত্তা উপলব্ধি করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলেছেন: "অনুরাগ-অঞ্জন চক্ষে মাখো, তাঁকে দেখতে পাবে।"

চক্ষু ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের কাজ বহির্জগতের সৌন্দর্যকে গ্রহণ ও পরিবেশন করা। কঠোপনিষদে (২।১।১) আছে,

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।

ইন্দ্রিয়ের গতি সর্বদাই বাইরের দিকে, সুতরাং বাহ্য-সৌন্দর্যই সে পরিবেশন করে, অন্তরাত্মার দিকে তার দৃষ্টি ও গতি অবহেলিত থাকে। মানুষ তাই বাইরের জগতের আপাতমধুর ভোগসুখে আসক্ত হয়, ঈশ্বরকে ও হৃদয়পুণ্ডরিকে চৈতন্যময় আত্মার সন্ধান সে নিতে পারে না, সুতরাং পরম-রহস্যময় অধ্যাত্মতত্ত্বের স্পর্শলাভ থেকে বঞ্চিত থাকে। কিন্তু ঈশ্বরানুরাগ-অঞ্জন যদি চক্ষে মাখানো থাকে তবে অন্তরের দিকে মানুষের দৃষ্টি যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সে বোঝে যে, অন্তররাজ্যের মহিমময় আসনে যিনি প্রতিষ্ঠিত, বিশ্ব-চরাচরের সর্বত্র সর্বক্ষণ তিনি চৈতন্য-রূপে পরিব্যপ্ত। "কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মান-স্বরূপ মৈক্ষৎ, আবৃতচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।" কোঠাপরিষৎ ২।১।১) ; অর্থাৎ যাঁরা অমৃত আত্মার উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করেন তাঁরা আবৃতচক্ষু কিনা বাহ্য-সৌন্দর্যের দিক থেকে মন ফিরিয়ে নিয়ে অন্তারাত্মার দিকে দৃষ্টি স্থির করেন। যাঁরা অন্তরাত্মায় দৃষ্টি স্থির করেন তাঁরাই ধীর ও জ্ঞানী—"কশ্চিদ্ধীর :…"।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "অনুরাগ-অঞ্জন চক্ষে মাখো, তাঁকে দেখ্‌তে পাবে।" অনুরাগ-অঞ্জন চোখে দিলে দৃষ্টিকোণ অনুরাগময় হয়। তখন সকল বস্তুকেই ঈশ্বরের প্রকাশ ও মাধুর্য ব'লে মনে হয়। তখন মনে হয়, ঈশ্বরই বস্তু ও সর্বত্র তিনিই রয়েছেন; ঈশ্বরই যন্ত্রী, আর সব যন্ত্র। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয় যে, ঈশ্বর ব্যতীত অবস্তু যাদের বলি, তারাও ঈশ্বর ছাড়া অন্য কিছু নয় —'ঈশা বাস্যমিদং সর্বন্'। তখন আত্মায় স্থির মন চৈতন্যে রূপান্তরিত হয়।

চৈতন্যময় হয় তখন দৃষ্টি, মন ও বুদ্ধি এবং সে চৈতন্যে প্রতিফলিত হন ব্রহ্মচৈতন্য। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এ' প্রসঙ্গে চশমার উদাহরণ দিয়েছেন। বলেছেন, লাল চশমা চোখে দিলে সকল বস্তুকে লাল ব'লে প্রতিয়মান হয়; নীল চশমা চোখে দিলে সকল জিনিসকে নীল বলেই দেখায়; তেমনি ভক্তি, প্রেম ও ঈশ্বরানুরাগের চশমা চোখে দিলে বিশ্বচরাচরকে ঈশ্বরের দিব্যপ্রকাশ ব'লে অনুভব হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন: "ঈশ্বরে ভালবাসা এলে সংসারাসক্তি—বিষয়বুদ্ধি একেবারে যাবে।" মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণকে তিনি বলেছিলেন, "তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের গানে আছে,

প্রভু বিনে অনুরাগ ক'রে যজ্ঞ যাগ
তোমারে কি যায় জানা!"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বলার উদ্দেশ্য, প্রভু বা ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অনুরাগ না থাকলে শুধুই সাধনকর্ম ও যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করলে ঈশ্বরের স্বরূপ জানা যায় না। সাধিকা মীরাবাঈ বলেছেন—'বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা'। নন্দলালা শ্রীকৃষ্ণ প্রেমস্বরূপ—'রসো বৈ সঃ'। এ রস 'ব্রহ্মস্বাদসহোদরঃ'। সুতরাং রসাপ্লুত প্রেম বা শুদ্ধাভক্তি ছাড়া ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। এই পাওয়ার অর্থ আত্মার আত্মা—প্রাণের প্রাণ ব'লে ভগবানের স্বরূপকে উপলব্ধি করা। "এই প্রেম, এই পাকা-ভক্তি, এই ভালবাসা যদি একবার হয় তাহলে সাকার নিরাকার দুই সাক্ষাৎকার হয়।" সাকার ও নিরাকার একই নিত্য চিন্ময় সত্তার অভিন্ন রূপ বা প্রকাশ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, যিনি সাকার, তিনিই নিরাকার। একেরই দুই রূপ। আবার দুই রূপেরও তিনি অতীত—অস্তিস্বরূপ চিদ্‌সত্তামাত্র—"অস্তিত্যেব উপলব্ধব্যম্।

মোটকথা জীব ব্রহ্মেরই স্বরূপ। সূর্যকিরণ সূর্যেরই অভিন্ন অংশ, তরঙ্গ যে জলেরই তরঙ্গ এবং তরঙ্গ যে জল ছাড়া অন্য কিছু নয়—এই জ্ঞান না হ'লে জীবের স্বরূপজ্ঞান হয় না। জ্ঞান বা বোধ একটাই, তবে প্রকাশ তার ভিন্ন ভিন্ন হ'তে পারে। জলের উপর একটি লাঠি ফেলে দিলে একই জলকে মনে হয় এদিকের জল ও ওদিকের জল, কিন্তু লাঠিটা তুলে নিলে প্রতীত হয় একই জল। তেমনি জীব ও ব্রহ্ম একই চৈতন্যের সাগর, নাম-রূপ উপাধি বা লাঠি দিয়ে তাকে ভাগ ক'রে বলি দুটো। নইলে সবই একাকার। উপাধিই মায়া। উপাধিই বিষয়বুদ্ধির সীমারেখা। সীমা দিয়ে

ভাগ ক'রে আমরা অসীমকে বলি সসীম। তেমনি জীবাত্মা থেকে ভিন্ন ক'রে বলি পরমাত্মা। তাই উপাধি বা নাম-রূপের সীমাকে মুছে ফেল্‌তে হয়। আর তখনই অনুভব হয় যে, সব একাকার, সব একই। সবই এক ও অখণ্ড চৈতন্যের সাগর।

চৈতন্যের সাগরকে সকল পথ ও সকল দিক থেকেই উপলব্ধি করা যায়। পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, মিছরির রুটি যেদিক থেকে খাওয়া যায় সেদিক থেকেই মিষ্টি লাগে। মিছরির রুটির সোজা ও উল্টো সবই সমান। তেমনি ঈশ্বরদর্শন বা আত্মোপলব্ধি যে-কোন সাধনার পথেই লাভ করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন. জ্ঞানবিচারেও তাঁকে পাওয়া যায়, ভক্তিপথেও তাঁকে পাওয়া যায়। "তিনি জ্ঞানসূর্য। তার একটি কিরণে এই জগতে জ্ঞানের আলো পড়েছে, তবেই আমরা পরস্পরকে জান্‌তে পারছি, আর জগতের কত রকম বিদ্যা উপার্জন করৃছি। তাঁর আলো যদি তিনি নিজে তাঁর মুখের উপর ধরেন, তাহলে দর্শন লাভ হয়। সার্জন সাহেব রাত্রে আঁধারে লণ্ঠন হাতে ক'রে বেড়ায়, তার মুখ কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুখ দেখতে পায়, আর সকলে পরস্পরের মুখ দেখতে পায়। যদি কেউ সার্জনকে দেখতে চায় তাহলে তাকে প্রার্থনা করতে হয়, 'সাহেব, কৃপা ক'রে একবার আলোটি নিজের মুখের উপর ফিরাও. তোমাকে একবার দেখি।"

প্রেমানুরাগ এই প্রার্থনার ভাব হৃদয়ে সৃষ্টি করে। তাই জ্ঞানবিচারের একটি পথ ও প্রেমাভক্তির একটি পথ। অবশ্য পথ আরও আছে—যোগের পথ ও কর্মের পথ। পথ ভিন্ন ভিন্ন হ'লেও লক্ষ্য এক। নাম ও সাধনা ভিন্ন ভিন্ন হলেও চরমতত্ত্ব এক।

তাই মনে রাখ্‌তে হবে যে. কি জ্ঞানবিচারের পথ, কি প্রেমাভক্তির পথ, কি যোগসাধনের পথ ও কি কর্মের পথ—সকল পথেই বাধা বা অন্তরায় বিষয়-বুদ্ধি বা বিষয়াসক্তি। বিষয়াসক্তিই মায়া বা মিথ্যাজ্ঞান। এ মিথ্যাজ্ঞানের লেশমাত্র থাকলে সত্যজ্ঞানের প্রকাশ হয় না।. মেঘ না সরলে যেমন সূর্যকে দেখা যায় না, তেমনি বিষয়বুদ্ধি থাকলে চিত্ত শুদ্ধ হয় না এবং চিত্ত শুদ্ধ না হ'লে আত্মরহস্যের দ্বার উন্মুক্ত হয় না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

॥ ঈশ্বর-লাভের অনন্ত পথ ॥

"শ্রীরামকৃষ্ণ দেখ, অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ। যে-কোন প্রকারে হউক এ'সাগরে পড়তে পারলেই হ'ল। মনে কর—অমৃতের একটি কুণ্ড আছে। কোন রকমে এই অমৃত একটু মুখে পড়লেই অমর হবে—তা তুমি নিজে ঝাঁপ দিয়েই পড়, বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেমে একটু খাও, বা কেউ তোমায় ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক, একই ফল। একটু অমৃতের আস্বাদন করলেই অমর হবে।

অনন্ত পথ,—তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি—যে পথ দিয়ে যাও, আন্তরিক হ'লে ঈশ্বরকে পাবে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ (১৩৬৬), পৃঃ ১৭৫

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ ও বাণী অসাম্প্রদায়িক ও উদার। বিচিত্র সাধনা ও অনুভূতির ভিতর দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব উপলব্ধি করেছিলেন—মত ও পথ ভিন্ন ভিন্ন হ'লেও লক্ষ্য এক। সকল সাধন সার্থক হয় জীবনসিদ্ধি লাভ করলে। জীবনসিদ্ধির প্রকৃত রূপ আত্মানুভূতি। অনুভূতিতে জানা যায়, আত্মা অন্তর্যামীরূপে সকল প্রাণীতে ও বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে অনুস্যূত। বিকাশে বা নাম-রূপে ভিন্ন হলেও স্বরূপে এক ও অদ্বিতীয়। এই অনুভূতির নাম ঈশ্বরদর্শন বা আত্মদর্শন। এই অনুভূতিকে অনেকে আত্মজ্ঞান-লাভ বলেন, কেননা সাধনার চরম-পরিণতিতে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে লাভ ও অনুভূতি একার্থক। মুণ্ডক-উপনিষদের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর প্রাপ্তি ও লাভকে সমানার্থক বলেছেন। বলেছেন, প্রাপ্তি

ও লাভের অর্থ অজ্ঞানের নাশ ও জ্ঞানের প্রকাশ—"ন চ পরপ্রাপ্তিরবগমার্থক চ ভেদোঽস্তি ; অবিদ্যায়া অপায় এব হি পরপ্রাপ্তিরর্থান্তরম্।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন মত ও পথ ভিন্ন ভিন্ন। মতের ও পথের মধ্যেই দ্বন্দ্ব, লক্ষ্যে মতদ্বৈত নাই। লক্ষ্যকে তিনি বলেছেন 'অমৃত' বা 'অমৃত-সাগর'। তিনি বলেছেন: "দেখ, অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ। যে-কোন প্রকারে হউক এ'সাগরে পড়তে পারলেই হ'ল।" উপনিষদেও অমৃতের কথা আছে: 'অমৃতত্বং হি বিন্দতে', বা 'প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি। অথবা 'ঈশ্বর তং জ্ঞাত্বাদ্মৃতা ভবন্তি' (শ্বেতাশ্বতর ৩।৬)।" আচার্য শঙ্কর অমৃতকে ব্রহ্মচৈতন্য বলেছেন: "অমৃতা ভবন্তি ব্রহ্মৈব ভবন্তীত্যর্থঃ।" যাঁরা অজ্ঞানের পারে যান তাঁরা জ্ঞানী। তাঁরা ব্রহ্মস্বরূপ হন। ব্রহ্ম হওয়া আর ব্রহ্মস্বরূপের অনুভূতি লাভ করা এককথা। জীব যে শিব, জীব যে ব্রহ্ম. ব্রহ্মচৈতন্য ছাড়া জীবচৈতন্যের যে কোন পৃথক সত্তা নাই—এ'সত্য উপলব্ধি হয় অজ্ঞান জ্ঞানে রূপান্তরিত হ'লে। 'অজ্ঞান জ্ঞানে রূপান্তর' বল্‌তে পরমেশ্বর ওপরমচৈতন্য যে সর্বব্যাপক এ তত্ত্ব না জান্‌লে অজ্ঞান ও জান্‌লে জ্ঞান। না জানাকে জানা হ'লে না জানারূপ অজ্ঞান দূর হয়। তখন অজ্ঞান জ্ঞানরূপে প্রকাশ পায়।

বেদান্তের সিদ্ধান্ত হোল অমৃতকে লাভ কর্‌লে জীবন অমৃতময় হয়। 'ময়' (ময়ট) অর্থে প্রাচুর্য। অমৃতকে লাভ করলে কি তাহলে প্রচুর অমৃতের অধিকারী হওয়া যায়? তা নয়। অমৃতময় বস্তুতে অমৃতস্বরূপ। অথবা অমৃতময় হওয়ার নাম মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়া। 'অমৃতাঃ মরণরহিতাঃ'। জন্ম মৃত্যুর চক্রই সংসার। আচার্য শঙ্কর একে বলেছেন সংসারগতি। বাসনা সৃষ্টি করে সংস্কার, সংস্কার সৃষ্টি করে অবিদ্যা ও অবিদ্যার ফলশ্রুতি সংসার আচার্য শঙ্কর বলেছেন: "অবিদ্যাকামকর্মলক্ষণং সংসারবীজম্।" অবিদ্যা বা অজ্ঞানই সংসারসৃষ্টির বীজ। এ'বীজের নাশ হ'লে মুক্তি—'ন পুনঃ সংসার-মাপদ্যতে'। অন্ধকারের অপ্রকাশ ও আলোকের প্রকাশের নাম নাশ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, অমৃতসাগরে যাওয়াই মনুষ্যজীবনের চরমলক্ষ্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো যে, অমৃতসাগরে যাওয়া বা অমৃততত্ত্ব লাভ করা যদি মানুষের লক্ষ্য হয় তবে সে লক্ষ্য উপনীত হবার প্রবৃত্তি আসে না কেন মনে? প্রবৃত্তি আসে না আসক্তির জন্য। সংসারে আসক্তি মানুষকে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা বঞ্চিত করে।

অবশক্তিই সংসার—মিলন-বিচ্ছেদের ক্ষেত্র। স্বার্থযুক্ত আসক্তির জন্য ভুলে যাই নিজেদের স্বরূপকে। এ ভোলার নাম বিচ্ছেদ। পুনরায় বিবেকের আলোকস্পর্শে সৃষ্টি হয় মিলনের আকুতি। অনন্তকাল চলে এই মিলন-বিচ্ছেদের আলোরছায়ার খেলা। তবে খেলার যেমন শুরু আছে, তেমনি শেষও আছে। খেলার সমাপ্তি ঘটে জীবনসার্থকতার উপলব্ধি হ'লে। খেলার শেষ হয় অমৃতসাগরে উপনীত হ'লে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "অমৃতসাগরে যাবার অনন্ত পথ। তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি। যে পথ দিয়ে যাও, আন্তরিক হ'লে ঈশ্বরকে পাবে।" অমৃতসাগরই ঈশ্বর। ঈশ্বরের স্বরূপ অস্তি, ভাতি, প্রিয়, বা সৎ, চিৎ আনন্দ। সকল প্রাণীতে ও সকল বস্তুতে আছেন বলে ঈশ্বর সৎ। তিনি প্রকাশ পান ও সকল বস্তুকে প্রকাশ করেন ব'লে চিৎ এবং তাঁর প্রকাশেই আনন্দ। ঈশ্বরের সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপের নাম নিত্য ও তাঁর বিচিত্র বিকাশের নাম লীলা। নিত্য ও লীলা টাকার এপীঠ ওপীঠ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, যিনি নিত্য তাঁরই লীলা। নিত্যই আপন মাধুর্য উপলব্ধি করার জন্য লীলায় অবতীর্ণ হন। অবতারতত্ত্বের মর্মকথা তাই।

মানুষ বিরহের মধ্য দিয়ে মিলনের মাধুর্য উপলব্ধি করে; সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সে স্রষ্টার পাদপীঠে উপনীত হয়; বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে ঐক্যে বা একত্বে উপনীত হয়। সাধনার মধ্য দিয়ে মানুষ সিদ্ধিকে লাভ করে। লাভ বা সিদ্ধিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন অমৃত বা অমৃতসাগর। অমৃত-সাগরে উপনীত হওয়া ও অমৃতের আস্বাদন করার নাম অমৃত লাভ করা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—অমৃতসাগর! অমৃতসাগরের পরিধি বা সীমা অসীম ও অনন্ত। এই অসীম পরিধির পরিচয় দিতে গিয়ে শাস্ত্রকাররা বলেছেন: 'কোটিসূর্যপ্রতিকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্'। অমৃত কোটি সূর্যের আলোকের মতো যেমন উজ্জ্বল, কোটি চন্দ্রকিরণের মতো তেমনি সুশীতল। উত্তপ্ত ও শীতল পরস্পর বিরুদ্ধ, কিন্তু সর্ববিরোধের অবসান হয় অমৃতে বা ব্রহ্মচৈতন্যে। অমৃত অবিনশ্বর ও অনির্বাণ। প্রখরতা ও শীতলতার মিলনক্ষেত্র অমৃতসাগর ঈশ্বর। অনন্ত চৈতন্যসাগরে অবগাহন ক'রে সকলকে শান্তি লাভ করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন।

কেনোপনিষদে আছে: "আত্মনা বিন্দতে বীর্যম্, বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্"

(১।২।৪)। 'আত্মনা' কিনা জীবাত্মার জ্ঞানে পার্থিব সম্পদ ও 'বিদ্যয়া'— ব্রহ্মবিদ্যার জ্ঞানে অমৃত বা মোক্ষ লাভ হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মা। পরমাত্মাকে না জেনে জীবচৈতন্যের যে জ্ঞান সে জ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান। মিথ্যা-জ্ঞানের বিপরীত সত্যজ্ঞান বা পরমাত্মার স্বরূপের জ্ঞান।

কেনোপনিষদে বলা হয়েছে, মিথ্যাজ্ঞান সৃষ্টি হয় অহং-অভিমান থেকে। মিথ্যাভিমানের জন্য দ্যোতনশীল (জ্ঞানস্বরূপ) দেবতারাও ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করতে পারেন না। অগ্নি (জাতবেদ) ও বায়ু (মাতরিশ্বা) 'অহম্-স্মীতি' (আমি) এই অভিমান করেছিলেন। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র সে অভিমান থেকে মুক্ত ছিলেন। মহামায়ারূপিণী উমা হৈমবতী তাই ইন্দ্রের সম্মুখে আবির্ভূত হ'য়ে আপন স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন—"স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্।"* অহং-অভিমান অবিদ্যা। অবিদ্যাই 'মহতী বিনষ্টিঃ'—অশেষ অনিষ্টকর। 'মহতী বিনষ্টিঃ' শব্দের উপর আলোকপাত ক'রে আচার্য শঙ্কর বলেছেন: "বিনস্টি বিনাশনং জন্মরামরণাদি প্রবন্ধাবিচ্ছেদলক্ষণা সংসারগতিঃ।" মোহগ্রস্ত মানুষই সংসারের পথযাত্রী হয়। কামনা-বাসনার জালে আবদ্ধ হ'য়ে মানুষ শান্তি পায় না, অশান্তির আগুনেই সে পুড়ে মরে—'মহতী বিনস্টিঃ'।

অশান্তি ও বিনাশ কোনটাই মানুষ কামনা করে না, শান্তিই সে চায় জীবনে। কিন্তু শান্তির আশা করলেই কি শান্তি পাওয়া যায়? সে'জন্য চাই আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: (অমৃতসাগরে যাবার) অনন্ত পথ, তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি। যে পথ দিয়ে যাও, **আন্তরিক হ'লে** ঈশ্বরকে পাবে।" ঈশ্বরের প্রতি একনিষ্ঠ মনোবৃত্তির নাম আন্তরিকতা। একমুখী মনোবৃত্তির নাম আন্তরিকতা। তাই মন ও মুখ এক না হ'লে আন্তরিকতা আসে না। কথা ও কাজের মধ্যে ও সামঞ্জস্য থাকা চাই। আন্তরিকতা এলে ঈশ্বরদর্শনের জন্য মন ব্যাকুল হয়। ঈশ্বরদর্শন হ'লে মানুষ মৃত্যুকে জয় করে ও শিবের মতো মৃত্যুঞ্জয় হয়। আসক্তির হলাহলই জন্ম-মৃত্যুর চক্র। এ' চক্রকে অতিক্রম করার নাম অমরত্ব-লাভ। অমরত্বই অমৃত। উপনিষদে বলা হয়েছে: "আনন্দরূপং অমৃতং যদ্ বিভাতি।" আনন্দই ব্রহ্ম—'আনন্দাদ্ধের খল্বিমানি ভূতানি, আনন্দাদ্ধেব জায়ন্তে, আনন্দাদ্ধেব সংবিশান্তি,'—আনন্দ থেকে বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি, আনন্দে

সকলের স্থিতি ও আনন্দেই তাদের লয়। এ'আনন্দই Supreme *Purusha*, **the omnipresent and immortal Bliss**। আনন্দের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; সৃষ্টি নাই, প্রলয় নাই, সুতরাং আনন্দে সংসারগতি নাই এবং মায়ার লীলা-কর্মও নাই, আছে কেবল প্রকাশরূপ সত্তামাত্রের উপলব্ধি—'অস্তিত্যেব উপলব্ধব্যম্'।

অমৃত-সাগরের ফলশ্রুতি-সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন :

"মনে করো—অমৃতের একটি কুণ্ড আছে। কোন রকমে এই অমৃত একটু মুখে পড়লেই অমর হবে—তা তুমি নিজে ঝাঁপ দিয়েই পড় বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেমে একটু খাও, বা কেউ তোমায় ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক। একই ফল। একটু অমৃতের আস্বাদন করলেই অমর হবে।"

অমৃতের কুণ্ড বা পরিপূর্ণ অমৃত। এ' অমৃত কিন্তু কর্মফল নয়। মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে 'কর্মসু চামৃতম্'। এই অমৃত 'কর্মজং ফলং'—কর্মফল। কর্ম ও কর্মফলের অতীত যে শাশ্বত মুক্তিরূপ অমৃত—শ্রীরামকৃষ্ণদেব তারই কথা বলেছেন। পূর্ণকুণ্ডের এক বিন্দু মুখে পড়লেই অমর হওয়া যায়। অমৃতের বিন্দু ও সিন্ধুর মহিমার মধ্যে কোন তর-তম ভেদ নাই—'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে'। অগ্নির কণা অগ্নিকুণ্ডের মতোই শক্তিশালী। দাহিকাশক্তি **উভয়েরই সমান**। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, অমৃতের একটু কণা মুখে পড়লে অমৃতত্ব লাভ হয়। ব্রহ্মানুভূতির বেলায়ও দেখি যে, সাধক 'তত্ত্বমসি'-মহাবাক্যের বিচারে প্রথমে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ব্যষ্টি-জ্ঞান ও পরে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' সমষ্টিজ্ঞান লাভ করে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির চেতনা সেখানে একাকার। সর্বব্যাপী ব্রহ্মচৈতন্যেরই কেবল প্রকাশ সেখানে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীকে বিশ্লেষণ করলে দেখি—

(ক) ১। 'কোন রকমে এই অমৃত একটু মুখে পড়লেই অমর হবে' (অংশ),

২। 'তা তুমি নিজে (কুণ্ডে) ঝাঁপ দিয়েই পড়' (পূর্ণ),

(খ) ১। 'বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেমে একটু খাও' (অংশ)

২। 'বা তোমায় ধাক্কা মেরে (পূর্ণকুণ্ডে) মেরে ফেলেই দিক' (পূর্ণ),

—**একই ফল**

শ্রীরামকৃষ্ণদেব উপনিষৎ ও বেদান্তসূত্র নিজে না পড়লেও সমগ্র উপনিষদৎ ও বেদান্তের 'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে' এই সারতত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন অংশ ও পূর্ণের সমন্বয় সাধন ক'রে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রজ্ঞাচক্ষুর প্রসারতা অসীম ও অনন্ত।

অমৃতরূপ ব্রহ্মানুভূতি লাভ করার জন্য সাধনার মধ্যে রূপভেদ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "অনন্ত পথ, তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যে পথ দিয়ে যাও, **আন্তরিক হ'লে** ঈশ্বরকে পাবে।" পথকে যোগ বলে, যেমন জ্ঞানাযাগ, কর্মযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ। 'যোগ' কিনা আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন।[১] পতঞ্জলি যোগ বলতে সমাধি বলেছেন—'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'। চিত্তবৃত্তির স্থিরভাবই সমাধি। জীবাত্মা সে পরমাত্মা এই অভেদতত্ত্বের পরিচয় দেয় যোগ। পথের সমাপ্তি লক্ষ্যে—যেমন নদীর সমাপ্তি অসীম সমুদ্রে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "মোটামুটি যোগ তিন প্রকার—জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ আর ভক্তিযোগ।" যোগের সাধনা ভিন্ন ভিন্ন হ'লেও সকলের সারকথা এক—ঈশ্বরলাভ। তবে লাভ করার পথে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আন্তরিকতার কথা বলেছেন। আন্তরিকতাহীন অচলায়তন সাধনা বিফলতায় পর্যবসিত হয়। তাই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য আকুলতা ও আগ্রহ চাই। কোন সাধক বলেছেন,

আয় মা সাধন-সমরে।
দেখি, মা হারে, কি পুত্র হারে।

এটি সাধকের মধ্যে শ্রদ্ধাবিনম্র চ্যালেঞ্জ বা রোক্। সংকল্প সাধন কিংবা শরীরপতন—এই প্রতিজ্ঞা। গৌতম-বুদ্ধের মতো 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্' এই দৃঢ়সংকল্প নিয়ে সাধন-সমরে অবতীর্ণ হতে হয়, তবেই পরমঋদ্ধিরূপ সিদ্ধির সাগরতীরে উপনীত হওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও লোকশিক্ষার জন্য নিজের কঠোর সাধনা করেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে—'আপনি আচরি ধর্ম জীবের শিখায়'।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগের পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

১। 'যুজ্' ধাতু থেকে যোগ। এই 'যজ্'-ধাতুর অনেকগুলি অর্থের কথা বলেছেন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর How to be a Yogi-গ্রন্থে।

জ্ঞানযোগ—'জ্ঞানী ব্রহ্মকে জানতে চায়। নেতি নেতি বিচার করে। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এই বিচার করে। সদসদ্‌বিচার করে' প্রভৃতি।

কর্মযোগ—'কর্মদ্বারা ঈশ্বরে মন রাখা। * * অনাসক্ত হ'য়ে প্রাণায়াম্, ধ্যান-ধারণাদি কর্মযোগ।'

ভক্তিযোগ—'ঈশ্বরের নামগুণ কীর্তন—এই সব ক'রে তাঁতে (ঈশ্বরে) মন রাখা।'

এ' তিনটি সাধনা বা যোগ-সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়ে তিনি কর্মযোগপ্রসঙ্গে পুনরায় বলেছেন : "কর্মযোগ বড় কঠিন ! * * অনাসক্ত হ'য়ে, ফল কামনা না ক'রে কর্ম করা ভারি কঠিন।" জ্ঞানযোগপ্রসঙ্গে বলেছেন : 'জ্ঞানযোগও এ' যুগে কঠিন', কেননা বাসনা ও কর্মের সংসারে একেবারে ফলাসক্তি ত্যাগ করা কঠিন'। কঠোপনিষদে বিচারপথকে বলা হয়েছে "দুর্গম্ পথস্তৎ",—দুর্গম বা ভয়সঙ্কুল পথ। তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের উপর দিয়ে চলা যেমন বিপজ্জনক, কামনা-সঙ্কুল সংসারের পথে চলাও তেমনি বিপজ্জনক—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিত দুরত্যয়া, দুর্গম্ পথস্তৎ…।' সংসারের পথে প্রতিপদেই পদস্খলনের ভয় আছে। জড়ের উপাসনায়ই মানুষ পাগল। ঈশ্বরবিমুখতা তার সাধারণ স্বভাব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং ঈশ্বরের দিকে মন রেখে নিঃস্বার্থভাবে সেবাবুদ্ধি নিয়ে কর্ম করা, কিংবা ঈশ্বরই সত্য ও নিত্য, আর সব অনিত্য—এ'কথা চিন্তা করাকে সাধারণ মানুষ পাগলের প্রলাপ ব'লে মনে করে। কিন্তু তা হলেও এ'যুগে কি মানুষ ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি রেখে কাজ করে না ? অবশ্যই করে, তবে এদের সংখ্যা নিতান্তই কম।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীর মর্মকথা : মনুষ্য জন্ম যখন শ্রেষ্ঠ, মানুষ যখন অসীম প্রতিভা ও বিচারশক্তির অধিকারী, তখন জীবনের মূল্যবোধ তার মধ্যে থাকা উচিত। পাকা-আমির পাদপীঠে কাঁচা-আমিকে বলিদান দেওয়াই তার জীবনে উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এ'বলিদানের নাম ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধি। ভোগে শান্তি নাই, ত্যাগে শান্ত—এই মন্ত্র মানুষের জপমালা হওয়া উচিত। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলতেন : 'আশা হি পরমং দুঃখম্, নৈরাশ্যং পরমং সুখম্'। এখানে নৈরাশ্য বলতে আসক্তিহীনতা—নিরাশা নয়। ত্যাগাসক্তি ভোগসক্তির উপর বিতৃষ্ণা আনে। ঈশ্বরলাভই তৃষ্ণা, আর সব বিতৃষ্ণা—এ বুদ্ধির নাম বৈরাগ্য। বৈরাগ্য না এলে ঈশ্বরদর্শন হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ'প্রসঙ্গে বলেছেন, ভক্তিযোগই যুগধর্ম * *। তাই এ' যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। প্রশ্ন হোল : ভক্তিযোগই যদি কলিযুগের একমাত্র সাধনপথ হয় তবে জ্ঞান-কর্মাদি অন্যান্য সাধনপথের আর প্রয়োজন কি ? এ একটি প্রশ্ন। এ' প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "ভক্তিযোগ যুগধর্ম—তার মানে নয় যে, ভক্ত এক জায়গায় যাবে, জ্ঞানী বা কর্মী আর এক জায়গায় যাবে। এর মানে—যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তিপথ ধরে যান, তাহলেও সেই জ্ঞান লাভ করবেন। ভক্তবৎসল (ভগবান) মনে করলেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন।"

'ভক্তিপথ শুদ্ধাভক্তির পথ'-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদের পুনরায় বলেছেন : 'কলিতে নারদীয়া-ভক্তি'। নারদীয়া-ভক্তির নাম জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতেও বিচার থাকে। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অপর নাম প্রেমাভক্তি বা পাকা-ভক্তি। ভক্তিযোগপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলেছেন : "তবে ঈশ্বর ঈচ্ছাময়। তাঁর যদি খুসি হয় * * ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন।" আবার বলেছেন : "জগতের মাকে পেলে ভক্তিও পাবে, জ্ঞানও পাবে। জ্ঞানও পাবে, ভক্তিও পাবে।"

তাই জ্ঞান ও ভক্তি সাধনপথদুটি ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে হ'লেও আসলে ভিন্ন নয়—এক। 'জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয়'-শীর্ষক আলোচনাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথকে (স্বামী বিবেকানন্দ) বলেছেন : "কিন্তু শুদ্ধ-জ্ঞান আর শুদ্ধাভক্তি এক। শুদ্ধজ্ঞান যেখানে, শুদ্ধাভক্তিও সেইখানে নিয়ে যায়" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ, ৫ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১২৫)। তাই জ্ঞান ও ভক্তির যথার্থরূপ এক। বৈষ্ণবগ্রন্থে প্রেমস্বরূপা শ্রীরাধার রূপ-বর্ণনায় বলা হয়েছে—'প্রেমস্বরূপিণী শ্রীরাধাঠাকুরাণী'। শ্রীরাধা মহাপ্রকৃতিতত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষতত্ত্ব। পরমতত্ত্বের দৃষ্টিতে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। শক্তিস্বরূপিণী কালী ও জ্ঞানস্বরূপ শিবের মধ্যেও তেমনি কোন ভেদ নাই। শক্তিতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব তাই এক ও অভিন্ন। উভয়ের মধ্যে কেবল বৈচারিকভেদ, তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে কোন ভেদ নাই—এক। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্বৈততত্ত্বও' মর্মকথাই প্রকাশ করে।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

॥ মায়া ও দয়া ॥

"শ্রীরামকৃষ্ণদেব। 'আমার জিনিস, আমার জিনিস' ব'লে সেই সকল জিনিসকে ভালবাসার নাম **মায়া**। সবাইকে ভালবাসার নাম **দয়া**। শুধু ব্রাহ্মসমাজের লোকগুলিকে ভালবাসি—কি শুধু পরিবারদের ভালবাসি—এর নাম মায়া। সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোকদের ভালবাসা—এটি দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়।'

"মায়াতে মানুষ বদ্ধ হয়, ভগবান থেকে বিমুখ হয়। দয়া থেকে ঈশ্বর লাভ হয়। শুকদেব, নারদ—এঁরা দয়া রেখেছিলেন।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ (১৩৬৬), পৃঃ ১৬৩

শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে (প্রথম ভাগে, সপ্তম পরিচ্ছেদে) শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্রাহ্মসমাজ-প্রসঙ্গে প্রতাপচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছেন (পৃঃ ১৬০)। কিছুক্ষণ আলোচনার পর শ্রীরামকৃষ্ণদেব গান করলেন—'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন' প্রভৃতি। তারপর বল্লেন * * 'লেক্‌চার, ঝগড়া ওসব তো অনেক হলো, এমন ডুব দাও'।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রতাপ-চন্দ্রকে অমৃতসাগরে ডুব দেবার জন্য বল্লেন। কথায় কথায় নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দের) কথা উঠলো। বল্লেন—'নরেন্দ্রকেও (অমৃত-সাগরে ডুব দেবার জন্য) বলেছিলাম'। তাতে নরেন্দ্রনাথ একটু ভয় পেয়ে বলেছিলেন, 'সাগরে ডুব দিলে মরে যাব'। উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, 'সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুব দিলে মৃত্যুর ভয় নাই, বরং মানুষ অমর হয়।' প্রতাপচন্দ্র নিবিষ্ট মনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অমৃতময়ী বাণী শুনছিলেন।

তারপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব অন্যান্য ভক্তগণকে লক্ষ্য ক'রে বল্লেন: "আমার জিনিস, আমার জিনিস' ব'লে সেই সকল জিনিসকে ভালবাসার নাম **মায়া**" প্রভৃতি।

অবিদ্যা, অজ্ঞান ও মায়া একই জিনিস—যদিও নাম নিয়ে মতভেদ আছে। অজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান। অদ্বৈতবেদান্তের কোন কোন সম্প্রদায়, যেমন ভামতী ও বিবরণ বলেন, যে অবিদ্যা ঈশ্বরে থাকে, তাকে বলে মায়া (সমষ্টি), আর সে অবিদ্যা জীবে থাকে, তাকে বলে অজ্ঞান। বিবরণ-সম্প্রদায় একথা স্বীকার করেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মায়ার সঙ্গে সঙ্গে দয়ার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন: "মায়াতে মানুষ বদ্ধ হয়ে যায়, ভগবান থেকে বিমুখ হয়। দয়া থেকে ঈশ্বর লাভ হয়।" ঈশ্বর লাভ হওয়ার নাম মুক্তি। ঈশ্বর-লাভ ও অজ্ঞান-নাশ এককথা।

'আমার জিনিস, আমার জিনিস'—এই যে 'আমি'-র উপর একান্ত আসক্তি, এর নাম স্বার্থপরতা। ইংরাজীতে একে বলে ego-centric idea বা selflshness। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অন্যত্র বলেছেন: "এই যে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে জড়িত সীমাবদ্ধ 'আমি' বা 'আমার' ভাব এর নাম 'ছোট-আমি' বা কাঁচা-আমি।" 'বড়-আমি' বা 'পাকা-আমি' সমষ্টিচেতনার আমি। 'ছোট বা কাঁচা আমি'-র অপর নাম অজ্ঞান—যা মোহ ও বন্ধন সৃষ্টি করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আবার বলেছেন: "শুধু পরিবারদের ভালবাসি, এর নাম **মায়া**। দেশের লোকগুলিকে ভালবাসা এর নাম **দয়া**। সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোকদের ভালবাসা—এটি **দয়া** থেকে হয়।"

লক্ষ্য করার বিষয় যে, ভালবাসারূপ কর্ম বা বৃত্তি উভয়ের মধ্যেই আছে, কেবল 'আমার জিনিস', 'শুধু পরিবারদের' বা 'শুধু দেশের লোকদের' এই সীমিত ব্যষ্টি চেতনাযুক্ত ভালবাসার নাম মায়া, আর সমষ্টিচেতনায় 'সবাইকে' বা 'সব দেশের লোককে' ভালবাসার নাম দয়া। একটি সসীম ও সাম্প্রদায়িক ও অপরটি অসীম ও অসাম্প্রদায়িক। উভয়ে ভৌগোলিক সীমারেখায় দেশ ও কাল দিয়ে সীমাবদ্ধ হ'লেও একটি পার্থিব ভালবাসায় স্বার্থদুষ্ট ও অপরটি অপার্থিব ভালবাসায় ভাগবত-জীবনের সঙ্গে জড়িত।

এ'প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "আমি আর আমার—এটির নাম অজ্ঞান;" বা "আমি করছি"—এটির নাম **অজ্ঞান**। হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা,

আমি অকর্তা; তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র—এটির নাম জ্ঞান। '* * স্ত্রী, পুত্র, পরিবার এ'সব কিছুই আমার নয়, সব তোমারি জিনিস'—এর নাম জ্ঞান।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব বেদান্ততত্ত্বের কথাই বলেছেন। জ্ঞান ও অজ্ঞান, দয়া ও মায়া, মুক্তি ও বন্ধনের কথা তিনি সহজ সরলভাবে যা বলেছেন, বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রে সেটাই বিস্তৃতভাবে ও তর্কজালের প্রলেপ দিয়ে বলা হয়েছে। দয়া ও মায়া শব্দ-দুটি অনেক সময়ে সাধারণভাবে একই অর্থে আমরা ব্যবহার করি, যেমন বলি—লোকটি নির্মম, তার মধ্যে এতটুকু দয়া-মায়া নেই। মায়া এখানে দয়ার সমগোত্রীয়—যদিও মায়া অর্থে আকর্ষণ। কিন্তু দয়া ও মায়া-শব্দদুটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

দয়ার ভাব বা দয়াবৃত্তি তখনই প্রকাশ পায় যখন সহানুভূতি (একাত্মানুভূতির) ভাব অন্তরে সৃষ্টি হয়। দয়ার প্রকাশ স্বচ্ছ ও দিব্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'দয়া'-শব্দটি মুক্তি, ঈশ্বরদর্শন, অপরোক্ষানুভূতি অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন: "মায়াতে মানুষ বদ্ধ হ'য়ে যায়, ভগবান থেকে বিমুখ হয়, দয়া থেকে ঈশ্বরলাভ হয়।" সুতরাং দেখি যে, একটিতে সংসারবন্ধন, মোহ ও ভ্রমজ্ঞানের সৃষ্টি হয় ও অপরটিতে বন্ধনমুক্তি, বিবেক ও যথার্থজ্ঞানের বিকাশ হয়; সুতরাং একটি অন্ধকার ও অপরটি আলোক।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "আমি আর আমার—এটির নাম অজ্ঞান"। অজ্ঞানে জ্ঞান আবৃত হয়। আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের অধ্যাসভাষ্যে বলেছেন: "সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য 'অহম্ ইদম্' 'মম ইদম্' ইতি। নৈসর্গিক অর্থে স্বাভাবিক, অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে বা সাধারণত লোকে ভুল করে, বা যেটা তত্ত্বত 'আমি' নয় বা 'আমার' নয় তাকে 'আমি' 'আমার' করে। এই ভ্রম অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। এ' ভ্রমের নাম অজ্ঞান। অজ্ঞানের বিকাশ হয় সত্য ও মিথ্যাকে এক ক'রে—'সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য'। সত্য অবিনশ্বর চিদ্বস্তু, আর অনৃত বা মিথ্যা অচিদ্ ক্ষয়শীল বস্তু। ভ্রম বা অজ্ঞানের অপর নাম অধ্যাস। অধ্যাসের পরিচয় দিতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর বলেছেন দু'রকমভাবে: (১) "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ"। 'পরত্র' অর্থে পূর্বদৃষ্ট ও অবভাস অর্থে মিথ্যাজ্ঞান। আচার্য শঙ্কর বলেছেন: "অনাদিঃ অনন্তঃ নৈসর্গিকঃ অধ্যাসঃ মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-প্রবর্তকঃ সর্বলোক-প্রত্যয়ঃ"। অনন্তকাল থেকে চলে আসছে এই ভ্রম বা মিথ্যাজ্ঞানের সংস্কার

এবং সাধারণ লোক একথা জানে। (২) "অধ্যাসঃ নাম অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ ইতি অবোচাম", অর্থাৎ যা মিথ্যা, তাতে সত্যবুদ্ধি করার নাম অধ্যাস। চাকচিক্যময় ঝিনুক রূপো নয়, কিন্তু ঝিনুককে রূপো বলে মনে (ভ্রম) করাকে অধ্যাস বলে।

অধ্যাস ও অজ্ঞান প্রায় এককথা। তাহলেও অজ্ঞান কি? অজ্ঞান বল্‌তে কি জ্ঞানের অভাব বুঝায়, বা বুঝায় অস্পষ্ট জ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান, যেমন অন্ধকার বল্লে আলোকের অভাব বুঝায় না, বুঝায় অল্প বা অস্পষ্ট আলোক? শ্রদ্ধেয় রামানন্দ সরস্বতী 'রত্নপ্রভা'-ভাষ্যে অজ্ঞানপ্রসঙ্গে বলেছেন: "যদ্বা, অজ্ঞানং জ্ঞানাভাব ইতি শঙ্কানিরাসার্থং মিথ্যাপদম্। 'মিথ্যাত্বে সতি সাক্ষাৎজ্ঞাননিবর্ত্যত্বম্' অজ্ঞানস্য লক্ষণং মিথ্যাপদেন উক্তম্।" তাই আচার্য শঙ্কর অজ্ঞান বা মায়ার যথার্থ রূপ কি সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, অজ্ঞান বা মায়া সৎ নয়, অসৎ নয়, সদসৎ নয়, কিন্তু অনির্বচনীয়, অথচ 'কিছু একটা' আছে—'যৎ কিঞ্চিদ্ অস্তি'। তাছাড়া অঘটন ও অত্যাশ্চর্য যা তাও অজ্ঞানের দ্বারা সংঘটিত হয়—অঘটনঘটনপটিয়সী মায়া। অর্থাৎ অজ্ঞানই মায়া সৃষ্টি করে, বা অজ্ঞান ও যা, মায়াও তা। মরুভূমিতে জলদৃষ্টিরূপ মরীচিকা সত্য নয়, তাহলেও সত্য ব'লে মানুষকে ভ্রান্ত করে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: 'আমি আর আমার এটির নাম অজ্ঞান। আমি বল্‌তে অহং-অভিমান। এটি সীমিত দেহাভিমান। এই সীমিত দেহাভিমান চিরমুক্তিময় আত্মচৈতন্যে নাই, থাকে মায়াসক্ত মানুষে। মানুষ জড়শরীরে অহং-অভিমান সৃষ্টি করে, অথচ জড়শরীরের মৃত্যু আছে। মানুষ ভুল ক'রে নশ্বর শরীরকে অবিনশ্বর আত্মা ব'লে মনে ক'রে তাতে আসক্ত হয়। এরই নাম ভ্রম, অজ্ঞান বা মায়া। দয়া এর বিপরীত। দয়া এখানে অনুকম্পা নয়, দয়া বল্‌তে যথার্থ আত্মস্বরূপের জ্ঞান বা একত্বানুভূতি। দয়া এখানে আত্মাসক্তি—যে আসক্তি পার্থিব সকল আসক্তিকে দূর করে।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ দয়ায় সহানুভূতির ভাব কীভাবে সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধে বলেছেন, একটি মানুষকে যখন আর একজন দয়া করে তখন তার অন্তরে একত্বানুভূতির ভাব প্রকাশ পায়। যেমন, কোন একটি দুঃস্থ ও গরীব লোককে দেখে অন্য একটি অবস্থাসম্পন্ন লোক যখন দয়া করে, অর্থাৎ দয়া

পরবশ হ'য়ে প্রার্থীকে অর্থ সাহায্য করে তখন অবস্থাবান লোকটি মনে করে যে, 'আমি যদি এ রকম অবস্থায় পড়তাম তাহলে আমারও তো দুঃখ-কষ্ট এ' রকমই হোত' এবং এই সহ-অনুভূতি সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে দুঃস্থ লোকটিকে অর্থ সাহায্য করে। সুতরাং সমবেদনা বা সহানুভূতি দয়ার একটি লক্ষণ। দয়ায় মানুষ সকল মানুষকে ভালবাসে ও সবার দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হয়। সুতরাং দয়া মানুষকে স্বার্থহীন করে, পবিত্র করে ও সীমার উর্ধে উন্নীত ক'রে চিরপবিত্র আত্মার প্রতি আকৃষ্ট করে। তার জন্য স্বার্থযুক্ত ভালবাসার আকর্ষণ বা মায়া থেকে সে নির্মুক্ত হয়। নিঃস্বার্থ ভালবাসার আকর্ষণই দয়া। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব দয়া থেকে মায়াকে পৃথক ক'রে বলেছেন: "মায়াতে মানুষ বদ্ধ হ'য়ে যায়, ভগবান থেকে বিমুখ হয়; দয়া থেকে ঈশ্বর লাভ হয়।"

এখানে 'আমি' বা 'আমার' এ 'অহং-'অভিমানের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পূর্বেই উদাহরণ দিয়েছেন: "রাসমণি কালীবাড়ী করেছেন—একথাই লোকে বলে, কেউ বলে না যে, ঈশ্বর করেছে। * * হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর আমি অকর্তা; তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র * *। হে ঈশ্বর, আমার কিছুই নয়, এ'মন্দির আমার নয়, এ' কালীবাড়ী আমার নয়, এ'সমাজ আমার নয়, এ'সব তোমার, তোমার জিনিস। স্ত্রী পুত্র পরিবার—এ'সব কিছুই আমার নয়, সব তোমার জিনিস। এর নাম জ্ঞান।" মোটকথা আমি ও তুমি নিয়েই ভোগ ও ত্যাগের প্রসঙ্গ। ভোগে আসক্তি ও আসক্তির জন্য লোকে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ত্যাগে আসক্তি বিলুপ্ত হয় এবং এই বিলুপ্তির অর্থ মুক্তি ও পরমশান্তির আশীর্বাদ লাভ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনসাধনা ছিল—'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু' (আমি নয়, হে ঈশ্বর, তুমিই, সারবস্তু ও সকলকিছুর কারণ)—এই মন্ত্র। তিনি আরও বল্‌তেন: "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।" 'আমি'-রূপ অহংকার ও প্রবৃত্তিজাল দূর হ'লে মানুষ ঈশ্বরকে আত্মসমর্পণ করে। তখন ঈশ্বরের ইচ্ছাই সব। তখন নিজের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছায় লীন ও এক হয়। তখনই মনে যথার্থ নিরাসক্তির ভাব আসে। তখন দয়াসিদ্ধ মানুষ বলে, 'সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি'। বিবেকহীন সংসারী মানুষই জীবনে ভুল করে। এই ভুল করার জন্য মানুষ দুঃখ-যন্ত্রণার অভিশাপও বরণ করে জীবনে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "মায়াতে মানুষ বদ্ধ হ'য়ে যায় * *। দয়া

থেকে ঈশ্বরলাভ হয়।" মায়ার নাম আসক্তির আকর্ষণ, আর দয়া সেই আকর্ষণকে নষ্ট করে। স্বার্থের আসক্তি অজ্ঞান। বেদান্ত বলে, অজ্ঞান দূর করার জন্যই সদসদ্‌বিচার। অজ্ঞান দূর হলে জীবন হয় মুক্তিময় ও অমৃত স্বরূপ। বেদান্তের মতে, মুক্তি (ব্রহ্মজ্ঞান) স্বতঃসিদ্ধ। এর জন্য চেষ্টা ও সাধনার কোন প্রয়োজন হয় না। সাধনা ও বিচার কেবলমাত্র অজ্ঞান বা মিথ্যাবুদ্ধি দূর করার জন্য প্রয়োজন। আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে এ'সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বলেছেন,

(১) অনর্থহেতোঃ প্রহাণায় অত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তাঃ আরভ্যন্তে।

(২) নিঃশ্রেয়সফলং তু ব্রহ্মবিজ্ঞানং, ন চ অনুষ্ঠানান্তরাপেক্ষম্।

(৩) ব্রহ্মাবগতিঃ হি পুরুষার্থঃ নিঃশেষসংসারবীজাবিদ্যনর্থনিবর্হনাৎ।

(৪) ব্রহ্মজ্ঞানম্ অপি বস্তুতন্ত্রমেব, ভূতবস্তুবিষয়ত্বাৎ।

(৫) সংসারভ্রান্তিঃ ব্রহ্মস্বরূপশ্রবণমাত্রেণ নিবর্তেত।

(৬) মিথ্যাজ্ঞানাপায়শ্চ ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাৎ ভবতি।

এখানে মিথ্যাজ্ঞানরূপ অজ্ঞান দূর করার জন্য মুক্তি বা ব্রহ্মবিজ্ঞানের প্রয়োজন। মুক্তিই ব্রহ্মবিজ্ঞান। এ বিজ্ঞান উৎপাদ্য বস্তু নয়, বস্তুতন্ত্র ও স্বসংবেদ্য। আকাশ থেকে মেঘ সরে গেলে যেমন সূর্য প্রকাশিত হয়, তেমনি মিথ্যাজ্ঞানরূপ অজ্ঞান দূর (অপসৃত) হ'লে ব্রহ্মবিজ্ঞান বা মুক্তির অনুভূতি হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : 'মায়াতে মানুষ বদ্ধ হয়ে যায়'। এর অর্থ মায়া, অবিদ্যা বা অজ্ঞানই ও স্বরূপজ্ঞানকে আবৃত ক'রে করে। সুতরাং অনর্থরূপ মায়া বা অজ্ঞানের আবরণকে দূর করতে (সরিয়ে দিতে) হয়। অজ্ঞানকে সরানোর অর্থ ব্রহ্মবিজ্ঞানের প্রকাশ।

মুক্তি মোটামুটি তিন রকম : (১) জীবন্মুক্তি, (২) বিদেহমুক্তি ও (৩) ক্রমমুক্তি। গীতায় এই তিন রকম মুক্তির কথাই স্বীকার করা হয়েছে। সংক্ষেপশারীরককার, ব্রহ্মসিদ্ধিকার, ইষ্টসিদ্ধিকার এবং আরও অনেক দার্শনিক বিদেহমুক্তি স্বীকার করছেন কারণ দেখিয়ে যে, প্রারব্ধ-জন্য শরীর এবং শরীর অজ্ঞানের পরিণতি ; অজ্ঞানজন্য শরীর সৃষ্টি হওয়ায় শরীর নশ্বর ও ক্ষয়শীল, সুতরাং অবিনশ্বর আত্মা থেকে তা ভিন্ন। জীবন্মুক্তের শরীরকে 'অজ্ঞানলেশ' 'বলে, সুতরাং শরীররূপ অজ্ঞানলেশ (কিছুমাত্র

অজ্ঞান) যতদিন থাকে ততদিন মুক্তি বা জ্ঞান লাভ অসম্ভব—একথা বিদেহ-মুক্তিবাদীরা স্বীকার করেন। প্রারব্ধের ক্ষয় হ'লে শরীররূপ অজ্ঞানলেশ নষ্ট হয় ও তখনই মুক্তিলাভ হয়। 'ব্রহ্মসিদ্ধি'-র (মণ্ডনমিশ্র-রচিত) টীকাকার শঙ্খপাণিও মণ্ডনমিশ্রের বিদেহমুক্তিরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন।

শঙ্করানুসারী ও বহু অদ্বৈতাচার্যরা জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন। আচার্য শঙ্করের মতে, শরীর থাকাকালেই ব্রহ্মানুভূতিরূপ মুক্তি লাভ হয়। এই মুক্তির পর প্রারব্ধজন্য শরীর বা 'অজ্ঞানলেশ' থাকলেও তা না থাকারই মধ্যে গণ্য হয়, কেননা জীবন্মুক্ত জ্ঞানীর সেই শরীরের প্রতি আর মায়া বা আসক্তি থাকে না। 'জীবন্মুক্তিবিবেক', 'পঞ্চদশী', 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি' প্রভৃতি গ্রন্থে জীবন্মুক্তি স্বীকার করা হয়েছে এবং প্রারব্ধজন্য শরীরকে (অজ্ঞানলেশকে) পোড়াদড়ি, বা সাপের খোলস, বা কুম্ভকারের কুলালচক্রের শেষগতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। জীবন্মুক্তির আশীর্বাদ লাভ হ'লে জ্ঞানীকে পুনরায় জন্ম-গ্রহণ করতে হয় না, মিথ্যাজ্ঞানরূপ অজ্ঞানের নাশ হ'লে শুদ্ধজ্ঞানেই জ্ঞানী চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকেন। তখন চিত্তশুদ্ধি, মনোলয়, বা প্রারব্ধ-প্রতিবন্ধকের কোন প্রশ্নই উঠে না। জীবন্মুক্তির পর শরীরাসক্তি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়। তখন প্রারব্ধের ফলস্বরূপ শরীর (অজ্ঞানলেশ) না থাকার সমান ব'লে অনুভূত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ-পার্যদগণও জীবন্মুক্তি স্বীকার করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "মায়াতে মানুষ বদ্ধ হয়ে যায়, * *। দয়া থেকে ঈশ্বর লাভ হয়।" এই কথাগুলি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'বদ্ধ' অবস্থা বা বন্ধনকে মোটেই প্রশংসা করেন নি, মানুষের চরমলক্ষ্য দয়া বা মায়ার অতীত অবস্থা যে ঈশ্বরলাভ বা মুক্তির আস্বাদন তাতেই সকলকে প্রতিষ্ঠিত থাকতে বলেছেন। বন্ধন হয় মিথ্যাজ্ঞানরূপ অজ্ঞানের জন্য, কিন্তু জীবন্মুক্তি লাভ হ'লে সত্যজ্ঞানের আলোকে মিথ্যাজ্ঞানের অন্ধকার দূর হয় ও জ্ঞানের আলোকে চিরস্নাত সাধকের জীবন পবিত্র হয়। জীবন্মুক্তির আশীর্বাদ যে অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করে ও জীবন্মুক্ত জ্ঞানী যে সংসার বন্ধনে বা মায়ার পাশে আর আবদ্ধ হন না সে সম্বন্ধে আচার্য শঙ্কর বেদান্তদর্শনের 'তত্তু সমন্বয়াৎ' (চতুর্থ) সূত্রের ভাষ্যে পরিষ্কার ক'রে বলেছেন : "দেহাদৌ অহংপ্রত্যয়: মিথ্যা এব, ন গৌণঃ। তস্মাৎ মিথ্যা-

প্রত্যয়নিমিত্তত্বাৎ সশরীরতস্য সিদ্ধং অপি বিদুষঃ অশরীরত্বম্।" অজ্ঞানের জন্য দেহে যে অহংপ্রত্যয় বা 'আমার শরীর' এই জ্ঞান হয়, তা যথার্থ নয়, তা হয় মিথ্যাজ্ঞানের জন্য, আর মিথ্যাজ্ঞানের জন্য ব'লেই সত্যজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের অনুভূতি হ'লে মিথ্যাজ্ঞান দূর হয়। জীবন্মুক্তি সকল মানুষের পক্ষেই সম্ভব। জীবন্মুক্তি বা শরীর থাকাকালে আত্মজ্ঞান লাভ হ'লে প্রারব্ধজন্য শরীর অশরীর অর্থাৎ না-থাকার সামিল হয়। উপনিষদ্‌ও বলেছে: "সচক্ষুঃ অচক্ষুঃ ইব, সকর্ণ অকর্ণ ইব, সবাক্ অবাক্ ইব, সমনা অমনা ইব, সপ্রাণঃ অপ্রাণঃ ইব।" জীবন্মুক্তিলাভের পর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মন, শরীর, কোন-কিছুতেই আর কর্তৃত্ব বা অহং-অভিমান থাকে না, তখন সকল ইন্দ্রিয় ও শরীর পরকল্যাণের জন্য নিবেদিত হয়। আচার্য শঙ্কর বলেছেন: "তস্মাৎ ন অবগতব্রহ্মাত্মভাবস্য যথাপূর্বং সংসারিত্বম্", অর্থাৎ শরীর থাকাকালে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পর জ্ঞানী আর অজ্ঞানী মানুষের মতো জীবন-যাপন করেন না। তখন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয় ও বিশ্ব-সংসারকে তিনি দেখেন 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্',—সর্বত্রই ব্রহ্মচৈতন্যের প্রকাশ। 'ভাষ্যরত্নপ্রভা'-কার শ্রদ্ধেয় রামানন্দ সরস্বতী বলেছেন: "মৃতা সর্পেণ ত্যক্তাভিমানা বর্ততে, এবমেব ইদং বিদুষা ত্যক্তাভিমানং শরীরং তিষ্ঠতি। অথ তথা ত্বয়া নির্মুক্তসর্পবৎ এব অয়ম্ দেহস্থ অশরীরঃ।" সাপ খোলস ছাড়লে খোলসকে সাপের মতো দেখালেও সেই, খালস কিন্তু কোন হিংসাকর্ম করে না ও তার দ্বারা কারো কোন ক্ষতি হয় না। বেদান্তে পোড়াদড়িরও উদাহরণ আছে। দড়ি পুড়ে গেলেও বিবর্ণ দড়ির মতো তাকে দেখায়, কিন্তু সেই পোড়াদড়ি দিয়ে আর বন্ধনের কাজ হয় না। তেমনি প্রতিটি মানুষেরই সাধনা ও আত্মবিচারের পর শরীর থাকাকালেই জ্ঞান লাভ করতে ও সংসারের মায়াপাশ থেকে মুক্ত হ'তে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই অধ্যাত্মসাধনা ও বিচার কী ধরনের হয় তার পরিচয় দিয়ে বলেছেন: "হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর আমি অকর্তা, তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র'—এটির নাম জ্ঞান। * * স্ত্রী পুত্র পরিবার এ'সব কিছুই আমার নয়, সব তোমারি জিনিস—এর নাম জ্ঞান।" 'আমি অকর্তা', 'আমি যন্ত্র', 'কিছুই আমার নয়' এই বিচারে ও জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নাম যথার্থজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান।

এ জ্ঞানের প্রসঙ্গেই জীবন্মুক্তি, বিদেহমুক্তি ও ক্রমমুক্তির প্রসঙ্গ আসে।

জীবন্মুক্তি যে যুক্তিসিদ্ধ সেকথা আচার্য শঙ্কর ও শঙ্করানুসায়ী বেদান্তাচার্যের স্বীকার করেছেন এবং সে বিষয়ে পূর্বে উল্লেখ করেছি। আচার্য অপ্পয়দীক্ষিত 'সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ'-গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে এই জীবন্মুক্তি ও অবিদ্যালেশ-সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন: 'মূল-অবিদ্যার যে আবরণ ও বিক্ষেপ নামে দুটি শক্তি আছে তাদের মধ্যে বিক্ষেপশক্তি অবিদ্যালেশ ও প্রারব্ধকর্মের কারণ'। সবজ্ঞাত্মমুনিও 'সংক্ষেপশারীরক'-গ্রন্থে জীবন্মুক্ত-অবস্থা স্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন, বিদেহমুক্তিই যুক্তিসিদ্ধ। এর উল্লেখও পূর্বে করেছি। সর্বজ্ঞাত্মমুনি বলেছেন, জীবন্মুক্তি শাস্ত্রসঙ্গত নয়, সুতরাং অবিদ্যালেশ অসিদ্ধ। কিন্তু আচার্য শঙ্কর সে' কথা স্বীকার করেন নি। পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, আচার্য শঙ্কর বলেছেন, সংসারে শরীর থাকাকালেই অজ্ঞানের নাশ ও আত্মজ্ঞানের প্রকাশ বা অনুভূতি হয় এবং এ' বিষয়ে কোন সন্দেহের স্থান নাই। আচার্য অপ্পয়দীক্ষিত আচার্য শঙ্করের সিদ্ধান্ত স্বীকার ক'রে বলেছেন: 'অবিদ্যা-সংস্কারের অপব নাম 'অবিদ্যালেশ' এবং কার্যাক্ষম (সকল কার্য-উৎপাদনে অক্ষম) অবিদ্যা বা অজ্ঞানই অবিদ্যালেশ। দগ্ধপট বা পোড়াদড়ির দৃষ্টান্তই এ'পক্ষে যথেষ্ট'। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'দয়া থেকে মুক্তি ও মায়াতে বন্ধন'। এ' কথা থেকেই অবিদ্যালেশ ও জীবন্মুক্তি বা অপরাপর মুক্তির প্রসঙ্গ আসে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বক্তব্য এই যে, জীবনে 'আমি'-অভিমান-কে (যাকে অজ্ঞান বা অবিদ্যা বলে) ত্যাগ করার নাম নিরাসক্তি। এই নিরাসক্ত অবস্থার নাম বৈরাগ্য বা বিষয়-বিতৃষ্ণা। ক্ষণিক আনন্দের জন্য বস্তুতে ও ঈশ্বরজ্ঞানে তৃষ্ণা বা আকুল আকর্ষণের নাম বৈরাগ্য। বৈরাগ্য থেকে আসে দয়া ও দয়া থেকে আত্মজ্ঞানের বিকাশ হয়। এই বিকাশের নাম অনুভূতি। জ্ঞানের প্রকাশ বা অনুভূতিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব মানবজীবনের চরমলক্ষ্য বলেছেন। এ' প্রসঙ্গে তিনি মুক্তপুরুষ শুকদেব ও নারদের নাম উল্লেখ করেছেন। পুরাণে ও ইতিহাসে নারদ-সম্পর্কে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব পুরাণে কথিত মুক্তপুরুষ দেবর্ষি নারদের কথাই বলেছেন। নারদ ছিলেন মুক্ত-পুরুষ। পুরাণে আছে, তিনি সর্বদাই শ্রীভগবানের নামগুণ-গানে নিবিষ্ট থাকতেন। আমরাও যেন তাঁর সেই নামগানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হই ও জীবনকে ধন্য করি।

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

॥ ঈশ্বরের নামগুণ-গান ও সৎসঙ্গ ॥

"মাষ্টার (বিনীতভাবে)। ঈশ্বরে কি করে মনে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরের নামগুণ গান সর্বদা কর্‌তে হয়। আর সৎসঙ্গ। ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু—এঁদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয়-কাজের ভিতর রাতদিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না। মাঝে মাঝে (তাই) নির্জনে গিয়ে তাঁর (ঈশ্বরের) চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হ'লে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন।

যখন চারাগাছ থাকে, তখন তার চারদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া দিলে ছাগল-গুরুতে খেয়ে ফেলে।

ধ্যান কর্‌বে বনে, মনে ও কোণে। আর সর্বদা সদসদ্‌বিচার কর্‌বে। ঈশ্বরই সৎ কিনা নিত্যবস্তু, আর সব অসৎ কিনা অনিত্য। এই বিচার কর্‌তে কর্‌তে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ কর্‌বে।"

—শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ (১৩৬৬), পৃঃ ২৬

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরচিন্তা, ঈশ্বরচিন্তার উপায় ও সৎ ও অসৎ-বিচারশীল সাধু-সন্ন্যাসী এবং তাদের সাধন-ভজনের সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌তে বলেছেন। ঈশ্বরের গুণ গান কর্‌লে ঈশ্বরকেই চিন্তা ও ধ্যান করা হয়। ঈশ্বরকে লাভ করার এটিও একটি উপায়। তবে সংসারে একান্তে ঈশ্বরের চিন্তা করা অনেক সময়ে অসম্ভব হ'য়ে পড়ে, তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব মাঝে মাঝে ভক্ত ও সাধককে নির্জনে ধ্যান-ধারণা করার উপদেশ দিয়েছেন। বারবার ধ্যান-ধারণা করার চেষ্টা বা যত্ন অভ্যাসে পরিণত হয়। ঐ অভ্যাস দৃঢ় হ'লে

বিষয়-বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্যের উদয় হয়, আর তখনই ঈশ্বরচিন্তা সার্থক হয়। সর্বত্র ও সর্ববিষয়ে ছড়ানো চঞ্চল মন তখন ঈশ্বরে স্থির হয় ও মনের ঈশ্বর-চিন্তাময় বৃত্তি হয়। তখনই ঈশ্বরের দিব্যসত্তাকে অনুভব করা সম্ভব হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ' রহস্যেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন। 'ঈশ্বরে কি ক'রে মন হয়?' —এটি শ্রীম তথা মাষ্টার মহাশয়ের প্রশ্ন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই ভিন্ন ভিন্ন সাধন-উপায়ের কথা বলেছেন। বলেছেন,

(১) মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর (ঈশ্বরের) ধ্যান করা বড় দরকার;

(২) যখন চারাগাছ থাকে তখন তার চারদিকে বেড়া দিতে হয়, বেড়া না দিলে ছাগলে-গরুতে খেয়ে ফেলে;

(৩) ধ্যান কর্‌বে বনে, মনে ও কোণে;

(৪) বড় মানুষের দাসী সব কাজ কর্‌ছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ীর দিকে মন পড়ে আছে;

(৫) কচ্ছপ জলে চ'রে বেড়ায়, কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে জান?—আড়ায় পড়ে আছে—যেখানে তার ডিমগুলি আছে;

(৬) তেল হাতে মেখে তবে কাটাল ভাঙ্‌তে হয়;

(৭) সংসার জল, আর মনটি যেন দুধ। যদি জলে ফেলে রাখ তাহলে দুধে জলে মিশে এক হয়ে যায়।

সকল উপায়ের কথা শুনে মাষ্টার মহাশয় যখন বল্লেন, 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'-নাটকে আছে বস্তুবিচারের কথা, তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব বল্লেন: "হাঁ, বস্তু-বিচার!" কিন্তু বস্তুবিচার কি? শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "ঈশ্বরই সৎ কিনা নিত্যবস্তু, আর সব অসৎ বা অনিত্য। এই বিচার কর্‌তে কর্‌তে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ কর্‌বে।" এর নামই বিচার বা 'বস্তুবিচার'। বেদান্তের মতে, ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, আর সব অবস্তু। অবস্তুর অর্থ পরিবর্তনশীল অনিত্য পদার্থ। 'বস্তু' বল্‌তে সাধারণভাবে জড় ও পার্থিব পদার্থকে বুঝি, কিন্তু ব্রহ্মবস্তু পার্থিব পদার্থ নয়; ব্রহ্মবস্তু অপার্থিব পরিপূর্ণ চৈতন্য। অথবা বলা যায়, পার্থিব সকল পদার্থে অনুস্যূত থেকেও যা সকল পদার্থ থেকে নির্লিপ্ত, সকল চাঞ্চল্যের মধ্যে থেকেও যা অচঞ্চল—তাই ব্রহ্ম। আচার্য শঙ্কর এই বস্তুকে নিত্যসত্তা ও কূটস্থ বলেছেন। ইংরাজীতে নিত্য-বস্তুকে বলে lasting Existence (অবিনশ্বর সত্তা)। এই Existance-ই

ব্রহ্মসংবিদ্ বা Consiousness. মোটকথা যা অবিনাশী ও এক অবস্থায় থাকে তাই বস্তু।[১] এ' ব্রহ্মবস্তুর জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; আদি নাই, অন্ত নাই; চিরদিন একই ভাবে আছে ও থাকে। তাই ব্রহ্মচৈতন্যকে আচার্য শঙ্কর বলেছেন—'বস্তু'। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "ঈশ্বরই সৎ কিনা নিত্যবস্তু।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব আরও বলেছেন: "সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার যে, কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য, ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু।" তারজন্য উপায়রূপ সাধন-ভজনের কথা তিনি বলেছেন ও বল্‌তে গিয়ে একথাও বলেছেন: "তাঁর নাম-গুণ গান, বস্তুবিচার—এই সব উপায় অবলম্বন কর্‌তে হয়।" তারপর বলেছেন—কামিনী-কাঞ্চন। কামিনী-কাঞ্চনের সত্যকারের অর্থ আসক্তি বা মায়া। এ আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন সকল নারীতে মাতৃবুদ্ধি কর্‌তে, কেননা নারীজাতিই আদ্যাশক্তি মহামায়া। শ্রীমা সারদাদেবীকে তিনি বলেছিলেন, 'যে মা মন্দিরে (শ্রীশ্রীভবতারিণী-রূপে) বিরাজিতা, সে মা-ই আমার পদসেবা কর্‌ছেন।' দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমা যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের পদসেবা করছিলেন তখন শ্রীমাকে তিনি এ'কথা বলেছিলেন। ফলহারিণী কালীপূজার ঘোর অমানিশার রাত্রে একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে ষোড়শীরূপে পূজা করেছিলেন বিশ্বের সকল নারীমূর্তিই যে জগন্মাতার মূর্তি এই আদর্শ উপলব্ধি ও প্রচার করার জন্য। তাই যখন তিনি বলতেন 'কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য' বা 'কামিনী-কাঞ্চনে যেন মন না বসে', তখন ক্ষণস্থিতিশীল সংসারপ্রবৃত্তিরই তিনি নিন্দা করেছেন। বস্তুবিচারপ্রসঙ্গে উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন: "হাঁ, বস্তুবিচার! এই দেখ, টাকাতেই (কাঞ্চনেই) বা কি আছে, আর সুন্দর দেহেই (কামিনীতেই) বা কি আছে! বিচার কর যে, সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড়, মাংস, চর্বি, মল, মূত্র—এই সব আছে। এই সব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়! কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়!" 'কেন মন দেয়' বা 'কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়'—এই 'কেন'-র উত্তর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভালভাবেই জানতেন, কিন্তু তবুও তিনি বলেছিলেন—'কেন'!

১। জর্জ সান্তায়ন্ বা ডিউক হিকস্ হোল্ট্ প্রভৃতি আমেরিকান ও ইংরেজ দার্শনিক যাকে 'ম্যাটার' বলেছেন, ব্রহ্মচৈতন্য সে বস্তু নয়। কান্ট্, ব্রাড্‌লে প্রভৃতি দার্শনিকদের দৃষ্টি তাঁদের থেকে ভিন্ন।

এ প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্করের (ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের) কথাই মনে পড়ে : "নৈসর্গিকঃ অয়ং লোকব্যবহারঃ।" নৈসর্গিক বল্‌তে স্বাভাবিকভাবে অনাদিকাল ধরে সে লোকব্যবহার চলে আসছে। লোকব্যবহার মানুষের সাধারণ আচরণ। ভাষ্যরত্নপ্রভায় শ্রদ্ধেয় রামানন্দ সরস্বতী লোক-ব্যবহারের 'লোক' ও 'ব্যবহার' শব্দদু'টির উপর আলোকপাত ক'রে বলেছেন : "লোক্যতে মনুষ্যোহমিত্যাভিমন্যতে ইতি লোকঃ অর্থাধ্যাসঃ। তদ্বিষয়ো ব্যবহারোঽভিমান ইতি জ্ঞানাধ্যাসো দর্শিতঃ।" মোটকথা যা—যা নয় তাতে সেই অভিমান করার নাম অধ্যাস। রজ্জু সর্প নয়, কিন্তু রজ্জুতে সর্পের (সর্পাভিমানের) আরোপ করার নাম অধ্যাস। এখানে অভিমানরূপ অধ্যাস দু'রকমের—ধর্মীর অধ্যাস ও ধর্মের অধ্যাস। একটি, আমি মনুষ্য নই, ব্রহ্মস্বরূপ—এই সত্যতত্ত্ব ভুলে গিয়ে 'আমি মরণশীল মানুষ' অভিমান করা ও অপরটি, মানুষের ব্যবহার বা আচরণে অভিমান করা। অবশ্য 'অভিমান' উভয়ের মধ্যেই আছে। এ অভিমান বা আমার ব'লে মনে করাই সকল-কিছু অনর্থ ও অনিষ্টের মূল। মিথ্যাবস্তুকে সত্যবস্তু ব'লে মনে করাতে ভ্রম হয় ও সঙ্গে সঙ্গে অনর্থ সৃষ্টি হয়। ভ্রম ও অনর্থসৃষ্টির কারণ সদসদ্‌বিচারের অভাব। যথার্থবিচারের অভাবেই মানুষ জীবনে ভুল করে, আর সাধারণ মানুষের পক্ষে ভুল করাই স্বাভাবিক (নৈসর্গিক) হ'য়ে পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মানুষের মধ্যে এই স্বাভাবিক ভ্রমের কথা জেনেও বলেছেন : "মানুষ ঈশ্বরকে (সত্যবস্তুকে) ছেড়ে কেন (মিথ্যাবস্তুতে) মন দেয়। কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়!" এই 'কেন'-শব্দটি আসলে প্রশ্নকারীর বা জিজ্ঞাসুর মনে সংশয় দূর করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "ঈশ্বরের নামগুণ গান সর্বদা করতে হয়", বা "তাঁর নামগুণ গান, বস্তুবিচার—এই সব উপায় অবলম্বন করতে হয়।" কিন্তু নামগুণ গান করলেই কি ঈশ্বর দর্শন হয়? তা হয় না। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন : **খুব ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদলে তাঁকে (ঈশ্বরকে) দেখা যায়**। ডাকার মতো ডাক্‌তে হয়।" এ'কথা বলেই তিনি একটি গান ধরলেন,

ডাক্ দেখি মন ডাকার মতো
কেমন শ্যামা থাক্‌তে পারে।

কেমন শ্যামা থাক্‌তে পারে,
কেমন কালী থাক্‌তে পারে।
মন যদি একান্ত হও,
জবা বিল্বদল লও
ভক্তিচন্দন মিশাইয়ে
(মার) পদে পুষ্পাঞ্জলি দাও। প্রভৃতি

শ্যামা মা চৈতন্যময়ী। সচ্চিদানন্দময়ী শ্যামা এবং কালী এক ও অভেদ। কালী কালো—কৃষ্ণবর্ণ, কেননা বিশ্বসংসারে যত রঙ্ বা বর্ণ আছে তিনি তাঁদের সমষ্টিমূর্তি। সাধকেরা বলেন, এক মনে ডাক্‌লে ও প্রার্থনা করলে শ্যামা-মা দেখা দেন। তাই এক মনে ব্যাকুলতার সঙ্গে ডাক্‌তে হয়। গান শেষ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বল্লেন: "ব্যাকুলতা হলেই অরুণ উদয় হোল। তারপর সূর্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বরদর্শন।" ব্যাকুলতার অপর নাম অনন্য ও একান্ত ভক্তি ও আকর্ষণ। জানার ও পাওয়ার আকুল ইচ্ছাই ব্যাকুলতা। এ' তত্ত্বকে তিনি বিশদভাবে বিশ্লেষণ ক'রে বলেছেন,

(১) "তিন টান হ'লে তবে তিনি দেখা দেন:
(ক) বিষয়ীর বিষয়ের উপর (টান);
(খ) মায়ের সন্তানের উপর (টান);
(গ) সতীর পতির উপর টান।"

(২) "কথাটা এই, ঈশ্বরকে ভালবাস্‌তে হবে—মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালবাসে। এই তিন জনের ভালবাসা—এই তিন টান একত্র করলে যতখানি হয় ততখানি ভালবাসা ঈশ্বরকে দিতে পারলে তাঁর (ঈশ্বরের) দর্শন হয়।"

(৩) "ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে (ঈশ্বরকে) ডাকা চাই। বিড়ালের ছানা কেবল মিউ মিউ ক'রে মাকে ডাক্‌তে জানে। * * * মা যেখানেই থাকুক, এই মিউ মিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে।"

যতটুকু আলোচনা হলো তাঁর উপর ভিত্তি ক'রে গোড়ার কথাগুলি পুনরায় আলোচনা করা যাক্। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: (ঈশ্বর-দর্শনের জন্য) "ঈশ্বরের নামগুণ গান সর্বদা করতে হয়। আর সৎসঙ্গ * * *।" ঈশ্বরের নামগুণ গান করাকে 'ভজন' বলে। অন্তরের আকুলতা, ঈশ্বরে

বিশ্বাস, নিবিড় ভাব ও ভক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের নাম ও মহিমা কীর্তন করার নাম ভজন। ভারতবর্ষে ভজনগানে ভক্তি ও ব্যাকুলতার প্রলেপ অধিক। সাধিকা মীরাবাঈ, সাধক রামদাস প্রভৃতি ও দক্ষিণ-ভারতের পুরন্দরদাস, ত্যাগরাজ, শ্যামাশাস্ত্রী প্রভৃতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ঈশ্বরের নামগুণ গান করতেন। উত্তর-ভারতে ঈশ্বরের গুণ ও মহিমাকীর্তনের নাম 'ভজন' ও 'কীর্তন', আর দক্ষিণ-ভারতে তার নাম 'কৃতি'। নিবিড়তম ব্যাকুলতার সঙ্গে অন্তরের আবেদন থাকলেই মহিমাগান সার্থক হয়। প্রাচীন ভারতের প্রবন্ধগানগুলি যেমন ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ প্রভৃতির অধিকাংশই ভজনশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। শ্রীরাম-প্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতিসাধকদের গানে ভজনের ভাব বর্তমান।

এখন প্রশ্ন এই যে, ঈশ্বরের নামগুণ-গানে ভক্তি কেমন ক'রে আসে! শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "ভক্তি লাভ করতে হ'লে নির্জন হওয়া চাই। মাখন তুলতে গেলে নির্জনে দই পাত্‌তে হয়।" তিনি আবার বলেছেন: "এই মনে (চঞ্চল মন নিয়েও) নির্জনে ঈশ্বর চিন্তা করলে জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি লাভ হয়। * * তাই নির্জনে সাধনার দ্বারা আগে জ্ঞান-ভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে, সেই মাখন সংসার-জলে ফেলে রাখলেও (জলে) মিশবে না" প্রভৃতি।

মোটকথা জ্ঞান, ভক্তি, ব্যাকুলতা ও বিবেক-বৈরাগ্য লাভ করতে হ'লে নির্জনে (নির্জন স্থানে) সাধন-ভজন করা দরকার। এখানে 'নির্জন' বা নির্জনতা বলতে বুঝি কি? যেখানে কোন জনসমাগম থাকে না, বা যেখানে কোন কোলাহল বা গোলমাল থাকে না, তাকেই নির্জনতা ও নির্জন স্থান বলে। এখন কথা এই যে, লোকজনের সমাগম না হয় না থাকলো, কিন্তু পশুপক্ষীদের উপদ্রব কোন স্থানে থাকলে তাকেই বা নির্জন স্থান বলি ক্যামন ক'রে! সুতরাং নির্জনের 'জন' বলতে 'প্রাণী' অর্থ গ্রহণ করাই ভাল। কোন প্রাণীহীন নিরূপদ্রব ও নিঃশব্দ স্থানকেই নির্জন বলা যেতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "ধ্যান করবে বনে, মনে ও কোণে।" এদের মধ্যে 'কোণ'-শব্দটির সাধারণ ও সরল অর্থ কোন ঘরের দু'টি দেওয়াল যেখানে মিশেছে সেখানে যে সীমিত ও সঙ্কীর্ণ স্থান, লোক-সমাবেশের সম্ভাবনা থাকেনা বা কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটার অবকাশ নাই—তাই

কোণ। আর 'বনে' বল্‌তে লোকালয়ের বাইরে বা জঙ্গলে। প্রাচীন যুগের সাহিত্যে ও কাব্যে পুণ্য-তপোবনের উল্লেখ পাই। বৃক্ষলতাপরিবৃত অরণ্যে লোক-সমাগমের প্রায় সম্ভাবনা থাকে না, তাই নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতা সেখানে স্বাভাবিক। ধ্যানধারণারও তা অনুকূল স্থান। তবে সাধারণ বা অসাধারণ গৃহবাসী গৃহস্থের পক্ষে (বাড়ীর) কোন কোণে (সীমায়িত নির্জন স্থানে) ধ্যান-ধারণা করাই শ্রেয় ও সুবিধা। কিন্তু মনে রাখ্‌তে হবে, তাই ব'লে শ্রীরামকৃষ্ণদেব মন্দিরে, দেবালয়ে বা কোন পবিত্র স্থানে ধ্যান করতে নিষেধ করেন নি, সে সকল স্থানের পরিবেশ পবিত্র ও ধ্যানের অনুকূল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "ধ্যান করবে মনে।" মনে কিনা মনে মনে (মানসিক) জপ, উপাংশু বা জোরে মন্ত্র-উচ্চারণ ক'রে জপ করার নাম ধ্যান করা নয়। নির্জন বা সজন স্থানে বসে যদি বিচারের সাহায্যে মনের তরঙ্গায়িত বিচিত্র বৃত্তিকে দমন অর্থে একটি কেন্দ্রে স্থির করা যায়—তার নামও ধ্যান। মোটকথা স্থির ধীর অচঞ্চল মনই ধ্যান ও একমুখী চিন্তার অনুকূল।

আপনার নির্বাচিত ও অভিপ্রেত (ইষ্ট) দেবতায় বা অন্য কোন দেব-দেবীর মূর্তিতে মনকে সম্পূর্ণভাবে স্থির করার নামও ধ্যান। তাই 'মনে ধ্যান' বল্‌তে স্থির ধীর মনই ধ্যানের অবস্থা। এই ধ্যানের নাম 'যোগ'। রাজযোগে ধ্যান একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। চিত্তবৃত্তিকে দমন অর্থাৎ স্থির (কেন্দ্রীভূত) করার নাম যোগ। তেমনি ধ্যানযোগ। চিত্তবৃত্তির একমুখীতা ও লক্ষ্যে স্থিরস্থিতির নাম ধ্যান। তবে মন যে দুর্দমনীয় ও চিরচঞ্চল একথা সকলেই জানে।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে মনের স্বভাব-সম্বন্ধে বলেছেন: "চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।" মনকে শক্তি প্রয়োগ ক'রে দমন করা দুরূহ। যোগবাশিষ্ট-রামায়ণে বশিষ্টদেব মনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন: "মর্কটঃ মদিরোন্মত্তঃ বৃশ্চিকেন হি দংশিতঃ" প্রভৃতি। বানর স্বভাবতই চঞ্চল, তারপর তাকে মদ খাওয়ানো হয়েছে, বিছে কাম্‌ড়েছে এবং ভুতে পেয়েছে, সুতরাং তার চঞ্চলভাব কিরকম তা সহজেই বুঝা যায়। অথচ অধ্যাত্মজীবনকে জ্ঞানদীপ্ত ও সার্থক করতে হ'লে মনের দুর্দমনীয় গতি ও চঞ্চলতাকে স্থির করতে হয়,

কেননা স্থির না করলে মন কোন লক্ষ্যে স্থিত হয় না। এই স্থির করার উপায়-রূপে ঋষি পতঞ্জলি ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই অভ্যাস ও বৈরাগ্যের কথা বলেছেন। ঋষি পতঞ্জলি পাতঞ্জলদর্শনে বলেছেন : "অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ", —অভ্যাস ও বৈরাগ্যের সাহায্যে চঞ্চল মনকে নিরুদ্ধ বা স্থির করতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন : "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে", অর্থাৎ অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে গ্রহণ অর্থাৎ বশীভূত করতে বলেছেন।

অভ্যাস ও বৈরাগ্য বলতে কি বুঝি? ঋষি পতঞ্জলি বারবার যত্ন বা প্রচেষ্টা করাকে অভ্যাস বলেছেন : "তত্র যত্নোঽভ্যাসঃ"। অভ্যাস পরে স্বভাবে পরিণত হয়—'habit is the second nature'। বিষয়-ভোগে যে তৃষ্ণা তাতে বিতৃষ্ণার নাম বৈরাগ্য। বি-রাগ কিনা বিবিক্ত বা পরিত্যক্ত রাগ বা আসক্তি। মোটকথা মন নিরাসক্ত হ'লে বৈরাগ্যের ভাব প্রকাশিত হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্য ধ্যানকর্মের সহায়ক ও উপায়। শুধু ধ্যান কেন, সকল রকম কর্মানুষ্ঠানে ধ্যান সহায়ক। তাই সাধকমাত্রের কর্তব্য স্বভাবচঞ্চল মনকে স্থির করা। ধ্যেয়বস্তু ছাড়া অন্য বস্তু মনে এলেই তাকে বারবার চেষ্টা ক'রে সরিয়ে দেওয়া দরকার। বারবার চেষ্টা উপরতির নামান্তর। উপরতিতে বারবার বিষয়বস্তুর স্মৃতি এলে তাকে সরিয়ে দিতে হয়। উপরতির পর ধ্যান বা মনের স্থির ধীর শান্ত অবস্থা,—যেমন মক্ষিকা মধুপানের জন্য সকল ফুলে ঘুরে বেড়াবার পর কোন একটি ফুলে মধুর সন্ধান পেলে তাতেই স্থির হ'য়ে ব'সে মধু পান করে। তেমনি আমাদের চঞ্চল মনকেও একটি লক্ষ্যে স্থির ক'রে শান্তিমধু পান করাতে হয়।

মনের স্থির অবস্থার নাম ধ্যান। বায়ুশূন্য স্থানে একটি প্রদীপ রাখলে যেমন তার শিখা হেলে না—দোলে না, স্থির ও অচঞ্চল থাকে, তেমনি বৃত্তিশূন্য মন স্থির-ধীর-শান্ত প্রদীপশিখার মতো। অনেক শাস্ত্রকার ধ্যানবস্থার মনকে তৈলধারাবৎ বিচ্ছেদবিহীন একমুখী বলেছেন। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, ধ্যানাবস্থায় একবৃত্তিযুক্ত মনেও বিচারবৃত্তি থাকে—যদিও সে বিচারবৃত্তি ইষ্টবৃত্তি বা অভিপ্রেত ইষ্টদেবতার রূপবৃত্তি ছাড়া অন্য-কিছু নয়। ঐ রূপবৃত্তিই অপরাপর রূপকে সরিয়ে দিয়ে ইষ্টদেবতার উপর মনের স্থিতিকে সার্থক করে। সদসদ্‌বিচারবৃত্তি যেমন অসদ্‌বৃত্তিতে দূর হ'য়ে

সদ্‌বৃত্তিতে স্থিতি লাভ করে, তেমনি ধ্যানে সজাতীয় বৃত্তি থাকে, আর বিজাতীয় বৃত্তি বিলুপ্ত হয়। যথার্থ ধ্যানীমাত্রেই এ' রহস্য জানেন।

বিচারবৃত্তি কি ও বিচার কাকে বলে? শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন সর্বদা বিচার করতে। এই বিচার হোল: ঈশ্বরই সৎ কিনা নিত্যবস্তু, আর সব অসৎ বা অনিত্য। বিচারে মন একটি লক্ষ্যে স্থির হয়, আর ধ্যানের সময়ে ধ্যানবৃত্তি ধ্যেয়বস্তুতে লীন হয়, একাকার হয়। একেই বলে মনোলয়। মনোলয় বল্‌তে মন একেবারে শূন্যে লীন হয় না। মনোলয় বল্‌তে মনের স্বরূপ-অবস্থা যে চৈতন্য সেই চৈতন্যে মন রূপান্তরিত হয়। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ধ্যানপ্রসঙ্গে বলেছেন: "The mind is transformed into consciousness"। মনোলয় বা মনোবৃত্তির লয় হ'লে নিবাত নিষ্কম্প শুদ্ধচৈতন্যের প্রকাশ হয়। শাস্ত্র মনোলয়ের প্রসঙ্গে মনের যে স্বাভাবিক বৃত্তি সংকল্প ও বিকল্প তাদের লয় বলেছে। সুতরাং বৃত্তির লয় হ'লে মন স্বরূপে ফিরে আসে, যেমন তরঙ্গায়িত জল স্থির হ'লে স্থির ও শান্ত জলমাত্র থাকে। ধ্যানে বৃত্তিবিহীন মন তখন চৈতন্যরূপী ইষ্টদেবতা-রূপ লক্ষ্যে স্থির ও একাকার হয়। এরই নাম জলে জল মিশে যাওয়া—বোধে বোধ। তখন বহু বা দ্বিধাবিভক্ত চৈতন্য এক ও অখণ্ড চৈতন্যে পর্যবসিত হয়। এ অবস্থাই ধ্যানের সার্থক ও পরিপূর্ণ রূপ।

প্রতিটি মানুষকেই বাসনা-কামনার সংসারে বাস করতে হয়, অথচ বাসনা-কামনার সংসারে থেকে নির্বাসনা ও নিষ্কামনা না হ'লে মুক্তি নাই, যথার্থ শান্তি ও আনন্দ নাই। মনই বাসনা কিনা পুঞ্জীভূত সংস্কারের ভাণ্ডার। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, সরষের পুঁটুলি, বা ন্যাতাকাতার হাঁড়ির কথা। মনের যে সংকল্প ও বিকল্প দু'টি বৃত্তি, তাদের নাম প্রবৃত্তির বাসনা ও নিবৃত্তির বাসনা—যাদের ইংরাজীতে বলা যেতে পারে পজেটিভ ও নেগেটিভ তথা ইতিবাচক ও নেতিবাচক বাসনা। বৃত্তিদুটি আসলে বাসনাই। বৃত্তিদুটি অসংখ্য বাসনা-কামনার মূলীভূত কারণও। তাই সকল বাসনাকে দূর ক'রে মনকে শান্ত করতে হলে কারণরূপী সংকল্প ও বিকল্প-বৃত্তিদুটিকে দূর করতে হয়, আর তবেই মনের স্বরূপ অবস্থা ফিরে আসে।

মনের বৃত্তি বা মনের বাসনা-কামনাকে দূর করতে হ'লে বিচার চাই। প্রবৃত্তিকে দূর ক'রে নিবৃত্তি বা নির্বাসনা-অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা দরকার। বিচার কিনা কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য, ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়—এই পর্যন্ত। কিন্তু এতে ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না—এরই নাম বিচার।" 'সঙ্গে সঙ্গে' বল্‌তে সংসারও করবে আর সেই সঙ্গে নিত্যানিত্য বস্তুবিচারও করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন : "হ্যাঁ, বস্তুবিচার! এই দেখ, টাকাতেই বা কি আছে, আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে! বিচার করো—সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড়, মাংস, চর্বি, মল, মূত্র—এই সব আছে!" এর নাম বিচার। বিচার করার পর বুঝা যায় যে, মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে বাসনার সংসারে আবদ্ধ হয়, ফলে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে সে বারবার যাতায়াত ও বন্ধনযন্ত্রণা ভোগ করে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "সব কাজ করবে, কিন্তু মন ঈশ্বরে রাখ্‌বে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা—সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক! কিন্তু মনে জান্‌বে যে, তারা তোমার কেউ নয়।"

লক্ষ্য করার বিষয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকলকেই সংসার ত্যাগ করতে বলেন নি। তবে সত্যকারের যাঁরা ত্যাগী বা বৈরাগ্যবান সন্ন্যাসী, তাঁদের কথা আলাদা। তাঁরা কর্মের সংসারে থাকেন, কিন্তু কর্মকে ভগবানের সেবা জ্ঞান ক'রে জীবনযাপন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব গৃহবাসী গৃহস্থগণকে সেবার ভাব ও আদর্শ অনুসরণ করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন : "স্ত্রী, পুত্র, বাপ মা—সকলকে নিয়ে থাকবে ও (তাদের) **সেবা করবে**।" এই সেবার ভাব এ ধরণের হবে যে, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, স্বজন-পরিজন সকলেই ভগবানের সন্তান, সুতরাং তাঁদের সেবা করার অর্থ ভগবানের সেবা করা। এ সেবাই উপাসনার রূপ ধারণ করে। তাছাড়া হৃদয়ে সেবার ভাব থাকলে মন থেকে আত্মাভিমান ও অহংকার দূর হয়, মন পবিত্র হয়, মন নমিত হয় ভগবানের দিকে। আসলে নিঃস্বার্থ ও নিরহংকার ভাবে সেবার দৃষ্টিতে সকলকেই ভগবানের সন্তান ব'লে মনে হয়। তখন সকলকেই আপনার জন বলে মনে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'যখন সেবা করবে, তখন ভাব্‌বে তারা যেন কত আপনার লোক।' এখানে 'যেন'-শব্দটির মধ্যে সন্দেহ-আন্দোলিত

অনিশ্চয়তার ভাব লুকোনো আছে। সুতরাং বুঝা যায় যে, সংসারে যাদের সঙ্গে অহরহঃ আমরা মেলামেশা ও বাস করি, তারা সত্যকারের 'আপনার জন' নন, কেননা চিরদিনের নিত্যসাথী হ'লে কোনদিনই তারা আমাদের ত্যাগ ক'রে অজানা নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করতো না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "কিন্তু মনে জানবে যে, তারা তোমার কেউ নয়।" এ'ভাবটিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য একজন মরমী গেয়েছেন,

'মন, চল নিজ নিকেতনে।
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে॥ প্রভৃতি

সংসার বিদেশ। এই বিদেশে বাস ক'রে আমরাও বিদেশী মানুষ হ'য়ে পড়েছি। অথচ স্বদেশ একটা আছে। সেই স্বদেশ হোল ব্রহ্মপুর—যেখানে আত্মা অনির্বাণ দীপশিখার মতো সর্বদাই প্রজ্জ্বলিত। সুতরাং ব্রহ্মনির্বাণ ও পরমশান্তির পুরই 'নিজ নিকেতন'। মানুষের আপন দিব্যস্বরূপই নিজ নিকেতন।

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে, ব্রহ্মকে 'পুর' বলা সঙ্গত কিনা! উপনিষদে আমরা 'ব্রহ্মধাম', 'ব্রহ্মলোক' প্রভৃতির শব্দের উল্লেখ পাই। রাহুর শির বলতে যেমন রাহুকেই বুঝায়, তেমনি ব্রহ্মধাম বা ব্রহ্মপুর বলতে ব্রহ্মকেই বুঝায়। অর্থাৎ ব্রহ্মই ধাম বা পুর। মুণ্ডক উপনিষদে আছে,

(ক) 'তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম' (৩।৪)। আচার্য শঙ্কর ভাষ্যে বলেছেন : "সর্বাশ্রয়ভূতং ব্রহ্ম", অর্থাৎ 'ধাম' অর্থে ব্রহ্মস্বরূপ—যিনি সকলের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়।

(খ) 'তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে…'(৩।৬), অর্থাৎ মৃত্যুর পর জ্ঞানী ব্রহ্মভাবাপন্ন হন। আচার্য শঙ্কর বলেছেন : "ব্রহ্মৈব লোকো ব্রহ্মলোকঃ"। ব্রহ্ম ও লোক এখানে এক ও অভিন্ন। ব্রহ্মলোক বলতে স্বর্গকেও বুঝায়। যেমন 'এষ বঃ পুণ্য সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ'(১।৬)। আচার্য শঙ্কর ভাষ্যে বলেছেন : "ব্রহ্মলোকঃ স্বর্গঃ প্রকারণাৎ"। তাছাড়া অন্তঃকরণ বা হৃদয়পদ্মকেও ব্রহ্মপুর বলে : "দিব্যে দ্যোতনবতি…ব্রহ্মপুরে মনসি"। উপনিষদের বহু স্থানেই ধাম ও লোক ব্রহ্মের স্বরূপ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে দেখা যায়। ব্রহ্মপুরের বর্ণনা করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন,

একরূপ অরূপ নাম-বরণ,
অতীত আগামী কালহীন,
দেশহীন সর্বহীন
নেতি নেতি বিরাম যথায়। প্রভৃতি

সৃষ্টি যখন কারণ-ব্রহ্ম ঈশ্বর থেকে আরম্ভ হয় তখনই নাম ও রূপের প্রকাশ হয়। তখন তার নাম হয় কার্য-ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি। নির্গুণ-ব্রহ্ম সকলের কারণ অর্থাৎ কারণের কারণ। সে'জন্য তাঁকে তুরীয় বলা হয়। সৃষ্টি কারণ ও অব্যক্ত আকারে ছিল প্রকৃতিগর্ভে, নাম ও রূপ নিয়ে প্রকাশ পায় ব্যক্ত আকারে। এই সৃষ্টি ও প্রলয়ের লীলা জ্ঞানীর কাছে প্রতিভাত হয় মায়ারই কার্যরূপে, কিন্তু জ্ঞানহীন অবিবেকী মানুষ তাকে সত্য ব'লে গ্রহণ করে ও তাতে আসক্ত হয়। অজ্ঞানের সংসারে অকারণই আমাদের ভ্রমণ ('ভ্রমণ কেন অকারণে')। এ কথার মর্ম অজ্ঞানী যথার্থভাবে গ্রহণ করতে পারে না। বিদেশকেই সে স্বদেশ ব'লে গ্রহণ করে ও বন্ধনকে মুক্তির আলোক ব'লে গ্রহণ ক'রে দুঃখ পায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "বিচার করতে করতে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ করবে ও নিত্য বস্তুকে গ্রহণ করবে।"

ঈশ্বরের নামগুণ গান ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "আর সাধুসঙ্গ। ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু—এঁদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের মধ্যে ও বিষয় কাজের ভিতর রাতদিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না।" জিজ্ঞাসা হ'তে পারে, ভক্ত ও সাধু কারা? ভগবানকে যারা পরমবস্তু ব'লে মনে করেন তাঁরাই ভক্ত। ভক্ত ভক্তিযোগের মধ্য দিয়ে ভগবানকে ভজনা করেন, আর জ্ঞানী বিচার করেন। জ্ঞানী জ্ঞানযোগের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করেন। সৎপ্রবৃত্তিযুক্ত বৈরাগ্যবান সন্ন্যাসীই 'সাধু'। অথবা যাদের মধ্যে সাধুবৃত্তি থাকে তাঁরাই সাধু—তাতে তাঁরা গৃহস্থই হোন, আর সন্ন্যাসীই হোন। সাধু যাঁরা আত্মস্বরূপকে তাঁরা উপলব্ধি করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই ঈশ্বরপ্রেমিক ভক্ত ও আত্মজ্ঞানী সাধু সন্ন্যাসীদের সংস্পর্শে আসার জন্য বলেছেন। ভক্ত ও সাধুর সংস্পর্শে এলে সংসারী মানুষের মধ্যেও সৎ-সংস্কার সৃষ্টি হয়, অন্তর পবিত্র হয় এবং ক্রমে সংসারমুখী মন ঈশ্বরমুখী হ'য়ে শান্তিলাভ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আরও বলেছেন : "যখন চারাগাছ থাকে, তখন তার চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে।" চারাগাছ বল্‌তে সাধনার ক্ষেত্রে প্রবর্তক সাধক। প্রবর্তক সবে মাত্র সাধন-জগতে অবতরণ করেছে। যারা সাধনক্ষেত্রের প্রাথমিক স্তরে থাকেন তাঁদের বিফলমনোরথ হবার ভয় থাকে। তাই সংযত জীবন, নিষ্ঠা, পবিত্র চিন্তা, শ্রদ্ধা, ঈশ্বরবিশ্বাস প্রভৃতি থাকা তাঁদের জীবনে একান্ত প্রয়োজন। এ সকল তাঁদের বেড়ার মতো রক্ষাকবচ। সাধনার পথ বড়ই দুর্গম ও পিচ্ছিল —'দুর্গম্ পথস্তৎ'। তাই তাঁদের জীবনে সর্বদা সদসদ্‌বিচার ও সাধনায় উন্নতির জন্য আত্মপ্রত্যয় একান্ত প্রয়োজন। গুরুর সতর্ক ও সহৃদয় দৃষ্টি তো তাঁদের পিছনে থাকেই।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

॥ নিষ্কাম-কর্ম করা কঠিন ॥

"শ্রীরামকৃষ্ণ। তবে নিষ্কাম-কর্ম ভাল, তাতে অশান্তি হয় না। কিন্তু নিষ্কাম-কর্ম করা বড় কঠিন। মনে করছি নিষ্কাম-কর্ম করছি, কিন্তু কোথা থেকে কামনা এসে পড়ে—জানতে দেয় না। আগে যদি অনেক সাধন থাকে, সাধনের বলে কেউ কেউ নিষ্কাম-কর্ম করতে পারে। ঈশ্বরদর্শনের পর নিষ্কাম-কর্ম অনায়াসে করা যায়। ঈশ্বরদর্শনের পর প্রায় কর্ম ত্যাগ হয়। দুই একজন (নারদাদি) লোকশিক্ষার জন্য কর্ম করে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ (১৮৮৩), পৃঃ ১৩৩

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশেষভাবে নিষ্কাম-কর্ম-সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এই নিষ্কাম-কর্মের নাম কর্মযোগ। কর্মযোগ বা নিষ্কাম-ভাবে কর্মসাধনা ঈশ্বরলাভের অন্যতম উপায়। কর্মসাধনা ফলাকাঙ্খাহীন হ'য়ে ঈশ্বরের প্রীতির জন্য করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ গীতা ৩।৩

শ্রীরামকৃষ্ণদেব জ্ঞান, কর্ম, যোগ (রাজযোগ) ও ভক্তি এই চারটি সাধন-পদ্ধতিকে ঈশ্বর-লাভের উপায় বলেছেন। এখানে কর্মযোগ বলতে ফলাভি-সন্ধিহীন কর্ম বা বিশ্বকল্যাণের জন্য কর্ম।

অনেকে কর্মের সংসারে কর্মকে এড়াতে (avoid করতে) চেষ্টা করে। তারা কর্মকে বন্ধন মনে করে। শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল লোককে 'মিথ্যাচারী' বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় মন ও মুখ যাদের এক নয়, তারাই

মিথ্যাচারী। সাধারণ ভাষায় মিথ্যাচারীকে কর্মে পলায়নীবৃত্তিযুক্ত হিপোক্রিট্ বলে। মিথাচারীরা নিজেদেরও প্রতারণা করে। তাতে তাদের অনিষ্ট হয়। অনেকে বলে, মনের পাপ পাপ নয়, কিন্তু তা ঠিক নয়। কল্পনা প্রথমে, তারপর কর্ম। কল্পনা প্রথমে, তারপর কল্পনাই বাস্তব রূপে বাইরে প্রকাশ পায়। সুতরাং যেটা কল্পনার আকারে উদয় হয় মনে, সেটাই বাইরে কর্মের আকারে প্রকাশ পায়। সুতরাং মনে অন্যায় চিন্তা করলে তার ফল অন্যায়ই হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাও তাই যে, মনে যা ভাব্‌বে, কাজে তাই করবে, তার অন্যথাচরণ ঠিক নয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ একথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলেছেন,

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢাত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ গীতা ৩।৬

তিনি পুনরায় বলেছেন,

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকেঽয়ং কর্মবন্ধনঃ। গীতা ৩।৯

'যজ্ঞ' অর্থে কামনাশূন্য হ'য়ে ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কর্ম, নিজের জন্য নয়। পূজার মনোবৃত্তি নিয়ে কর্ম না করলে কর্ম বন্ধনের সামিল হয় সাধারণতই মানুষের কর্মফলে আসক্তি হয়। এ'জন্য শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন: 'তস্মাদ্ অসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচার' (৩।১৯)। অসক্ত অর্থাৎ কর্মফলে আসক্তিহীন হ'য়ে কর্ম করলে মানুষ কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয় না। তখন 'পরমাপ্নোতি পুরুষঃ' (৩।১৯)—মানুষ পরমপদ (ব্রহ্মপদ) প্রাপ্ত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথার মর্ম ও উপদেশ তাই। নিষ্কাম-কর্মের অর্থ কর্ম করলেও ফলে আকাঙ্খা থাকবে না। অবশ্য ঈশ্বর দর্শন হ'লে কর্মের ফলে মানুষের আর স্বার্থের আসক্তি থাকে না। তখন 'কর্ম ত্যাগ হয়। অর্থে কর্মের সংসারে কর্ম করলেও তা কর্মবন্ধন সৃষ্টি করে না। কর্ম তখন জনকল্যাণের জন্য বা ঈশ্বরের প্রীতির জন্য মানুষ করে। দড়ির বন্ধনশক্তি আছে, কিন্তু পোড়া-দড়ির বন্ধনশক্তি থাকে না। ঈশ্বর দর্শন হ'লে (বা ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে) সকল কর্মপ্রচেষ্টাই তখন ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশ্যে করা হয়—'আহার কর, মনে কর, আহুতি দেই শ্যামা মাকে', 'নগর ফের মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা-মাকে'। ঈশ্বর-দর্শনের পর কর্মক্ষয় হয় বলতে কর্মের ফলে আর আসক্তি থাকে না। তখন নিরাসক্ত মনের ও দেহের কর্ম মুক্তির সহায়ক হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ গীতা ৪।১৮

যে বুদ্ধিমান অর্থাৎ জ্ঞানবান ব্যক্তি কর্মে অকর্ম (আত্মস্থিতি বা আত্মসত্তাকে) এবং অকর্মে (কর্মাতীত কূটস্থ আত্মায়) কর্ম দর্শন করেন (কেননা সকল কর্ম-প্রেরণার আত্মাই উৎস)। তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে জ্ঞানী ও যোগযুক্ত।

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকের পূর্বে বলা হয়েছে: "গহনা কর্ম্মণো গতিঃ" (১।১৭)। 'গহনা' অর্থে দুর্বিজ্ঞেয়, বা সহজে জানা যায় না। কর্ম (বিকর্ম) ও অকর্মের সত্যকারের স্বরূপ বুঝা কঠিন। পুনরায় গীতার ৪।১৮ শ্লোকে বলা হয়েছে: "যঃ কর্মণি অকর্ম পশ্যেৎ, (তথা) যঃ অকর্মণি কর্ম চ পশ্যেৎ।" যা অকর্ম বা পরমার্থ সদ্‌বস্তু, তা অজ্ঞানীর কাছে কর্মের মতো মনে হয়, কিন্তু জ্ঞানী আত্মায় কোন কর্ম (চাঞ্চল্য) দেখেন না। নদীর উপর দিয়ে যখন নৌকা চলে, তখন নৌকার আরোহীরা কূলে অবস্থিত বৃক্ষ, গৃহ, ও সকল-কিছুকে চলমান দেখে, অথচ মোটেই তারা চলমান নয়। আনন্দগিরি গীতাভাষ্যের (শাঙ্করভাষ্যের) টীকায় এ' উপমাই দিয়েছেন।[১] তাছাড়া বহুদূর থেকে চলমান কোন বস্তুকে লোকে ভুল ক'রে অচঞ্চল (গতিহীন) দেখে। অবশ্য এ' দেখা চোখের ভুল। ঠিক সে'রকম কর্মের সংসারে বাস ক'রে মানুষ কর্মহীন অচঞ্চল আত্মাকেও কর্মচঞ্চল ব'লে মনে করে—যদিও সে মনে করা একান্ত ভুল।

কর্মের আশ্রয় দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি, কিন্তু অবিবেকী মানুষ ভুল ক'রে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ধর্ম ও কর্ম আত্মায় আরোপ করে। আচার্য শঙ্কর একে 'অধ্যাস' বলেছেন। একথা সত্য যে, আত্মচৈতন্যের দীপ্তি ও প্রেরণা না পেলে দেহ ও ইন্দ্রিয় কোন কাজই করতে পারে না এবং এমন কি কোন ইচ্ছা বা বাসনাও সৃষ্টি হয় না।[২] কিন্তু এ' রহস্য সাধারণ মানুষ বুঝে না। বুঝে না বলেই সে জীবনে ভুল ক'রে ভাবে আত্মাই কাজ করে ও কাজের ফল আত্মাই ভোগ করে। সেখানে অবিবেকী মানুষ দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আত্মাকে এক ও অভিন্ন ব'লে মনে করে। এ মনে করার নাম অকর্মে কর্ম দর্শন। 'অকর্ম' বলতে তাই সকল কর্মাশক্তিহীন আত্মচৈতন্য। কিন্তু

১। গতিরহিতেষু তরুষু গতিদর্শনবৎ...এবমিত্যাদিনা।

২। অন্তঃকরণবৃত্তিস্তু চিতিচ্ছায়ৈক্যমাগতা। বাসনাঃ কল্পয়ত্যেষ—বাক্যসুধা ১১

অজ্ঞানে মানুষ কর্মকে আত্মারই কর্ম ব'লে মনে করে। এই মনে করার নাম ভ্রম, মিথ্যাজ্ঞান বা অজ্ঞান।

অকর্মের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর বলেছেন, ঈশ্বরের প্রীতির জন্য যে কর্ম তাই অকর্ম, কেননা কর্মে তখন 'আমি' বা 'আমার'-অভিমান (কর্তৃত্বাভিমান) থাকে না। তখন 'আমি কর্তা' মনে না ক'রে সাধক মনে করেন—ঈশ্বরই সকল কর্ম ও সকল-কিছুর কর্তা। তখন দেহে ও ইন্দ্রিয়ে 'আমি'-বুদ্ধি আর হয় না, অসীম আত্মাতেই তখন লক্ষ্য স্থির হয়। তখন কর্ম করলে সকাম না হয়ে নিষ্কাম হয়। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (৪।২০) এ' সম্বন্ধে বলেছেন,

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যাভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥

কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ ক'রে যে কর্ম করা হয় তার নাম নিষ্কাম-কর্ম। মোটকথা ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম কর্মের মধ্যে গণ্য নয়—যেমন পোড়াদড়ি দড়ির মধ্যে গণ্য নয়। ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলেছেন: "জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মত্বাৎ তদীয়ং কর্ম অকর্মৈব সম্পদ্যতে * *। বিদুষা ক্রিয়মানং কর্ম পরমার্থতোঽকর্মৈব, তস্য নিষ্ক্রিয়াত্মদর্শন সম্পন্নত্বাৎ।" সুতরাং যাঁরা আত্মচৈতন্যকেই সকল কর্মের উৎস ও কারণ ব'লে উপলব্ধি করেন তাঁরা সংসারে কর্ম করলেও কর্মফলে আসক্ত হন না। সুতরাং কর্মের সাধনকালে আত্মদৃষ্টির প্রয়োজন। এই আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন স্থিতপ্রজ্ঞের প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন: "সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে" (গীতা ২।৪৬), অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ জ্ঞানীর কাছে কর্মের সংসার ভগবানের সংসার ব'লে মনে হয়। তখন তিনি 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্'—সমগ্র বিশ্ব-সংসার ঈশ্বর বা ব্রহ্মচৈতন্য ছাড়া অন্য কিছু নয়—এরূপ দর্শন করেন। তিনি দর্শন করেন যে, সকল পদার্থের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এক ঈশ্বর থেকেই হয়, সুতরাং বন্ধন না হ'য়ে কর্ম তখন মুক্তির কারণ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিষ্কাম-কর্মকে তাই 'যোগ' বলেছেন। সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন: 'বাসনাতে দে আগুন জেলে, ক্ষার হবে তায় পরিপাটি'। বাসনা বলতে কলাগাছের পেটো ও তাকে পোড়ালে ক্ষার হয়। এখানে 'বাসনা' বলতে বাসনা, সংকল্প বা কর্মফলাসক্তি। বাসনা বা আসক্তির নাশেই ক্ষার-রূপ নিষ্কাম-কর্ম বা কর্মযোগের সার্থকতা।

নিষ্কাম-কর্ম কর্মের মধ্যে গণ্য নয়—যেমন মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয় কফ পিত্ত দূর করে ব'লে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "তবে নিষ্কাম-কর্ম ভাল। তাতে অশান্তি হয় না।" সকাম-কর্মে ফল পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ফল চাইলে বন্ধন। কর্মের ভাল-মন্দ ফলই বাসনা-কামনার জাল সৃষ্টি ক'রে মানুষকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "কিন্তু নিষ্কাম-কর্ম করা বড় কঠিন। মনে করছি নিষ্কাম-কর্ম করছি, কিন্তু কোথা থেকে কামনা-বাসনা এসে পড়ে।" একথা সত্য যে, প্রতিটি কর্মের পিছনে কর্ম করার একটি ইচ্ছা (প্রবৃত্তি) থাকে, আর প্রতিটি ইচ্ছা বা বাসনার পিছনে থাকে অহং-অভিমান। এ 'অহং'-অভিমানই মানুষকে সকল কাজের কর্তা, ভোক্তা, মন্তা (মননকারী) প্রভৃতিতে পরিণত করে। জ্ঞানী (স্থিতপ্রজ্ঞ) যিনি, তিনি জানেন যে, আত্মার আলোকেই বিশ্বচরাচরের সকল কিছু আলোকিত হয়—"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বম্, তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি" (মুণ্ডক ২।১১)। আচার্য শঙ্কর বলেছেন : "স হি তস্যৈব ভাসা সর্বমন্যৎ অনাত্মজাতং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ"। চৈতন্যের প্রকাশ ও প্রেরণা ছাড়া শুধু মানুষ কেন, কোন প্রাণী ও পদার্থই কর্মচঞ্চল হ'তে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ে না। বিজ্ঞানীর দৃষ্টি তাই চৈতন্যদীপ্ত, কিন্তু অজ্ঞানী চৈতন্যের অধিকারী হয়েও নিজেকে অচৈতন্য ভাবে। এ' ভাবার জন্য সে জীবনে ভুল করে ও জড়কে চৈতন্য ও দেহকে আত্মা ব'লে মনে করে। সাধক কমলাকান্ত তাই মানুষের এই অজ্ঞান-সুপ্তি দূর করার জন্য বলেছেন : "তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।" 'তোমার কর্ম তুমি কর মা' এ'কথা বলে জ্ঞানী ও বিচারী, আর সকল কর্মে আমিত্ব আরোপ করে অবিদ্যা। অজ্ঞানী বলে 'আমি করি'। আসলে আমিত্বের অভিমানই অজ্ঞান বা মায়া। 'আমি'-অভিমান তমোগুণ থেকে হয়। তমোগুণ মানুষের বুদ্ধিকে হীন ও ম্লান করে ; মানুষকে বুঝতে দেয় না কোন্‌টি সত্য বা সৎ ও অসত্য বা অসৎ। তার জন্য মানুষ জড়কে চৈতন্য ব'লে গ্রহণ করে, দেহ ও ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলে মনে করে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন : "কিং কর্ম কিং অকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ", অর্থাৎ এমন কি কবি অর্থাৎ মনীষীরাও সময়ে সময়ে কোন্‌টি কর্ম ও কোন্‌টি অকর্ম এ' তত্ত্ব বুঝতে পারেন না। মোহের

জন্যই এ ভ্রম হয়। মোহ মোহিনীশক্তি ও প্রকৃতির গুণ, তাই যথার্থ বিচারী না হ'লে প্রকৃতির মোহিনীখেলায় মানুষ আবদ্ধ হয়।

কিন্তু কর্ম ও অকর্মের স্বরূপ কি? গীতার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা এ'সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কর্মতত্ত্ব ও অকর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায় সকাম ও নিষ্কাম কর্মের আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন: "কিন্তু নিষ্কাম-কর্ম করা বড় কঠিন", কেননা সাধারণ মানুষের মধ্যে 'আমি'-জ্ঞান বা 'অহং'-অভিমান এতই বেশী যে, কোন কাজ করলেই সে তাতে কর্তৃত্বাভিমান আরোপ করে, বলে 'আমি এর কর্তা, মন্তা (মননকারী) ও ভোক্তা', আর তখনই কর্ম সকাম হয়, কর্মের ফলে মন আসক্ত হয়। মানুষ তখন ফলাভিসন্ধী হয় ও সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হয়—"ফলে সক্তঃ নিবধ্যতে'।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'অহং'-অভিমানের প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেছেন: (মানুষের) 'অহং কিন্তু যায় না।' "যে 'আমি'-তে সংসারী করে, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত করে, সে 'আমি' খারাপ। জীব ও আত্মার প্রভেদ হয় এই 'আমি মাঝখানে আছে বলে।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বজ্জাৎ-আমিকে শিষ্ট আমিতে রূপান্তরিত করতে বলেছেন। বলেছেন, যদি 'আমি' থাকেই—তবে 'দাস-আমি' হ'য়ে থাক্। 'দাস-আমি' ঈশ্বরে শরণাগতির আমি। এ' আমি পোড়াদড়ি বা পরিত্যক্ত সাপের খোলসের মতো। এ আমির মাথা শ্রীভগবানের চরণে নত থাকে। পোড়াদড়ি দিয়ে যেমন কোন-কিছুকে বাঁধা যায় না, বা সাপের খোলস যেমন কাকেও কামড়ায় না, তেমনি 'দাস-আমি' অনিষ্ট করে না। আমি ঈশ্বরে আত্মসমর্পিত হ'লে সে আমিতে আর অহং-বুদ্ধি ও মোহ সৃষ্টি হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "দুই একটি লোকের সমাধি হ'য়ে 'অহং' যায় বটে, কিন্তু প্রায় যায় না। হাজার বিচার করো, 'অহং ঘুরে-ফিরে এসে উপস্থিত। আজ অশ্বত্থগাছ[৩] কেটে দাও, কাল আবার সকালে দেখো ফেকড়ী বেরিয়েছে। একান্ত যদি 'আমি' যাবে না, তবে থাক শালা 'দাস-আমি'

৩। গীতায় ও কঠোপনিষদে সংসারকে অশ্বত্থগাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—যদিও সে গাছের মূল উর্ধ্বে ও শাখা নিম্নদিকে বিস্তৃত—"ঊর্ধ্বমূলং অবাক্ শাখং অশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্"। 'অশ্বত্থ' অর্থে যে গাছ আজ আছে কাল নাই—অনিত্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এখানে অশ্বত্থগাছের উদাহরণ দিয়েছেন যেজন্য এ'গাছ সহজে মরে না।

হয়ে। হে ঈশ্বর, তুমি প্রভু, আমি দাস, আমি ভক্ত—এরূপ আমিতে দোষ নাই। মিষ্টি খেলে অম্বল হয়, কিন্তু মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়" (শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ১ম ভাগ, ১৩৬৬' পৃঃ ৯৬-৯৭)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'দুই একটি লোকের সমাধি (নির্বিকল্প) হ'য়ে 'অহং' যায় বটে কিন্তু প্রায় যায় না' (সবিকল্প)। প্রধানত সমাধি দু'রকম: সবিকল্প ও নির্বিকল্প,[৪] অথবা সবীজ ও নির্বীজ সমাধি। 'কল্প' অর্থে কল্পনা বা বাসনা। কল্পের নাম—বীজ। সবিকল্প বা সবীজ-সমাধিতে কল্পনারূপ বীজ থাকে। বীজ বল্‌তে 'অহং অস্মিতি ব্রহ্ম' এই 'আমি'-র সংস্কার। তখন জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়-বোধ থাকে।[৫] কিন্তু নির্বিকল্প বা নির্বীজ-সমাধিতে বীজাকারে (সূক্ষ্মাকারে) কোন সংস্কারই থাকে না। তখন ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয়, অথবা জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিপুটি একাকার হয়। সকল ভেদভাবের সংস্কার তখন বিলুপ্ত হয়। ভেদভাবের কারণ 'আমি'-জ্ঞান বা 'আমি'-অভিমান। নিধিকল্পসমাধিতে 'আমি'-র কোন সংস্কারই থাকে না, তখন কেবল চৈতন্যসাগর, আর সে সাগর যে কিরকম তা উপলব্ধি হয় বোধে বা অনুভূতিতে।[৬]

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: '* * সমাধি হ'য়ে অহং যায় বটে, কিন্তু প্রায় যায় না।' মনে হয়, এখানে তিনি সবিকল্পসমাধির কথাই বলেছেন, নচেৎ নির্বিকল্পসমাধিতে 'আমি'-র সংস্কারই থাকে না। অথবা তিনি কি 'সমাধি হয়' বলতে নির্বিকল্পসমাধির কথাই বলেছেন—যেখান থেকে ব্যুত্থিত হয়ে (লোকসমাজে বা জগতে) ফিরে এলে দেহ থাকার ও লোকব্যবহারের জন্য 'আমি' থাকে ও সে আমি 'দাস-আমি'-র মতো কর্তৃত্বাভিমানশূন্য হয়?

৪। সবিকল্পোঽবিকল্পশ্চ সমাধির্দ্বিবিধা হৃদি।—বাক্যসুধা। ২৩

আনন্দগিরি এর টীকায় বলেছেন: 'তত্র জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়বিকল্পানাং সম্যগ্ বিলয়ান-পেক্ষতয়াঽখণ্ডসচ্চিদানন্দাত্মনি চিত্তসমাধানং সবিকল্পসমাধিঃ। উক্তবিকল্পানাং সম্যগ্‌লয়াপেক্ষয়া যাথাত্ম্যাত্মনি চিত্তসমাধানম্ অবিকল্পো নির্বিকল্পকঃ সমাধিরিতি হৃদি দ্বিবিধঃ সমাধিরিত্যর্থঃ।"

৫। (ক) অস্মীতি শব্দবিদ্ধোঽয়ং সমাধিঃ সবিকল্পকঃ। ২৫

(খ) "প্রত্যগাত্মা সোঽহং অস্মীতি শব্দেন বিদ্ধোঽয়ং সবিকল্পঃ।"

অর্থাৎ 'প্রত্যক্ আত্মাই আমি' এই ভাবনা কর্‌তে কর্‌তে যে সমাধি হয় তাকে শব্দানুবিদ্ধ বলে।

৬। নির্বিকল্পঃ সমাধিঃ স্যান্নির্বাতস্থিতদীপবৎ। ২৬

জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের পক্ষে নির্বিকল্পসমাধি সম্ভব ও সেই সমাধির অবস্থায় তাঁদের দেহরূপ অবিদ্যা-সংস্কার থাকে—যাকে সাধারণত 'প্রারব্ধ' বলি। দেহ থাকাকালে নির্বিকল্পসমাধি হ'লে অখণ্ড ব্রহ্মজ্ঞানের ধারা অব্যাহত থাকে। তখন 'আমি' তুমিতে পরিণত হয়—যেমন শ্রীশ্রীঠাকুরের নিজের জীবনেই দেখেছি 'নাহং নাহং, তুহুঁ তুহুঁ'-মন্ত্রের সার্থকতা। তখন অবিদ্যার আমি বিদ্যার আমিতে রূপান্তরিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "হাজার বিচার করো—'অহং' ঘুরে-ফিরে এসে উপস্থিত। * * একান্ত যদি 'আমি' যাবে না, তবে থাক্ শালা 'দাস-আমি' হ'য়ে। হে ঈশ্বর, তুমি প্রভু, 'আমি দাস'—এইভাবে থাকো।" এটি ঋষি পতঞ্জলি-নির্দিষ্ট রাজযোগের কথা নয়, এ'ভাব ভক্তিযোগের। কেননা তারপরেই শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন: "আমি দাস, আমি ভক্ত—এরূপ আমিতে দোষ নাই।" 'আমি দাস', 'আমি ভক্ত' এটি ভক্তিযোগে শরণাগতির ভাব—যেখানে আমি'-র অভিমান শরণাগতির তুমিতে পরিণত হয়। ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রেম-সাধনায়ও সমাধি হয়।

প্রেম-সমাধিতেও ভক্তের অনন্যমন-রূপ একাকার বৃত্তি হয় শ্রীভগবানের সঙ্গে। অনন্যমনা প্রেমপ্রকৃতির জ্বলন্ত রূপ আমরা লক্ষ্য করি হ্লাদিনীশক্তি-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার মধ্যে—যাঁর একান্ত আশ্রয় ও আরাধ্য ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ! এই প্রেমের সমাধিতে মধুরসম্পর্কযুক্ত 'আমি' থাকে—যে আমি-র শির অবনত থাকে অনন্যশরণাগতির ভাবকে নিয়ে ভগবানের প্রতি।

তবে বিচারের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা। বেদান্তের 'নেতি নেতি'-বিচার ক্ষেত্রেও 'আমি' বা 'অহং'-অভিমান থাকে। সম্পূর্ণভাবে 'আমি'-র অভিমান যায় অখণ্ডজ্ঞান হ'লে। অখণ্ডজ্ঞান ও ব্রহ্মানুভূতি এককথা। তার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "হাজার বিচার করো, 'অহং' ঘুরে-ফিরে এসে উপস্থিত।" কথাও তাই সে, বিচারের অবস্থায় বিচারীর মধ্যে 'আমি' বা 'অহং' থাকে, কেননা দুই না থাকলে বিচার হয় না। দুই না থাকলে বিচার কার সঙ্গে বা কোন্ জিনিস নিয়েই বা হবে? কিন্তু জ্ঞান-বিচারে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে যখন ভেদজ্ঞান দূর হয় তখন 'আমি'-র থাকা না-থাকার সামিল হয়—যেমন জীবন্মুক্তির আশীর্বাদ লাভ করার পর সিদ্ধ-সাধকের শরীর অশরীর, অর্থাৎ শরীর না-থাকার মধ্যে গণ্য হয়। শরীর থাকলেও জীবন্মুক্ত জ্ঞানী শরীরের প্রতি 'আমিত্ব'-বোধ বা মমত্ব-অভিমানের

আরোপ করেন না। তখন শরণাগতিযোগের যে 'দাস-আমি' সেই অহংকার বা অভিমানশূন্য আমিতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন তিনি। এ নিরহংকার আমিতে দোষ নাই—একথাই বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। অহংকারশূন্য 'আমি' নিয়ে কর্ম কর্‌লে কর্মে 'আমার' ব'লে মমত্ববোধ আসে না। তখনই নিষ্কাম-কর্ম সার্থক হয়।

কিন্তু স্বার্থদুষ্ট কামনার সংসারে কর্মের রূপ হয় অন্য রকম। তখন যে-কোন কর্মসাধনের পিছনে অজ্ঞাতসারে 'আমি'-জ্ঞান এসে পড়ে। 'আমি'-জ্ঞানই স্বার্থের ভাব সৃষ্টি করে মনে। অনেক সাধনা না কর্‌লে চিত্ত বা মন পরিশুদ্ধ হয় না এবং চিত্ত শুদ্ধ না হ'লে নিষ্কাম-কর্ম করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "সাধনের বলে কেউ কেউ নিষ্কাম-কর্ম কর্‌তে পারে।"

এক্ষণে সাধন কি? 'সাধন' বল্‌তে অনেক রকম বুঝায়, যেমন জ্ঞানযোগসাধন, ভক্তিযোগসাধন, রাজযোগসাধন, কর্মযোগসাধন প্রভৃতি। আবার সাধন বল্‌তে শম, দম, তিতীক্ষা, উপরতি, ধারণা, ধ্যান, কিংবা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি বুঝায়। সাধন বা সাধনার উদ্দেশ্য মন বা চিত্তকে শুদ্ধ অর্থাৎ বৃত্তিহীন ও শান্ত করা। মন ও চিত্ত অন্তঃকরণের দুটি ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি হ'লেও বহু শাস্ত্রকার মন ও চিত্তকে অভিন্নভাবে ব্যবহার করেছেন। চিত্তশুদ্ধি বা মনের শুদ্ধি বল্‌তে মনের যে চাঞ্চল্য—সংকল্প ও বিকল্প তাদের দূর কিনা শান্ত করা। বৃত্তি শান্ত হ'লে মনের যে যথার্থ স্বরূপ—চৈতন্য, মন তাতে লীন হয়। 'মনের লয় হয়' বল্‌তে চৈতন্যের সঙ্গে মন একাকার হয়। এটাই মনের স্বাভাবিক বা স্বরূপ-অবস্থা। ঋষি পতঞ্জলি বলেছেন : 'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্', অর্থাৎ মনোবৃত্তির নিরোধ বা মনোবৃত্তি সংযত না হ'লে মন নিজের স্বরূপে (চৈতন্যে) স্থিত হয় না। ভাষ্যে ব্যাসদেব নিরোধ বল্‌তে সমাধি বলেছেন। শম, দম, ধারণা, ধ্যানাদির দ্বারা, বা বেদান্তের শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের সাহায্যে মনকে ব্রহ্মাভিমুখী কর্‌লে তেজঃস্বভাব (তৈজস) মন চৈতন্যের আকার ধারণ করে। তখন মনের ব্রহ্মকারা বৃত্তি হয়। ব্রহ্মকারা বৃত্তি হ'লে বৃত্তি ও ব্রহ্মচৈতন্য এক ও অভিন্ন হয়। তখনই অহং বা আমিত্বের লোপ হয়। 'লোপ হয়' বল্‌তে 'অহং'-রূপ অজ্ঞানের আবরণ দূর হ'য়ে জ্ঞানের প্রকাশ হয়। তখনই জ্ঞানদীপ্ত সাধক সংসারে নিষ্কাম-কর্ম করতে পারেন।

এ'প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "ঈশ্বর-দর্শনের পর নিষ্কাম-কর্ম অনায়াসে করা যায়।" ঈশ্বর-দর্শন ও ব্রহ্মানুভূতি এককথা। যদিও অদ্বৈত-বেদান্তে ঈশ্বরকে চতুর্থ বা তুরীয় চৈতন্য থেকে পৃথক ব'লে কল্পনা করা হয়েছে, তবুও চৈতান্যাংশে ঈশ্বরচৈতন্য ও তুরীয় শুদ্ধচৈতন্য এক ও অভিন্ন। ঈশ্বর-দর্শন (ব্রহ্মানুভূতি) হ'লে অবিদ্যার আবরণ দূর হয়,—যেমন আলোকের প্রকাশে অন্ধকার থাকে না। বেদান্ত বলেছে, অজ্ঞানের অপসারণে নিরাবরণ ব্রহ্মজ্যোতি আপনিই প্রকাশিত হয়। তখনই 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মানি'—সকল কর্মের ক্ষয় হয় ও ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত কর্মের চিন্তা ও অনুষ্ঠান আর থাকে না। সুতরাং সকল কর্ম তখন নিষ্কাম-কর্মে রূপান্তরিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "ঈশ্বর-দর্শনের পর প্রায় কর্ম ত্যাগ হয়। দুই একজন (নারদাদি) লোকশিক্ষার জন্য কর্ম করে।" অবতারপুরুষরা নির্বিকল্পসমাধি বা চরমানুভূতির পর লোকসমাজে থাকেন লোককল্যাণ-সাধনের জন্য। শ্রীকৃষ্ণ, গৌতম-বুদ্ধ, আচার্য শঙ্কর, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রভৃতি অবতারগণ ব্রহ্মজ্ঞানের পরও শরীর নিয়ে লোকসমাজে ছিলেন বিশ্বমানবকে মুক্তিপথের সন্ধান দেওয়ার জন্য। যাঁদের জীবনে ঈশ্বরদর্শন হয়েছে সে মহামানবদের নিজেদের কোন সংকল্প ও কর্ম থাকে না, সকল প্রাণীর মঙ্গলকামনা ও কল্যাণ সাধন করাই তাঁদের নিষ্কাম-জীবনের ব্রত হয়। অবতারতত্ত্বের মর্মকথাও তাই। যাঁদের ব্রহ্মানুভূতির পর প্রারব্ধের পরিণতি-রূপ শরীর থাকে সেই ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষগণ কেবল লোক-কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করেন এবং সে কর্মে আর তাঁদের বন্ধন সৃষ্টি হয় না।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

॥ লোকশিক্ষার জন্য শরীর ॥

"শ্রীরামকৃষ্ণ। "সমাধিস্থ হবার পর প্রায় শরীর থাকে না। কারো কারো লোকশিক্ষার জন্য শরীর থাকে—যেমন নারদাদির, আর চৈতন্যদেবের মত অবতারদের। কূপ খোঁড়া গেলে কেউ কেউ ঝুড়ি কোদাল বিদায় ক'রে দেয়। কেউ কেউ রেখে দেয়—ভাবে, যদি পাড়ার কারু দরকার হয়। এরূপ মহাপুরুষ জীবের দুঃখে কাতর। এরা স্বার্থপর নয় যে, আপনাদের জ্ঞান হলেই হ'ল।

কিন্তু শক্তিবিশেষ। সামান্য আধার লোকশিক্ষা দিতে ভয় করে। হাবাতে কাঠ নিজে এক রকম ক'রে ভেসে যায়, একটা পাখী এসে বসলেই ডুবে যায়। নারদাদি বাহাদুরী-কাঠ। ঐ কাঠ নিজেও ভেসে যায়, আবার উপরে কত মানুষ গরু, হাতী পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ (১৮৮২), পৃঃ ৭৯-৮০

শ্রীরামকৃষ্ণদেব মুক্তপুরুষ, আধিকারিক পুরুষ, বা ঈশ্বরের অবতারদের প্রসঙ্গে ঐ সকল কথা বলেছেন। ঈশ্বর যে অবতার হ'য়ে লীলার জন্য পৃথিবীতে আসেন (অবতরণ করেন) এ'কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বীকার করতেন: তিনি বলতেন: "থোলো থোলো রাম, থোলো থোলো কৃষ্ণ।" তাঁদের দু'একটা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। নিজের সম্বন্ধে তো বহুভাবেই ইঙ্গিত করেছেন: "এবার ছদ্মবেশে রাজার রাজ্য পরিভ্রমণ করা", অর্থাৎ রাজা স্বয়ং ঈশ্বর; স্বয়ং ঈশ্বর এবার এ'যুগে অবতীর্ণ হয়েছেন এ'কথারই ইঙ্গিত করেছেন তিনি। অথবা বলেছেন, "যে রাম, সে কৃষ্ণ, সে ইদানীং রামকৃষ্ণ।" তাছাড়া আউল বাউলদলের কথা তিনি বলতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, সমাধিস্থ হবার পর কারো কারো কিছুদিন পরে আর শরীর থাকে না। সমাধি কিনা নির্বিকল্পসমাধি বা অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধি—যে সমাধি হ'লে সাধক ব্রহ্মানন্দসাগরে লীন হন জলে জলবিন্দু মিশে যাওয়ার মতো। এতটুকু বাসনা-কামনা থাকতে নির্বীজ বা নির্বিকল্প-সমাধি হয় না। বাসনাই বন্ধন। বন্ধন করে ব'লে বাসনাকে অজ্ঞানও বলে। নির্বিকল্পসমাধিতে অহং-সংস্কাররূপ অজ্ঞানের নাশ হয়। তখন বাসনার লেশও থাকে না। অজ্ঞান বা বাসনা থাকে না ব'লে নির্বীজ বা নির্বিকল্পসমাধির পর অজ্ঞানের পরিণামরূপ শরীর থাকে না। সমাধিস্থ (নির্বিকল্প বা অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধি) হ'লে সাধকের শরীর থাকার কোন প্রয়োজন হয় না। তখন তিনি পরমানন্দরূপ ব্রহ্মানন্দসাগরে মিশিয়ে যান; অর্থাৎ পরমাত্মারূপ-ব্রহ্মচৈতন্যকে উপলব্ধি ক'রে তিনি ব্রহ্মচৈতন্যই হ'য়ে যান—'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "কারো কারো লোকশিক্ষার জন্য শরীর থাকে।" সমাধি-অবস্থা লাভ করার পর যাঁদের শরীর থাকে তাঁরা লোক-শিক্ষার (আচার্য শঙ্কর বলেছেন 'লোক সংগ্রহের' বা লোকল্যাণ করার) জন্য শরীর রেখে দেন। শরীর শরীরী বা আত্মার যন্ত্র। শরীর মন্দির আত্মা বিগ্রহ বা দেবতা। কোন কর্ম করতে গেলে শরীররূপ যন্ত্রের সাহায্য অবশ্যই নিতে হয়। তাই অধিকারসম্পন্ন মহামানব বা অবতারগণ লোক-শিক্ষার জন্য শরীরযন্ত্র রেখে দেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, সমাধিলাভের (ব্রহ্মোপলব্ধির) পর অজ্ঞানের যদি নাশই হয় তবে অবতারপুরুষদের অজ্ঞানের পরিণামরূপ শরীর থাকে এ'কথা স্বীকার করি কিভাবে? শ্রীকৃষ্ণও গীতায় বলেছেন: "জ্ঞানাগ্নি সর্ব-কর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন", অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অগ্নি সকল কর্ম (অজ্ঞান) বিনষ্ট করে, সুতরাং সমাধিবান বা জ্ঞানবান মানুষ বা অবতার, কিংবা অবতারকল্প মহামানবদের লোককল্যাণ করার জন্য অজ্ঞানলেশরূপ শরীর থাকে কী ক'রে? বেদান্তে এ'সবের আলোচনা আছে। বেদান্তীরা বিচার ক'রে বলেন, নির্বিকল্পসমাধিতে ব্রহ্মচৈতন্যের উপলব্ধি হয়, তখন শরীর থাকে মাত্র তাঁদের যাঁদের বিশ্বকল্যাণ করার ব্রত থাকে। অজ্ঞানলেশ তাদের পূর্ণজ্ঞানের কোন ক্ষতি করতে পারে না। শাস্ত্রকাররা সেখানে ঘট প্রভৃতি

মৃত্তিকা পাত্রের সৃষ্টি করার পরও কুলালচক্রের গতির বা পোড়াদড়ির উদাহরণ দিয়েছেন। দড়ির বন্ধনশক্তি থাকে, কিন্তু পোড়াদড়ির কোন বন্ধনশক্তি থাকে না; তেমনি সমাধিবান বা উপলব্ধিবান পুরুষ বা অবতারগণের লোককল্যাণ-সাধনের উপায়রূপ অজ্ঞানলেশ জন্য শরীর থাকলেও সে অজ্ঞানের বন্ধন বা মোহমুগ্ধ করার শক্তি থাকে না;[১] সুতরাং অবতারদের বা জীবনমুক্ত মহাপুরুষদের শরীর থাকায় কোন বাধা নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিত্য ও লীলা দুটি অবস্থার কথা বলেছেন। নিত্য' বল্‌তে ব্রহ্মের যথার্থ (অবিকৃত) স্বরূপ, আর 'লীলা' শক্তির এলাকায় লোককল্যাণ-কর্ম। একটি অব্যক্ত ও অপরটি ব্যক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা।" সুতরাং নিত্য ও লীলা স্বরূপে এক, কেবল প্রকাশে পার্থক্য। যেমন স্থির-সাপ ও চলা-সাপ, আসলে সাপ একটাই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, এ'রূপ মহাপুরুষ বা অবতারগণ জীবের দুঃখে কাতর হন। স্বামী বিবেকানন্দ বোধিসত্ত্বদের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হ'য়ে বলেছিলেন, —'যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বের একটি মানুষও অমুক্ত থাকবে ততক্ষণ আমি নিজের মুক্তি চাই না'—'তুচ্ছং ব্রহ্মপদম্'। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, তথাগত বুদ্ধ, আচার্য শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণদেব এঁরা সকলেই বিশ্বের মানুষের ও সকল প্রাণীর জন্য জীবন দান করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, এঁরা বাহাদুরী-কাঠ, এঁরা মানোয়ারী জাহাজ, এরা নিজেও ভেসে যায়, আবার অসংখ্য মানুষকেও পারে নিয়ে যায়। সংসার-সমুদ্রের পারে নিয়ে যাওয়ার অর্থ পরমমুক্তির পথনির্দেশ করা। বিশ্বমানবের বন্ধন-দুঃখ অবতারপুরুষদের অন্তরে ব্যাথার সঞ্চার করে, তাই তাঁরা নিজেদের মুক্তিকে তুচ্ছ ক'রেও সকলের মুক্তির জন্য জীবন দান (লীলা) করেন। 'জীবন দান করেন' বল্‌তে চিরমুক্ত হয়েও বন্ধনের সংসারে আসেন মানুষকে বন্ধনের পারে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সাধারণ মানুষ ও অবতারপুরুষদের মধ্যে ভেদ এখানেই।

অজ্ঞান-নাশের পর শরীর রেখেছিলন মুক্তাত্মা নারদ ও শ্রীচৈতন্যের মতো অবতারপুরুষগণ এবং এরই উদাহরণ দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। অবতারদের অবতরণের সার্থকতাই তাই। তাঁরা নিজেদের জীবনের সাধনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন সাধারণ মানুষের সমাজে। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ

১। এ সম্বন্ধে অনুরূপ আলোচনা পূর্বেও করা হয়েছে।

ক'রে সাধনশীল ও মুক্তিকামী মানুষ মুক্তির আশীর্বাদ লাভ করতে সমর্থ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এর একটি উপমা দিয়েছেন এই ব'লে: "কূপ খোঁড়া হ'য়ে গেলে কেউ কেউ ঝুড়ি কোদাল বিদায় ক'রে দেয়। কেউ কেউ রেখে দেয়, ভাবে—যদি পাড়ার কারু দরকার হয়।" এ' উপমার মধ্যে দুটি কথা আমরা পাই: (১) সাধন-ভজন বা নিত্যানিত্যবস্তুবিচার ক'রে মুক্তি লাভ করার পর মুক্তপুরুষেরা আর মায়াবন্ধনের সংসারে থাকেন না, তাঁরা শরীর ত্যাগ ক'রে ব্রহ্মানন্দসাগরের সঙ্গে এক হ'য়ে যান, আর অবতারপুরুষ-গণ জ্ঞান লাভ করার পরও শরীর রেখে[২] দেন লোককল্যাণ করার জন্য। তবে মুক্তপুরুষদের সকলেই যে জ্ঞানলাভের পর শরীর ত্যাগ করেন—তা নয়। তাঁদের শরীরত্যাগ বা মৃত্যু ইচ্ছাকৃত। জীবন্মুক্তির আশীর্বাদ লাভ ক'রে মুক্ত বিহঙ্গের মতো তাঁরা লোকসমাজে থাকেন এবং নিরাসক্ত জীবন নিয়ে লোকের কল্যাণ সাধন করেন তাঁরা নিজেদের দিব্যজীবনের আদর্শ দিয়ে মুক্তিকামী মানুষদের মুক্তিলাভের পথনির্দেশ করেন—'আপনি আচরি ধর্ম (বা কর্ম) জীবকে শিখায়'। এ' ধরনের অনেক নিঃস্বার্থজীবন-মুক্তপুরুষের নিদর্শনই পাই ইতিহাসের পাতায়, রামায়ণে, মহাভারতে, বিভিন্ন পুরাণ-সাহিত্যে ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে। উনবিংশ-বিংশ শতকের সমাজেও তৈলঙ্গনাথ স্বামী, বামাক্ষেপা, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাত্মা ও সাধকগণের এ'ধরনের নিদর্শন পাই। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপার্ষদদের লোককল্যাণময় জীবন এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আচার্য শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রভৃতির মুক্তিময় জীবনকর্ম এ' বিষয়ে উজ্জ্বল নিদর্শন। অবতারগণের জীবনাদর্শের কথা স্বতন্ত্র। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "এরূপ মহাপুরুষ জীবের দুঃখে কাতর। এরা স্বার্থপর নয় যে, আপনাদের জ্ঞান হলেই হোল।" আপনার বাসনা-কামনার চরিতার্থেই যাদের মন নিবদ্ধ, তারা স্বার্থপর। তাদের দৃষ্টি সীমিত ও অদূরপ্রসারী। তারা মানুষের সমাজকে আপন ও পর এ দু'ভাগে ভাগ ক'রে সামগ্রাক উদার দৃষ্টি থেকে

২। অবতারপুরুষগণ জ্ঞানস্বরূপ, আত্মজ্ঞান তাঁদের করতলগত, সুতরাং তাঁরা নূতন ক'রে জ্ঞান লাভ করবেন কেমন ক'রে? প্রশ্নটি অবশ্য সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত, কিন্তু অবতারদের সম্পর্কে এ'প্রশ্ন অবান্তর। তাঁদের সাধন-ভজন ও জ্ঞানলাভের জন্য প্রচেষ্টা সাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

বঞ্চিত হয়। এ বঞ্চিত দৃষ্টিই তাদের জীবনে দুঃখ-যন্ত্রণার অভিশাপ বহন ক'রে আনে। এ আপন ও পর জ্ঞানই দ্বৈতজ্ঞান, আর দ্বৈতজ্ঞানই অজ্ঞান। বৃহদারণ্যক-উপনিষদে আছে—'দ্বৈতাদ্ভয়ম্', অর্থাৎ দ্বৈত বা দুই জ্ঞান থেকেই ভয়ের সৃষ্টি হয়। এ'ভয় কোন্ ভয়? এ ভয় মৃত্যু ভয়, বন্ধনভয় প্রভৃতি। আত্মার মৃত্যু নাই, জন্ম নাই, কিন্তু দেহজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান এ দুটি জ্ঞানকে পৃথক ভেবেই মানুষ আত্মাস্বরূপ ভুলে যায় ও আত্মজ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়। শাস্ত্রকারেরা এ'কথাকে একটু ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন, মানুষ অজ্ঞানে দেহকে আত্মা ব'লে ভ্রম করে, আর দেহের মৃত্যু বা নাশকে অজর অমর আত্মাতে আরোপ ক'রে দুঃখ পায়। এটি ভেদবুদ্ধির পরিণাম। আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষরা অজ্ঞানী মানুষের এ হীনবুদ্ধির জন্য অন্তরে বেদনা অনুভব করেন ও তাদের দুঃখে কাতর হন এজন্য যে, অনিত্য বস্তুকে তারা নিত্য ব'লে মনে করে, অথচ বিচারবুদ্ধি নিয়ে জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করা মানুষের পক্ষেই সম্ভব। এই জ্ঞানদৃষ্টি লাভের সম্ভবনাকে সাধারণ মানুষ অসম্ভব ব'লে মনে করে, তাই জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন মুক্ত মহামানবরা তাদের মূঢ়বুদ্ধির জন্য কাতর হন। আলোককে যদি কেউ অন্ধকার ব'লে মনে করে, দড়িকে যদি কেই সাপ ব'লে ভ্রম করে, তবে চাক্ষুষ দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের কাছে তা দুঃখের কারণ হয়। তাছাড়া অজ্ঞানের আবরণ দূর ক'রে যাঁরা জ্ঞানের অনির্বাণ আলোকের স্পর্শ লাভ করেছেন, তাঁদের জীবন নিরাসক্তির মহিমায় সমুজ্জ্বল। তাঁরা পরদুঃখে কাতর হন, কিন্তু নিজেদের দুঃখে অবিচল ও আনন্দময় থাকেন! তাঁরা মুক্তিময় জীবনের সার্থকতা লাভ করেছেন ব'লে মনে করেন যে, সকল মানুষই মুক্তিময় জীবন লাভ ক'রে কৃতকৃতার্থ হোক। তাঁদের দৃষ্টিতে সকলেই আপন, সকলেই অমৃতের সন্তান—শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত অপাপবিদ্ধ আত্মা। তাই তাঁদের অন্তর সকলের বেদনাতে বেদনাতুর। তাই তাঁরা সকলের বন্ধনমুক্তির জন্য ব্যাকুল ও আগ্রহী হন। নিজেদের মধ্যে জ্ঞানদৃষ্টি ও জ্ঞানদীপ্তির যে সমুজ্জ্বল সাবলীল স্বচ্ছ আনন্দ, সেই আনন্দের বিলাসই দেখ্‌তে চান তাঁরা আব্রহ্মস্তম্ভ সকলের মধ্যে।

এ'প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "কিন্তু শক্তিবিশেষ। সামান্য লোকশিক্ষা দিতে ভয় করে। হাবাতে কাঠ নিয়ে একরকম ক'রে ভেসে যায়, একটা পাখী এসে বসলেই ডুবে যায়। নারদাদি বাহাদুরী-কাঠ। ঐ

কাঠ নিজেও ভেসে যায়, আবার উপরে কত মানুষ, গরু, হাতী, পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে।" কিন্তু শক্তিবিশেষ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই শক্তির কথা অনেক কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন: 'নরেনের আঠারটা শক্তি—লিখ্‌তে, বল্‌তে, গাইতে, বাজাতে সব-কিছুই পারে।' আবার বলেছেন, যাদেরকে অনেকে মানে-গণে, তাদের মধ্যে বেশী শক্তি আছে জানবে। শক্তির তারতম্য মহাপুরুষ ও অবতারদের মধ্যেও আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে অংশশক্তি, আবেশশক্তি, পূর্ণশক্তি প্রভৃতির কথা আছে। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্'—এটি অবতারে পূর্ণশক্তির প্রকাশের কথা। 'এবার ছদ্মবেশে রাজার রাজ্যপরিভ্রমণ'—শ্রীরামকৃষ্ণের এ' কথাতেও পূর্ণশক্তি-প্রকাশের ইঙ্গিত রয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভিপ্রায়: সাধারণ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বা মহামানব এবং ঈশ্বরের অবতার এ'দুটি কোটি বা শ্রেণীর মধ্যে শক্তিবিকাশের তারতম্য আছে। সাধারণ মুক্তপুরুষকে তিনি 'হাবাতে-কাঠ' বলেছেন, আর ঈশ্বরের অবতারদের তিনি বলেছেন 'বাহাদুরী-কাঠ'। অবশ্য 'নারদাদি' বল্‌তে নারদ, ব্যাসদেব, শুকদেব প্রভৃতি রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে বর্ণিত মুক্তপুরুষ। তাছাড়া উনবিংশ ও বিংশ শতকে, কিংবা তার পূর্বেও জীবন্মুক্ত পুরুষদের সম্বন্ধেও ধরা যায়। পূর্বজন্মের সুকৃতি ও সুসংস্কারবশে সাধন-ভজন ও সদ্‌সদবিচার ক'রে যাঁরা মায়াবন্ধনের পারে জীবন্মুক্ত হন তাঁরা ঈশ্বরের অবতারগণের মতো সমান শক্তিসম্পন্ন হন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ দুটি শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন শক্তির প্রসঙ্গ তুলে। জীবন্মুক্ত-পুরুষ বা মহামানবগণ যেমন নিজেদের উদ্ধার করেন সংসারসাগর থেকে, তেমনি উদ্ধার করেন মুষ্টিমেয় সাধকগণকে মুক্তির পথনির্দেশ দিয়ে। কিন্তু ঈশ্বরের অবতারগণের কথা স্বতন্ত্র। তাঁদের লক্ষ্য ও কর্ম বিশ্বকল্যাণ-সাধনের জন্য। তাই একটি দুটি মানুষকে নয়, কল্যাণদৃষ্টির সামগ্রিক প্রসারতা নিয়ে বিশ্বের অসংখ্য বেদনাতুর মুক্তিকামীকে তাঁরা মুক্তির পথ দেখান। সমষ্টি জ্ঞানচেতনায় তাঁরা প্রবুদ্ধ, তাই সমষ্টি মানুষের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি সর্বদাই জাগ্রত ও প্রসারিত। জাগ্রত চেতনার পিছনে তাঁদের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ থাকে না, কারণ স্বার্থপরতা-রূপ অজ্ঞানবন্ধনের তাঁরা অতীত। তাঁদের জীবন শুধু মুক্তিময় নয়, মুক্তির স্বরূপই। মানুষের সমাজে তাঁদের যতটুকু কর্ম ও

প্রচেষ্টা, তা অপার্থিব লীলারই প্রতিচ্ছবি। তাঁদের সকল কর্মপ্রচেষ্টা ও জীবনের আচরণই লোকশিক্ষার জন্য। তাঁরা যে তীব্র ব্যাকুলতা নিয়ে সাধন-ভজন করেন, তাও লোকশিক্ষার জন্য। নচেৎ ঈশ্বরাবতারদের নিজেদের পূর্ণতা লাভের আর আশা-আকাঙ্ক্ষা কি? অপূর্ণতা থাকলে তবেই পূর্ণতা লাভের আকাঙ্ক্ষা ও আকুলতা থাকে, কিন্তু ঈশ্বরের যাঁরা সাক্ষাৎ-অবতার, তাঁরা পূর্ণ ও ঈশ্বরতুল্যই। মানুষের বেশে মানুষের সমাজে তাঁরা আসেন আপনাদের জীবনকর্ম ও জীবনের অপার্থিব আদর্শ স্থাপন করেন। মুক্তিকামী মানুষ যাতে সে'সকল কর্ম ও আদর্শ অনুসরণ ক'রে জীবনকে কৃতকৃতার্থ করে 'সময় সাগরতীরে পদাঙ্ক অঙ্কিত ক'রে, আমরাও হব বরণীয়।' বরণীয় হ'তে হ'লে আত্মস্বরূপকে বরণ করতে হয়, আত্মস্বরূপ হ'তে হয়!

পরিশিষ্ট

॥ শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের শব্দার্থ ॥*

স্বামী প্রেমেশানন্দ

"[শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে এমন কতকগুলি শব্দ আছে যাহা বাংলাদেশে সর্বত্র প্রচলিত নহে। অন্যান্য কারণেও বহু শব্দের অর্থ অনেক পাঠক-পাঠিকা সহজে বুঝিতে পারেন না। আমরা এই শব্দের অর্থ জানিতে পারিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিলাম।]

শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ

১ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ, ২১ পৃষ্ঠা।

'Moleskin' : mole *ছুঁচোর ন্যায় একপ্রকার ক্ষুদ্র জীব। তাহার অতি কোমল চর্মের ন্যায় একপ্রকার সূতার কাপড়।*

'র‍্যাপার'—wrapper : চাদর।

২-৪০-৫০ : 'নীলের বড়ি। নীলের বড়ি। 'সমুদ্র-ফেনা' : সমুদ্রতীরে একপ্রকার জলজন্তুর হাড় পাওয়া যায়, তাহা দেখিতে ফেনার মত, টোট্‌কা ঔষধে ব্যবহার হয়।

২-৫-৫২ : 'সারে মাতে' : গুড়ের শক্ত ভাগকে সার এবং যে অংশ গলিয়া তরল হইয়া যায় উহাকে মাত বলে ; শক্ত গুড়, জলো গুড়।

২-৮-৫৮ : 'কোম্পানী' : ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ; পূর্বে গভর্ণমেণ্টকে কোম্পানী বলিত।

২-৯-৬০ : 'ডি-গুপ্ত' : জ্বরের একটা পেটেণ্ট ঔষধ।

২-৮-৫৭ : 'ছাঁই' : ঠাকুরের দেশে নারিকেল কুরিয়া গুড়ে পাক করিলে বলে 'ছাঁই', চিনিতে পাক করিলে বলে 'সন্দেশ'।

৩-৩-৬০ : 'মদনের যাগ-যজ্ঞ' : মদন এখানে কামদেব নহেন, গানের রচয়িতার নাম।

---

* এখানে পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমেশানন্দ মহারাজ-রচিত 'শব্দার্থ'-ই সন্নিবেশিত হোল।

৩-৬-৭৫ : 'বাহাদুরী কাঠ' : শাল প্রভৃতি শক্ত ও ভারী কাঠ।

৪-৭-৯১ : 'বেল্লো' : বাল্তো, বাল্দো—তাল ও নারিকেলের সপত্র শাখা।

৯-৩-১৩১ : 'বিল করে' : গর্ত করিয়া। 'ঘুনী' : মাছ ধরিবার খাঁচা। 'মুক্তকেশী' : একরকম গাছ, তাহাতে শক্ত বেড়া হয়।

'একতারে'—এখ্তিয়ারে, নিজ আয়ত্বে। 'চুটিয়ে' : শক্তি প্রয়োগ করিয়া।

৯-৭-১৫২ : 'বে হেড' : বে-head : মাথা খারাপ।

১১-২-১৬০ : 'তুম্বা' : লাউ। এক প্রকার লাউ অত্যন্ত তেতো, উহার খোল সাধুরা কমণ্ডলুর ন্যায় ব্যবহার করেন।

১-৩-২৬৩ : 'হনুমান-পুরী' : হিন্দুস্থানী পালোয়ানের নাম। 'পাঠ্ঠা' : কুস্তির আখড়ায় যাহারা সবেমাত্র শিখিতে আসিয়াছে।

১১-২-১৯৪ : 'নাচ-দুয়ার' : বাড়ীর সামনের দরজা।

১৩-৪-২০৪ : 'খ্যাট'—খোরাক।

১৬-৩-২৬৮ : 'আউটে গেছে' : দুধ : বেশী জ্বাল দিলে যখন শুকাইয়া ঘনীভূত হয়।

১৫-৫-২৮৮ : 'বীড়্বার' : পরীক্ষা করিবার।

১৯-৫-২৮৯ : 'নিখাদ' : খাদহীন, নির্মল।

পরিশিষ্ট, ৩০৬ : 'কালা পেড়ে' (Sic.) : ঠাকুর সাধারণতঃ লাল পেড়ে কাপড় পরিতেন। কিন্তু এই স্থলে কালা পেড়ে লেখায় সংশয় হইতে পারে। অশ্বিনীবাবু 'কালাপেড়ে'ই লিখিয়াছিলেন ইহা বুঝাইবার জন্য ছাপাখানার সংকেত, 'Sic' শব্দটা দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ

২-৪-১৯ : 'চৌদ্দ-পোয়া' : সাড়ে তিন হাত মানব-দেহ।

২-৪-২০ : 'গোড়ে-মালা' : মোটা করিয়া গাঁথা ফুলের মালা।

২-৫-২১ : 'ডাকুর' : এক প্রকার বিষাক্ত মাকড়সা।

'ভাবরা'—ভাপ্রা, ভাপ, বাষ্প, ধোঁয়া।

২-৫-২৩ : 'বরফের চাঁই' : চাঙ্গর, বড় ডেলা।

২-৮-২৮ : 'খুঁটিয়ে' : সূক্ষ্মভাবে, নির্দোষ ভাবে।

৩-৪-৩৮ : 'ধূলো হাঁড়ির খোলা' প্রসূতির নোংরা কাপড় চোপড় ও ফুল একটি হাঁড়িতে করিয়া মাঠে দূরে ফেলিয়া দেওয়া হয়। যাহারা অভিচারাদি করে তাহারা হাঁড়ি লইয়া যায়।

৩-৪-৩৯ : 'ন্যাবা' : কামলা রোগ—Jaundice।

৫-৫-৫২ : 'বাধা' : জুতা।

৭-২-৬৯ : 'হাজা-শুকা' : হাজা—জলে ভিজিয়া নষ্ট হইয়া যাওয়া, অতি বৃষ্টি ; 'শুকা' : অনাবৃষ্টি।

৮-১-৭০ : 'ঘুসকী' : পরপুরুষে আসক্ত নারী।

১৩-১৪-১২৪ : 'ঢ্যামনা' : নির্বিষ সাপ, অকর্মণ্য।

১৫-২-১৪৭ : 'কামারশালের নাই' : নেহাই Anvil.

১৭-৫-১৬৯ : 'মুণ্ডি' : ছোট মণ্ডা।

১৯-৫-১৯২ : 'আটাশে ছেলে' : যে ছেলের আট মাসে জন্ম, দুর্বল।

১৯-৫-১৯৩ : 'সোঁধোগন্ধ' : শুষ্ক মাটিতে জল পড়িলে যে গন্ধ হয়।

২০-৩-২০১ : 'আপ্তভাবে' : অন্তরঙ্গদের নিয়ে।

২০-৩-২০৪ : 'ঘুপটি মেরে থাকা' : লুকাইয়া অপেক্ষা করা, ওৎ পেতে থাকা।

২৭-৩-২১৩ : 'তেল ধুতি' : স্নানের সময় পরিবার জন্য ছোট ধুতি।

২-৪-২৭৫ : 'বাঁখারি' : বাঁশের ফালি।

শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় ভাগ

১-২-৭ : 'দর-কোচা' : দরকাঁচা, দড়কাঁচা, পাকিলেও ভিতরে অপক্ক বা শক্ত।

১-৫-১৬ : 'আখের' : পরিণাম।

১-৬-১৬ : 'শশী বশীভূত' : কামজয়, ব্রহ্মচর্য।

'কোটা' : কোঠা, দেহ। চোর কোঠারী : চোর কুঠরী, হৃদয়।

২-২-২৮ : 'যাঁতি' : সুপারি কাটার যন্ত্র।

৩-৩-৩৫ : 'কুকুড়ো' : মোরগ।

৪-২-৪১ : 'কাকীমুখ-আচ্ছাদিনী' : জীবের জ্ঞানমুখ আচ্ছাদনকারিণী

অবিদ্যা। 'ক' : সুখ। অক : দুঃখ। ক + অক : কাক, সুখদুঃখযুক্ত জীব—কাকী।

৪-৩-৪৪ : 'কুপো'—গলা সরু পেট মোটা জালা।

৬-২-৫৬ : 'কারণ করত' মদ খেত। তান্ত্রিক সাধকগণ মদকে কারণ বারি বলেন।

৬-২৫৭ : 'এক টোষা' : এক বিন্দু। 'সাকরা' : সেকরা, স্বর্ণকার।

৪-৬-৬২ : 'কালাপাণি' : সমুদ্র। 'মনুমেন্ট' : কলিকাতার গড়ের মাঠে উচ্চ স্তম্ভ।

৯-৪-৯১ : 'গুচ্ছির' গুচ্ছের, অনেকগুলি (তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত)।

১০-২-১০৯ : 'গোট' : কোমরের গহনা।

১২-২-১৩৩ : 'নেওটা' : স্নেহে বশীভূত।

১৪-১-১৫৬ : 'কাঁড়ি' : রাশি, স্তূপ। 'কাঁদি' : বৃহৎ।

শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪র্থ ভাগ

১-৪-৮ : 'মানোয়ারী গোরা' : যুদ্ধ জাহাজের নাবিক। মানোয়ারী man of war.

১-৪-৯ 'মটকা' চালের মাথা বা সর্বোচ্চ স্থান।

২-১-১৪ : 'খেই ধরা' : সূতার প্রান্ত বাহির করা। তাঁতে কাপড় বুনিবার সময় সূতা ছিঁড়িয়া গেলে উহার প্রান্ত বাহির করিয়া জুড়িয়া দিতে দিতে হয়।

১৭-২-১০৫ : 'বটকা' তন্দ্রা, অন্যমনস্কতা।

২৪-১-২৭৫ : 'আট পিটে' : আট পিঠে, কষ্টসহিষ্ণু।

শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৫ম ভাগ

১-২-৪ : 'সেঁকুল কাঁটা' : শেয়াকুল কাঁটা, কুলজাতীয় ছোট ছোট বন্য গাছের কাঁটা।

দ্রষ্টব্য : কতকগুলি শব্দ : মদন, নিখাদ (নিষাদ) প্রভৃতির অর্থ বাক্য-অনুসারে ভিন্ন অর্থও হোতে পারে।